কাকজ্যোৎস্না

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাকজ্যোৎস্না

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সূচি

ঘড়িটা বুঝি ঠিকমত চলিতেছে না

ঘড়িটা বুঝি ঠিকমত চলিতেছে না। দুইটা-কুড়িতে কলিকাতার ট্রেন আসিবে। সেই গাড়িতেই প্রদীপের ফিরিবার কথা। আসিয়া পৌঁছিলে হয়?

অরুণা স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "ষ্টেশনে গাড়ি থাকবে ত'?"

স্বামী ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, স্ত্রীর কথায় একটু থামিয়া একটা শোকাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু কহিলেন,—"আর গাড়ি!"

সেই স্তব্ধ-স্তম্ভিত ঘরে কথার অর্থটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বাবোটা বাজিয়া ঘড়ির ছোট কাটাটা যেন আটকাইয়া গেছে,—সুধীর জীবনে দুইটা-কুড়ি বুঝি আর বাজিল না! প্রদীপের ফিরিয়া আসিবার আগেই প্রদীপ নিভিবে।

আকাশ ভরিয়া তারা জাগিয়াছে, কোটি কোটি জগৎ, কোটি কোটি জীবন! সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া কি বিস্তীর্ণ পথ, কি অপরিমেয় ভবিষ্যৎ! অবনী বাবু জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলেন; রাস্তায় দূরে বাতি-থামের উপর একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে শুধু। সুষুপ্ত, প্রশান্ত রাত্রি।

ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুধী-র শিয়রের কাছাকাছি পিলসুজের উপর মাটির বাতি জ্বালানো। সুধী বুঝি একটু চোখ চাহিল। অরুণা তাড়াতাড়ি ছেলের আরো নিকটে ঘেঁষিয়া আসিতে-আসিতে স্বামীকে কহিলেন,—"সলতেটা একটু বাড়িয়ে দাও শিগগির। সুধী কি যেন চাইছে।"

তারপর ছেলের আর্ত মলিন মুখের কাছে মুখ আনিয়া কোমলতর কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সুধী, বাবা, কিছু বলবে?"

সুধী নিঃশব্দতার অপার সমুদ্রে ডুবিতেছে; জিহ্বায় ভাষা আসিল না,—দুর্বল ডান-হাতখানা মা'র কোলের কাছে একটু প্রসারিত করিয়া দিয়া কি যেন ধরিতে চাহিল।

অরুণা কহিলেন,—"এ পাশে একটু সরে এস বৌমা, সুধী বুঝি তোমাকে খুঁজছে।"

নমিতা স্বামীর পায়ের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—গভীর রাত্রির যে একটি প্রশান্তিপূর্ণ অনুচ্চারিত বাণী আছে, নমিতা তাহারই আকারময়ী। শাশুড়ির কথা শুনিয়া নমিতা নূতননেত্রে কাছে আসিয়া আঁড়াইতেই অরুণা কহিলেন,—"এ-সময়ে আর লোকলজ্জা নয় মা, তোমার ঘোম্‌টা ফেলে দাও! সুধী! মিতা, তোর মিতা—এই দ্যাখ, কিছু বলবি তাকে?"

সুধী বোধ হয় একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিল না।

ঘরভরা লোকজনের মধ্যেই নমিতা অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া সজল চোখে স্বামীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,–"কেহ না থাকিলে হয়ত সকল লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া অনেক কথা কহিত, হয়ত একবার বলিত : "আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ, কত দূরে? সেখানে কাহাকে সঙ্গী পাইবে? তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিয়, কিন্তু আমি তোমাকে ভুলিয়া থাকিব কি করিয়া?"

অরুণা নমিতাকে সুধীর পাশে বসাইয়া দিয়া তাহার ব্রীড়াকুণ্ঠিত করতলে মুমূর্ষু সন্তানের শিথিল হাতখানি অর্পণ করিলেন। নমিতা দেখিল হাতখানি ঠাণ্ডা, যেন অব্যক্ত স্নেহে সিক্ত হইয়া আছে! মনে পড়িল, মাত্র সাত মাস আগে এই হাতখানিরই কুলায়ে ভীরু পক্ষীশিশুর মত তাহার দুর্বল কমনীয় হাতখানি রাখিয়া, এক উজ্জ্বল দীপালোকিত সহস্রকলহাস্যমুখর উৎসব-সভায় সে সর্বাঙ্গে প্রথম পুলকসঞ্চার অনুভব করিয়াছিল। আজো বুঝি তাহাদের নূতন করিয়া বিবাহ হইতেছে। নমিতার আজ নববধুর বেশ—সে আকাশচারী মৃত্যু—প্রতীক্ষামগ্ন দুই চক্ষু মেলিয়া স্বামীর শয্যাপাশ্বে আসিয়া বসিয়াছে। তোমরা উলু দিতেছ না কেন? আলো নিভাইয়া দাও, রাত্রির এই প্রগাঢ়-প্রচুর, অন্ধকারকে অবিনশ্বর করিয়া রাখ!

মৃত্যু আসিতেছে, ধীরে, অতিনিঃশব্দপদে—নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে প্রশান্ত গোধুলির মত! কেহ কথা কহিয়ো না, মৃত্যুর মৃদুপদপাত শুনিবার আশায় নিশ্বাস রোধ করিয়া থাক!

অবনীনাথ হেঁচাইয়া উঠিলেন : "জানলাটা খুলে দাও শিয়রের, পথ আটকে রেখ না।"

কে একজন শিয়রের জানালা খুলিয়া দিল। আরেকজন কহিল,—"আপনি অত অস্থির হবেন না মেলোমশাই।"

অবনীনাথ চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিলেন : "পাগল! অস্থির আর হ'তে পারি কই, সত্য! আমাদের শরীর এমন সব স্নায়ু দিয়ে তৈরি যে অস্থির সে হতেই শেখেনি। আমরা ত' অর আগ্নেয়গিরি নই!" দুই-পা হাঁটিয়া আবার দাঁড়াইলেন : "শুনেছি ভগবান যোগে বসে আছেন সমাহিত হয়ে, আর প্রকৃতি রাজ্য চালাচ্ছেন; বিধাতাকে আমি দুষবো না। আমি স্থির, হয়ত ভগবানেরই মতো। আমি ভাবছি ছেলে মরেছে বলে আমি বড় জোর একদিন কোর্ট কামাই কতে পাব —আমাকে একটা সাত-লাখ টাকার মোকদ্দমার রায় লিখতে হবে। আমি ভাবছি, পশু আমার লাইফ-ইসিয়োরেন্স-এর প্রিমিয়াম পাঠাবার শেষ তারিখ। আমার কি অস্থির হওয়া চলে?"

মধ্যরাত্রির মুহূর্তগুলি মন্থর হইয়া আসিয়াছে,—এত নিঃশব্দতা বুঝি সহিবে না। আত্মীয়-পরিজনের অন্ত নাই,—সবাই প্রশস্ত ঘরে রোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত। এখন সবাই

সেবাশুশ্রুষা পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে—শেষনিশ্বাস-পতনের প্রতীক্ষায়। পরিবারের শিশুগুলি অন্য ঘরে দাসীর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে,-কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়া গত রাত্রে শোনা পথিক-রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখিতেছে, কেহ বা বসিয়া আপন আপন মা'র কথামত অর্থহীন অসম্পূর্ণ ভাষায় অচেনা ভগবানের কাছে অসম্ভব প্রার্থনা করিতেছে। সমস্ত ঘরে সুগভীর শান্তি বিরাজমান। অবনী বাবুর লঘু পদশব্দ ছাড়া কোথা হইতেও একটি অস্ফুট কোলাহল হইতেছে না। সৃষ্টি যেন গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া একটু দাঁড়াইয়াছে!

এইটি সুধী-র পড়িবার বসিবার শুইবাব ঘর। এই ঘরেই একদিন পড়িতে পড়িতে সুধী পিছন হইতে বাবার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল : "রংপুরে একটি মেয়ে দেখে এলাম,—প্রতিমার চেয়েও সুন্দর। সামনে ফাগুন মাস, কবির বলেন কাব্যের পক্ষে প্রশস্ত,তোমাকে একটি কাব্যলক্ষ্মীর সন্ধান দিচ্ছি।" সুধী একটু হাসিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল, —"কাল মার্কস্-এর কোনো জায়গায় এমন কথা লেখা নেই, বাবা।" অবনীনাথ বলিয়াছিলেন,—"তা না থাক্, নমিতা এখন নমিন্যালি আছে, তার জন্যে তোমার এক্জামিনের মার্কস কমবে না।" শেষ পর্যন্ত অবশ্য আপত্তি টি কে নাই, নমিতাকে বিস্তৃত শয্যার একটা সঙ্কীর্ণ অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। এই ঘরেই সুধী বোকার মত (প্রত্যেক স্বামীই বিবাহের প্রথম রাত্রির প্রথম সম্ভাষণে একটু বোকা হয়) নমিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আমাকে তোমার ভালো লাগবে?" নমিতা নিঃশব্দে কতকগুলি ঢোঁক গিলিয়া বলিয়াছিল,-"একবার যখন বিয়ে হয়েই গেছে তখন আর ভাল লাগালাগির কথাই নেই। আমাকে আরেকটু বড়ো হ'তে দিয়ে বিয়ের আগে দেখা করে' মতটা জিজ্ঞেস করলেই পারতে!" মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ, সুধী-র এত ভাল লাগিয়া গেল যে ফের বোকার মত বলিয়া বসিল,—"দেখো, আমাকে তোমার খুব ভালো লাগবে।"...একুশ বছর ধরিয়া সুধী এই ঘরে বসিয়া কত স্বপ্ন দেখিয়াছে। ইস্কুলে পড়িতে-পড়িতে তাহার মনে হইয়াছিল, পণ্ডিতমশাই হইয়া ছেলেদের বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিবার মত সুখ বুঝি আর কোথাও নাই; থার্ড ক্লাশে উঠিয়া সে ভাবিয়াছিল যে, সে মোক্তার হইয়া শালা আঁটিবে ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি রাখিয়া পেসকারকে ভয় দেখাইবে। ষোল বছর বয়সে সুধী কীসের Endynion পড়িয়া একটি অপরিচিত ভাববিলাসী ব্যর্থ-প্রেমিকের বেদনার স্বপ্নে তাহার স্বল্প-প্রসার ভুবনকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল; বি, এ পাশ করিয়া কঠিন রক্তাক্ত মাটিতে পা রাখিয়া সীমাশূন্য আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া দুই ফুসফুস ভরিয়া প্রচুর বাতাস নিতে-নিতে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল স্বাধীন গর্বিত ভারতের—উপরে উদার উজ্জ্বল আকাশ, পদনিম্নে উত্তরঙ্গ উদ্বেল সমুদ্র! এই ঘরে বসিয়াই।

পুত্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অরুণাকে দেখিবে এস,-মা'কে! চিত্রাপিতের মত বসিয়া আছেন। যে হাতখানা দিয়া নমিতা স্বামীর হাত ধরিয়া আছে, সেই হাতখানি অরুণা নিজের কোলের উপর টানিয়া লইলেন। কতদিন ধরিয়া যে ঘুমান নাই তাহা তাহার হতাশ স্থির দুই চক্ষুতারকা দেখিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব,—সব শ্রান্তি ও প্রতীক্ষার আজ চরম অবসান হইবে। অরুণার মন বাইশ বছর পূর্বের অতীততীরে উড়িয়া গিয়াছে। বাইশ বছর পূর্বে

অরুণা এই সংসারে পদার্পণ করিয়াছিল,–একটি বৎসর ফুরাইতে-না-ফুরাইতেই যখন অরুণার প্রথম সন্তানসম্ভাবনা হইল, তখনকার সেই সুখরোমাঞ্চময় অনুভূতিতে বিস্ময়ে সে বাণীহীন হইয়া গিয়াছিল। তাহার যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ভয় হইতেছিল। নভচারী কোন নক্ষত্র হইতে একটি জ্যোতি-স্ফুলিঙ্গ মতলে প্রাণ পাইবার আশায় তাহার শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে,–যেন কোন্ অতিথি-আত্মা—আত্মপ্রকাশের বিপুল ব্যাকুলতায় অরুণাকে মিনতি করিতেছে। সে-দিন মনে আছে অরুণ গভীর রাত্রে ছাতে উঠিয়া নক্ষত্রমণ্ডিত অবারিত আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা। করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পায় নাই, স্বামী ডাকিতে আসিলে তাহাব মনে হইয়াছিল, যে ক্ষুদ্র মাংসাপণ্ডটা তাহার জঠরে আকারহীন অবস্থায় সঙ্কুচিত হইয়া আছে, তাহা একদিন দৈর্ঘ্যে, আয়তনে ও বলশালি তায় ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠিবে—সৃষ্টির এই গৌরবপূর্ণ অভিজ্ঞতায় অরুণার মন ‘সুখাবেশে অবশ হইয়া পড়িল! এই ভ্রূণ একদিন কর্মে, সাহসে, তেজে, দীপ্তিতে অগ্রগণ্য হইবে, হয়ত বা ভালবাসিয়া একটি নিখিলব্যাপ্ত বিরহবেদনার কবি হইবে কে বলিতে পারে! কিন্তু সে যে আবার একদিন ক্ষণস্বপ্নের মতই কয়েকটি বর্ণের বুদ্বুদ তুলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তাহা কে কবে ভাবিয়াছিল! আর দু’টি মাত্র মুহূর্তের পর অরুণা কি বলিয়া ও কতখানি জোর দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। এতগুলি বৎসর ধরিয়া সে যত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, যত স্নেহ বর্ষণ করিয়াছে, তাহার এই ভয়ঙ্কর অকৃতার্থতা সে সহিবে কি করিয়া? ভালবাসা এত ভঙ্গুর কেন, আশা কেন এত অসহায়?

বসিয়া থাকিতে থাকিতে অরুণার এক সময় মনে হইল আজিকার রাত্রিটি তাহার জীবনের সাধারণ রাত্রিগুলির মতই একটা। পরীক্ষার সময় মাঝরাতে উঠিয়া ঘুমন্ত সুধীকে পড়িবার জন্য জাগাইয়া দিতে হইত,গায়ে ঠেলা দিলেই বুঝি সুধী এখনি হাত-পা মেলিয়া তেমনি জাগিয়া উঠিবে। টেবিলে আলো জ্বালিয়া সুধী পড়িতে বসিলে, অরুণা ছাতে উঠিয়া আকাশের কাছে সন্তানের কুশল প্রার্থনা করিবে, অন্ধকার স্বচ্ছতর হইয়া আসিতে থাকিলে, মাঠে নামিয়া ফুল কুড়াইয়া ছেলেকে গিয়া উপহার দিবে। অরুণার মনে হইতেছিল খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া পরে চাহিয়া দেখিলেই দেখিবে যে, এই রাত্রির চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি জাগিয়া-জাগিয়া এতক্ষণ একটা দুঃসহ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র। এই ভাবিয়াই তিনি চক্ষু বুজিলেন, হঠাৎ একটা অসংলগ্ন চীৎকারে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অবনীনাথ দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন।

ব্যাপারটা আবার আয়ত্ত হইল। কিন্তু গাঢ় নিদ্রায় অরুণার চক্ষুপল্লব ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে; নিদ্রা যে শোকমাধুর্যপূর্ণ বিস্মৃতি আনিয়া দেয়, তাহারই নদীতে তিনি এইবার স্নান করিবেন। এই ঘরদুয়ার স্বামী-পুত্র—সব অপরিচিত আত্মীয়; এত দিনের কঠিন কদর্য ক্লান্তির পর আজ তাহার ঘুম আসিবে। অরুণ ছেলের পাশে শুইয়া পড়িলেন।

ইহার পর আর দুইটি মিনিটু-ও বুঝি কাটিল না। রাস্তায় কিসের একটা শব্দ হইতেই, সবাই অসঙ্গত প্রত্যাশায় সচকিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ ফিরিয়া আসিল বুঝি।

সমস্ত আত্মীয়বন্ধু সুধী-র আরো কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল; একটা-বিয়াল্লিশ মিনিটের সময় সুধী যে নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহা আর ফিরিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার জন্য বাতাস ফুরাইয়া গেছে।

আশ্চর্য্য, অরুণার ঘুম ভাঙিল না। অবনীনাথ হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া ফু দিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিলেন; চীৎকার করিয়া কহিলেন, "খবরদার, কেউ কাদতে পাবে না—সবাই চুপ করে থাক, কারু মুখ। থেকে যেন একটাও শব্দ না বেরোয়, ওকে চলে যেতে দাও।"

খোলা জাল্লা গুলি দিয়া বন্যার মত অজস্র অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল—মৃত্যুর নিঃশব্দ তরঙ্গ! চাদ কখন অস্ত গিয়াছে,—আকাশে হঠাৎ মেঘ করিল নাকি,-রাত্রি বোধ হয় আত্মঘাতিনী হইল! ঘরে যতগুলি লোক ছিল অবনীনাথের আকস্মিক আর্তনাদে একেবারে হতবাক হইয়া গেছে; নিস্পন্দ, নিবালম্ব—কাহারো মুখে কথা ফুটিতেছে না। অবনীনাথ ঘরের মধ্যখানে একটা স্তম্ভের মত অচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর নমিতা কি করিবে কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ভয়ে স্বামীর হিম, শক্ত বাহুটা দুই হাতে মুঠি করিয়া আঁকড়িয়া রহিয়াছে।

দুইটা-কুড়ির গাড়িতে

দুইটা-কুড়ির গাড়িতে প্রদীপ যখন কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া ফিরিল, তখনো সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই যে সুধী মরিয়া গিয়াছে। ডাক্তার আনিয়া সে ভালই করিয়াছিল, নতুবা অরুণাকেও আর ফিরানো যাইত না।

ষ্টেশনে সোফার গাড়ি নিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রদীপ ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া প্লাটফর্মের বাহির হইতেই ড্রাইভার ডাকিল, "এই যে।"

প্রদীপ ডাক্তারের ব্যাগটা মোটরে তুলিয়া দিবার আগেই ভয়-ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিল, —"কেমন আছে এখন?"

মোটরে স্টার্ট দিয়া সোফার কহিল,—"তেমনি।"

কপালের উপর চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িতেছিল, বাঁ-হাত দিয়া কানের পিঠের কাছে তুলিয়া দিতে দিতে প্রদীপ কহিল,—"খুব হাঁকিয়ে চল, হরেন। দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছনো চাই।"

হরেন গাড়ি ছাড়িল। ডাক্তার যেন একটু ভয় পাইয়া বলিলেন,–"পথে য়্যাসিডেন্ট করে রোগীর সংখ্যা বাড়ালে বিশেষ সুবিধে হবে না। যে পথ-ঘাট,—আস্তেই চল হে।"

সরু, আঁকাবাঁকা পথ—নির্জন, নিস্তব্ধ, যেন একেবারে মরিয়া রহিয়াছে। দুই ধারে বড় বড় গাছ যেন নিশ্বাসরোধ করিয়া অন্ধকার আকাশের অনুচ্চারিত রোদন শুনিতেছে—একটিও পাতা নড়িতেছে না। প্রদীপ অনেকদিন ঘরের বাতি নিভাইয়া সুধী-র সঙ্গে সাহিত্যালোচনার অবকাশে গভীর রাত্রে মাঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—সে-রাত্রির স্তব্ধতা যেন একটি অনাস্বাদিতপূর্ব বেদনার লাবণ্যে মণ্ডিত ছিল, কিন্তু আজিকার এই নির্মম নিঃশব্দতা প্রদীপ সহ কবিতে পারিতেছে না। ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল,—"একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখবেন। ছোট কচি-বৌ,—সানে ওর বিশাল ভবিষ্যৎ! চমৎকার ছেলে, কী দারুণ স্বাস্থ্য ছিল।"

ডাক্তার কহিলেন,—"ছোট একটু হৃৎস্পন্দন নিয়েই মানুষের এই সুদৃঢ় দেহ, সুদীর্ঘ জীবন। এই স্পন্দনটুকু বন্ধ হলে বিজ্ঞানও বোব হয়ে গেল। আমাদের সাধ্য আর কতটুকু, ভগবান ভবসা। বাড়ি আর কতদুর হে? তোমাদের হবেন যে এবোপ্লে চালিয়েছে! দেখো।"

ডাক্তারের মুখে ভগবানেব নাম শুনিয়া প্রদীপ সুখী হইল না বটে, কিন্তু একবার অসহায় অন্ধবিশ্বাসে ভগবানের কাছে মনে-মনে প্রার্থনা করিয়া লইতে পারিলে যেন গভীর স্বস্তিলাভ

করিত। এই প্রগাঢ় প্রসুপ্তির মধ্যে মনে-মনে ঐ প্রকার একটা স্বীকারোক্তি যেন অসঙ্গত হইত না। যে-অবিশ্বাসী সমস্ত জীবন নাস্তিকতা প্রচার করিয়া মৃত্যুশয্যায় অনুমিত ভগবানের কাছে অনুতপ্ত কণ্ঠে ক্ষমা চাহিয়াছিল, তাহাকে মনে-মনে ধিক্কার দিয়া প্রদীপ সহসা বলিয়া উঠিল : "এই এসে পড়েছি, ডাক্তারবাবু। আপনি ঘুমুচ্ছেন নাকি? আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।"

এই মাঠটুকু পার হইলেই বাড়ির দরজায় গাড়ি থামিবে। ডাক্তারবাবু এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই ঝিমোননা সুরু করিয়াছেন দেখিয়া প্রদীপের এত রাগ হইল যে, উপকার পাইবার আশা না থাকিলে হয়ত মুখের উপর দুইটা ঘুসি মারিয়া বসিত। কোন নামজাদা বড় ডাক্তারই এত রাতে এই অসময়ে দূরে আসিতে রাজি হয় নাই, তাই এই চার-টাকার ডাক্তাবকে সে ধরিয়া আনিয়াছে; তাও কত সাধ্যসাধনা করিয়া। রোগীর আত্মীয়বর্গকে আশ্বাস দিবার মিথ্যা কলাকৌশলটা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই ডাক্তারবাবু এই যাত্রা সারিয়া গেলেন।

গাড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। হরেন হর্ণ বাজাইতে যাইতেছিল, প্রদীপ বাধা দিল। বাড়িতে কোনো ঘরে একটাও আলো জ্বলিতেছে না,সুধী-র ঘরেও না। ব্যাপার কি? সুধী বুঝি একটু ঘুমাইয়াছে। আঃ, প্রদীপ সুখে নিশ্বাস ফেলিল। সকাল বেলা যখন ডাক্তার আনিতে কলিকাতা যায়, তখনো সুধী যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, বিবর্ণ হইয়া ছটফট করিতেছিল,—এখন যদি তার চোখে তরল একটি তন্দ্রা। নামিয়া থাকে, তাহা হর্ণের শব্দে ভাঙিয়া যাইতে পারে। প্রদীপ ডাক্তারকে লইয়া নিঃশব্দে নামিয়া যাইবে। পার্শ্ববর্তী কোন-এক গ্রামের কে-এক সন্ন্যাসী কি-একটা শিকড় বাটিয়া খাওয়াইয়া সুধীকে নিরাময় করিয়া তুলিবে—এমন একটা কথা প্রদীপ শুনিয়া গিয়াছিল। হয়ত সেই সন্ন্যাসীর ওষুধ খাইয়া, সুধী শরীরের সকল ক্লেশ ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয়ত এই ডাক্তারকে আর দরকারেই লাগিবে না; টাকাগুলি গুনিয়া-গুনিয়া ডাক্তারের হাতে গুঁজিয়া দিয়া, উহাকে বিদায় দিতে তাহার যে কী ভাল লাগিবে বলা যায় না। ডাক্তারকে বরখাস্ত করিয়া একটা সন্ন্যাসীর অলৌকিক ওষুধের অসম্ভবপর সাফল্যে সে হঠাৎ বিশ্বাস করিতেছে ভাবিয়া তাহার হাসি পাইল না। সে যাহাকে প্রত্যক্ষরূপে লাভ করে নাই বলিয়া অস্বীকার করে, পৃথিবীতে তাহার অস্তিত্বই থাকিবে না এমন যুক্তি সে আজ গ্রহণ না-ই বা করিল। প্রদীপ কান খাড়া করিয়া রহিল। একটিও শব্দ আসিতেছে না, সমস্ত নীরবতা যেন গভীর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সুধী-কে ঘুমাইতে দেখিয়া সবাই হয় ত' সাময়িক অনুদ্বেগে একটু বিশ্রাম করিতেছে; নিভৃত ঘরে খালি নমিতা-ই হয়ত জাগিয়া শিয়রে বসিয়া আছে নির্নিমেষ চোখে; হয়ত লজ্জিত ভীরু কতখানি স্বামীর কপালের উপর রাখি: ভগবানকে সুধী ভাবিয়া-ই মনে মনে তাহার কাছে অসংখ্য অবদার করিতেছে। তাহা হইলে প্রদীপও আজ আঠারো রাত্রির বিনিদ্র তার শোধ লইবে; কিম্বা, নমিতা যদি তাহার উপস্থিতিতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে সেই ঘরে বসিয়াই ম্লান দীপালোকে তাহার ও সুধী-ব অসমাপ্ত উপন্যাসখানির কিয়দংশ আবার লিখিতে চেষ্টা করবে। উপন্যাসের নায়ককে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিল; তাহা হইলে, উপন্যাসকে অত সহজ করিয়া, সমস্যাকে অযথা খর্ব করিয়া তুলিবে না।

কে যেন বাড়ির সদর দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেছে। প্রদীপ চাহিয়া দেখিল,—এ কি, সুধী! প্রদীপ চমকিয়া উঠিল,সুধী যে দিব্যি হাটিতে পারিতেছে! সন্ন্যাসীদের এবার হইতে দেখা পাইলেই প্রদীপ পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইবে; চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে একটা কঙ্কালের কাহিল চেহারা এমন বলশালী হইয়া উঠিল! সুধী দরজাটা। বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া সিড়ির উপর দাঁড়াইয়া রিষ্ট-ওয়াচে সময় দেখিয়া লইল, যেন তাহাকে এখুনি ট্রেন ধরিতে হইবে। হঠাৎ প্রদীপের সঙ্গে চোখোচাখি হইতেই সুধী অল্প-একটু হাসিল—সেই পরিচিত নির্ম্মল হাসি, কতদিন এই হাসি সে দেখে নাই—তারপর ডান-হাতটা একটু তুলিয়া স্পষ্ট কহিল,—"চললাম, কথা বলবার এখন আর সময় নেই।" বলিয়াই সিড়ি হইতে নামিবার জন্য পা বাড়াইল। প্রদীপ বলিতে চাহিল : এই রাত করে কোথায় যাচ্ছি, ঠাণ্ডা লাগবে যে। কিন্তু সুধী-কে আর দেখা গেল না,ঐ রাস্তা ধবিয়া চলিয়াছে!

প্রদীপ চোখ কচলাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল : "বাড়ির ভেতর থেকে কে বেরুল রে হরেন? দেখলি নে? মোটর নিয়ে ফের ষ্টেশনে চল। ও কি হেঁটেই যাবে নাকি?"

হরেন একটা লণ্ঠন জ্বালাইতে-আলাইতে কহিল,-"কে আবার গেল? পথের একটা কুকুর।"

ডাক্তারবাবু সিট-এ ঠেসান দিয়া তখনো ঝিমাইতেছেন; প্রদীপ তাহার হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল : "আপনার ঘুমুবার জন্য খাট পেতে রেখেছি, উঠে আসুন দিকি।"

কথাটা ডাক্তারের কানে গেল না, কিন্তু ঝাঁকুনি খাইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং "এত রাতে জেগে থাকার অভ্যেস নেই" বলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন।

অতিনিঃশব্দপদে উঠান পার হইয়া প্রদীপ বারান্দাতে উঠিল। বারান্দার কিনারায় দুইটি অপরিচিত লোক চুপ করিয়া বসিয়াছিল, প্রদীপকে দেখিয়া তাহারা চঞ্চল হইল না পর্যন্ত; প্রদীপ-ও তাহাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না, জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন-ও বোধ করিল না। এই গহন নীরবতা তাহার সকল উদ্বেগের উপশম করিয়াছে; সুধী এখন একটু ঘুমাইয়াছে বলিয়াই কেহ একটিও শব্দ করিতেছে না;-বাতি নিভাইয়া সবাই তাহার ক্লান্তিমুক্ত নব-জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রদীপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"এই, বয়ে আসুন্। আলোটা একটু এদিকে, হরেন।"

চৌকাঠ ছাড়াইয়া ঘরে পা দিতেই প্রদীপ একেবারে বসিয়া পড়িল। যে-শোক প্রথম অভাবিত বিস্ময়ের আবেগে স্তব্ধ হইয়া ছিল তাহা আর সম্বরণ কব গেল না। প্রদীপ যেন মূর্তিমান ব্যর্থতাব মত আসিয়া দেখা দিযাছে,—নিরুদ্ধ শোক দিকে-দিকে অবারিত ও অজস্র হইয়া উঠিল! হরেন লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া ছোট ছেলের মত কাদিয়া ফেলিল,—আর,

প্রদীপ অশ্রুলেশহীন শুষ্ক কঠোর চোখে সুধী-র মৃত্যু কলঙ্কিত মুখের দিকে চাহিয়া চোখের পলক আর ফেলিতে পারিল না।

ইঁদুরের মত নিঃশব্দে ডাক্তার সরিয়া পড়িতেছিলেন, অবনীবাবু স্বাভাবিক সংযতকণ্ঠে কহিলেন,—"অমন বোকার মতো কাঁদে না, হরেন। যা, ডাক্তারবাবুকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আয় গে—চারটাচুয়ান্নতে একটা গাড়ি আছে। ভদ্রলোকের এতটা কষ্ট হ'ল। অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না, প্রদীপ। ওঁর ভিজিটের টাকা দিয়ে দাও, এই নাও দেরাজের চাবি।"

ডাক্তারবাবু বারান্দায় আসিয়া কাহাকে বলিতেছিলেন,—"মফঃস্বলে আমরা সচরাচর বত্রিশ টাকা নিয়ে থাকি। কর্ত্তাকে বলবেন, ফেরুবার ভাড়াটা যেন সেকেণ্ড, ক্লাশের হয়।"

অবনীবাবু প্রদীপের হাতে তাহার দেরাজের চাবিটা গুঁজিয়া দিলেন বটে, কিন্তু প্রদীপ নড়িতে পারিতেছিল না। সে ব্যথিত হইবে না বিস্মিত হইবে, কঁদিবে না সান্ত্বনা দিবে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতচেতন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই পৃথিবী, যাহার বিপুল মানুষের নির্ধারণের নহে, সেই পৃথিবীর কোথাও সুধী-র চিহ্ন রহিল না,-এই প্রকাণ্ড আকাশ হইতে সুধী-র দিবাস্বপ্নগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেল,—একাকী সুধী কত দূরপথে যাত্রা করিয়াছে, তিমিরগহন রুক্ষপথে অনির্ণীতের সন্ধানে—ভাবিতে-ভাবিতে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, পকেট হইতে বাক্স বাহির করিয়া সে সিগারেট ধরাইল।

মানুষের শরীর বলিয়া যে-বস্তুটি আছে

মানুষের শরীর বলিয়া যে-বস্তুটি আছে, তাহার আবদার না রাখিলেই নয়। অতএব, অরুণাকেও একদিন চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিতে হইল। শুধু তাই নয়, মাসে হিসাবের অতিরিক্ত তেল খরচ হইয়াছে বলিয়া;......1)2)3)।পনার অনুমতি চাই।”

প্রদীপ জানিত যে অরুণার চোখে জল আসিবে; তাই শোকাকে অযথা আর প্রশ্রয় না দিয়া কহিল,—“কলকাতায় গিয়ে ত’ চাকরির জন্য ফের পথে-পথে টো-টো করুতে হবে, দু’মুঠো জুটোতে হবে ত’! অনেক দিন থেকে গেলাম, চমৎকার থেকে গেলাম,—একেবারে নিখুঁত।”

প্রদীপের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া অরুণা বলিলেন, “আমাদের ভুলে যেয়ো না, প্রদীপ।”

প্রদীপ তক্তপোষের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—“আপনারা আমাকে ভুলে গেছেন কি-না তা দেখবার জন্যে আমাকেও মাঝে-মাঝে এখানে আসতে হবে। আশা করি, সুধী দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায় নি।”

অরুণার দুই চক্ষু পরিপূর্ণ করিয়া আবার অশ্রু আসিল, এবার আর মুছিলেন না। প্রদীপের পিঠের উপর বাঁ-হাতখানি রাখিয়া অনুরোধ করিয়া কহিলেন,–“আরো দু’টো দিন থেকে যেতে পার না? তুমি চলে গেলে এ-ফাঁকা কি করে সইব?”

প্রদীপ কহিল,—“আমার আর থাকা চলবে না, মা। এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু দেখে, এই অসহায় কাকুতি শুনে আমি ভারি দুর্বল হয়ে পড়েছি, মনে আমার অবসাদ এসেছে। এই বৈরাগ্য আমার জীবনের পক্ষে উপকারী হবে না। এর থেকে আমি ছাড়া পেতে চাই।” বলিয়া প্রদীপ অরুণার লাবণ্যমণ্ডিত মুখের পানে চাহিল।

“এখন কোথায় যাবে, কলকাতায়? কলকাতায় তোমার কে আছে? য্যাদ্দিন থেকে গেলে অথচ তোমার কোনো খোজই নেওয়া হ’ল না।”

প্রদীপ কহিল,—“খোঁজ নেওয়ায় বিপদ আছে, মা। খোঁজ যদি পেলে, তবেই ত’ বেঁধে রাখবার জন্যে হাত বাড়াবে; এই অবাধ্য বুনো ছেলেটাকে কেউ বাঁধতে পারেনি। বাঁধতে যাবে, অথচ হারাবে, সেই দুঃখ আর সেধে নিতে চেয়ো না, মা। আমি আবার আস্বো।”

এই ছেলেটির প্রতি অরুণার মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল, সুধী যেন প্রদীপকে প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছে। অরুণা কহিলেন,-"এমন কথা কেন বলছে প্রদীপ, স্নেহের বাঁধন কি এত সহজেই ছেঁড়া যায়? তুমি কি ভাবছে তোমাকে আমরা ভুলে যাবো?"

প্রদীপ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় উমা আসিয়া হাজির। উমা সুধী-র ছোট বোন, ম্লান ললিতত মেয়েটি, মৃদু-মৃগস্বভাব;—এই ষোলয় পা দিয়াছে। উমাকে দেখিয়াই অরুণা কহিলেন,—"তোর প্রদীপদা চলে যাচ্ছেন।"

উমা কহিল,-"আজই?"

প্রদীপ উত্তর দিল,—"আজই, উমা। কত কাজ কলকাতায়। আমাকে য়্যাদিন না দেখে ট্রাম বাস নিশ্চয়ই স্ট্রাই করে বসে আছে, রাস্তায় আলো জ্বলছে না।"

উমা হাসিয়া কহিল,—"রাস্তায় আলো জ্বলাবার চাকরিটা আপনার জন্যে পড়ে আছে! যাচ্ছিলেন ত' কাশ্মীর, য়্যাদ্দিনে কি তার মেয়াদ ফুরিয়ে যেত?"

"কাশ্মীর-ই বল বা কাশী-ই বল, কলকাতার ডাক দু সপ্তাহের বেশি উপেক্ষা করা যায় না। সুধী-র সঙ্গে সেই চুক্তি করেই বেরুচ্ছিলাম, কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি কোনো আদালত থাকে মা, সুধী-র বিরুদ্ধে সেই চুক্তিভঙ্গের মামলা আমাকে আনতেই হবে। এ-কালে সৌন্দর্য্য যদি কোথাও থাকে উমা, তা হলে কলেই আছে।"

বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া উমা কহিল,—"কলহেও।"

প্রদীপ বলিয়া চলিল,—"তাই ত' কলকাতা এমন করে আমার মন ভুলিয়েছে। আকাশের রোদন শুনে বেদ রচিত হয়েছিল পুরাকালে, এ-কালে আমরা যন্ত্রের যন্ত্রণা শুনে আবার মহাকাব্যের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। মাঠের চেয়ে শহর সুন্দর, মঠের চেয়ে ফ্যাক্টরি-প্রান্তরের চেয়ে প্রাচীর। প্রকৃতিকে কলকাতা যে বিকৃত করে তুলেছে, আমার তা'তে ভারি ভালো লাগে।"

উমা বিস্মিত হইয়া কহিল,—"বলেন কি? প্রকৃতিকে আপনার ভালো লাগে না?"

প্রদীপের স্বর কিঞ্চিৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল : "একটুও না। তুমি কলকাতায় গিয়ে মধ্যরাত্রে একবার ডালহৌসি স্কোয়ারের পারে দাঁড়িয়ো। সব ট্রাফিক্ বন্ধ, ঘন কালো রাত্রি নেমে এসেছে, চারপাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালান,—স্থির, নিরুত্তর, অভ্রভেদী—ওপরে তারকা-দীপ্ত বিস্তীর্ণ আকাশ। ভাব দেখি, কী কৃত্রিম, এবং কী করুণ!"

সমস্ত ছবিটি যেন উমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। সুধী-র কাছে উমা অনেক কিছু পড়াশুনা করিয়াছে; তাই ইহার পর বলিতে পারিল : "এই প্রকৃতির পূজা করেই কত কবি চিরকালের জন্য নাম করেছেন। ধরুন ওয়ার্ডসোয়ার্থ।"

প্রদীপ একটুখানি হাসিল, কহিল,—"যদিও তার wordsএর কোনো worth নেই। ভাগ্যিস জন্মেছিলেন কাম্বারল্যাণ্ড-এ, ছবির মত সবুজ গাঁয়ে—তাই প্রকৃতিকে নিয়ে এমন কেলেঙ্কারিটা তিনি কবুলেন। জন্মাতেন এসে সাহারায়, কিম্বা গ্রীষ্মকালের মধ্যভারতে, লু-তে লুণ্ঠিত হ'তেন, তবে বুঝতেন মজা। ঝড়ে যার নৌকোডুবি হয় উমা, সে বর্ষা নিয়ে আর কবিতা লেখে না।"

উমা বলিল,-"আপনি এবার কলকাতায় গিয়ে বেথুন-বোর্ডিঙে আমার জন্যে একটা সিট রাখবার চেষ্টা করবেন, বুঝলেন?"

অরুণা হাসিয়া কহিলেন,—"এই হয়েছে। ওর মাথা এবার বিগড়ালো।"

উমা চটিয়া কহিল,—"মাথা বিগড়ালে কি? দাদার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পড়াশুনোও চুলোয় যাক্, না? কলকাতায় ত' এবার লোক্যাল গার্ডিয়ান্ পেলাম, গিয়ে গিয়ে দেখা করবেন ত'?"

প্রদীপ কহিল,—"সময় হয়ত করে নিতে পারুববা, কিন্তু কলকাতা গিয়ে তোমারই সময়টা বৃথা অপচয় হবে। তার চেয়ে আর একটা। বছর এখেনে এই শালবনের তীরে বসেই বইগুলোর সঙ্গে শুভদৃষ্টি করুতে থাক—ম্যাটিটা তুমি তাতেই উৎরে যাবে। তারপর না-হয়। কলেজে গিয়ে কলি ফিরিয়ো।"

উমা কহিল,—"আমার বেলায় বুঝি শালবনের টনিক প্রেস্ক্রাইবড, হ'ল! লক্ষটা শাল গজা, কিন্তু এখানে একা বসে থাকলে লক্ষ বছরেও আমার ম্যাট্রিক পাশ হবে না।"

প্রদীপ হাসিয়া বলিল,—"তাতে বরং ভালোই হবে—মাঝখান থেকে তোমার লক্ষ বছর বাঁচা হয়ে যাবে।"

অরুণা চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—"একবার যখন গোঁ ধরেছে, সহজে ছাড়বে ভেবেছ?"

"আমি এক্ষুনি বাবার মত নিয়ে আসছি।" বলিয়া উমা ছুটিয়া বাহির হইতেই প্রদীপ তাহাকে ডাকিয়া বাধা দিল; কহিল,—"কলকাতায় মেয়ে-ইস্কুলের বোর্ডিংগুলোর কথা ত' আর জান না, তাই অমন খেপে উঠেছ। ওখানে মেয়েদের খেতে দেয় না, তা জান? বিকেল পাঁচটার সময় ভাত খাইয়ে সমস্ত রাত উপোস করিয়ে রাখে, ঝি-দের সুবিধে করুতে গিয়ে ঝিয়ারিদের শুকিয়ে মারে। ও জুজু-মাসির বাড়ি যেতে। নেই, উমা। খালি

দেয়াল আর কাঠ,-একঘেয়ে কাঠিন্য, জুলুম। হাওয়া নেই, এই শালতরুমর্ম্মর সেখানে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, আকাশের অর্থ সেখানে মহাশূন্য!"

উমা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল : "এই ত এতক্ষণ কলকাতার কালি আর কলের গুণকীর্ত্তন হচ্ছিল। সেখানে আকাশ নেই বলে ত' আপশোষ করবার আপনার কারণ ঘটেনি। আপনার মতো আমিও না-হয় হাওয়ার বদলে ধোঁয়া খাবো।"

প্রদীপ কহিল, "ধোঁয়া আমার সয়, কিন্তু বিকেল পাঁচটার সময় পেট পুরে ভাত আর কপির ডাটা খেতে হলে সারারাত তোমার চোয়া ঢেকুর উঠবে। ছেলেদের যা সয়, মেয়েদেররা কি তাই সইবে ভেবেছো?"

উমা এইবার রীতিমত চটিয়া উঠিল : "না, সয় না! ছেলেরা সব হনুমান কি-না। সব থার্ড ডিভিশানে পাশ করে।"

"আর মেয়েরা করে ফেল।" "ইস, নিয়ে আসুন ত' ক্যালেণ্ডার।"

"ক্যালেণ্ডারে বুঝি ফেল-এর সংখ্যা থাকে? তুমি ছেলেদের হনুমান বলে বটে, কিন্তু রামায়ণে হনুমানের মতো বীর আর কি আছে! সেতু বেঁধে দিলে কে?"

"তা' আর জানি না? নিজের ল্যাজে আগুন ধরিয়ে সমস্ত লঙ্কা পুড়িয়ে দিলে কে? হনুমানের কথা আর বলবেন না। ও একটা প্রথম নম্বরের ইডিয়ট। বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে গোটা গন্ধমাদন পর্বতটাই নিয়ে এল।"

"ইডিয়ট, কিন্তু কি প্রকাণ্ড বীর ভেবে দেখ। কোনো বানরনন্দিনীকে পাঠালে তিনি সমস্ত জীবন ধরে ঐ বিশল্যকরণী-ই খুঁজে বেড়াতেন, লক্ষ্মণ আর বাতো না।"

উমা আরো উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল,-"নাই-বা বাঁচত! ঐ দ্বিতীয় ইডিয়ট লক্ষ্মণ—রাম ফল এনে ওর হাতে দিয়ে বলতেন—ধর, আর ও এমন গর্দত যে সে ফল ধরে'ই থাকৃত, খেত না। এম্‌নি করে চোদ্দ বছর লোকটা না খেয়ে বেঁচে রইল। যদি রাম বলতেন—মুখে তোল, ও মুখে তুলত বটে, কিন্তু নিশ্চয় চিবোত না; যদি বলতেন—চিবোও, ও কখনো গির্ত না দেখো।"

প্রদীপ আর অরুণা দু'জনেই হাসিয়া উঠিলেন। উমা বলিয়া চলিল,—"আর ইডিয়ট-শ্রেষ্ঠ রাম সামান্য ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে ভেবে সোনার সীতাকে বনে পাঠালেন-সেই সীতা, যে তার জন্যে সারাজীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে ছিল। আর যেমনি ধোপারা কাপড় কাচতে ও নাপিতরা দাড়ি চাঁছতে রাজি হ'লঅমনি আবার উনি সীতার জন্যে মাতামাতি সুরু করে দিলেন। ধন্যি মেয়ে সীতা—ঐ মাতালটাকে ছেড়ে পাতালে গিয়ে মুখ ঢাকৃলে।"

প্রদীপ আমোদ অনুভব করিয়া কহিল,—"তোমার এই সার্টিফিকেট নিয়ে বেচারা বাল্মীকি বাজারে আর তার রামায়ণ কাটাতে পাবেন না।"

"ছেলেদের কথা আর বলবেন না, সব টুকে পাশ করে।"

"টোকবার মতো ট্যাক্ট মেয়েদের নেই বলে'। একটা কথাতেই তফাৎ ধরা যাচ্ছে, উমা। তুমি ছেলে হলে এই একা-একা পরীক্ষাসমুদ্র উত্তীর্ণ হ'বার ভয়ে এত ভড়কাতে না।"

"কাজ নেই আমার হনুমান হ'য়ে।" বলিয়া উমা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল; কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। কহিল,—"দাদা নেই, সমস্ত বাড়ি খাঁ খাঁ করছে, বৌদি কঁদতে গিয়ে বোবা হয়ে গেছে, মা দিবারাত্রি চোখের জল ফেলেন, বাবা পাগলের মতো পাইচারি করে' বেড়ান,—আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কলকাতায় আমাদের কেউ আত্মীয় থাকলে আপনার সঙ্গেই চলে যেতাম এবার। আমি যাবোই পড়তে।"

উমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, অরুণা ডাকিলেন। উমা ফিরিল। অরুণা কহিলেন, —"বৌমা কোথায়?"

"স্নান করতে গেছে।"

"তোর প্রদীপ-দা আজ চলে যাচ্ছেন, ঠাকুরকে বল কিছু ভালো করে বেঁধে দিতে। বৌমার ঘরে উনুন ধরিয়েছিস?"

"এই যাই।" বলিয়া উমা দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষণকালের জন্য আবহাওয়াটা স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছিল, সহসা আবার গাঢ় মেঘ করিয়া আসিল। সেই মেঘান্ধকার নমিতার দুই নিঃসহায় চক্ষু হইতেই ঝরিয়া পড়িতেছে। এই দৃশ্যে নমিতার আবির্ভাব হইল না বটে, কিন্তু প্রদীপের মনোমুকুরে যাহার ছায়া পড়িল সে হয়ত ঠিক নমিতা নয়, একটি কল্পনাভরণা দুঃখৈশ্বর্য্যময়ীর ছবি। কবির কল্পনা উন্নত হইতে-হইতে ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া যে মহিমাময়ী নারীমূর্তি পরিগ্রহ করে, ঠিক সেই মুর্তি! তাহাকে নমিতা বল, কিছু ক্ষতি হইবে না।

মেস-এর ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া

মেস্-এর ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া প্রদীপ উপরে আসিয়া দেখিল, তাহার নামে এক চিঠি আসিয়াছে। ঠিকানায় হাতের লেখা দেখিয়াই পত্র-লেখককে চিনিল এবং সেই জন্যই তৎক্ষণাৎ চিঠিটা খুলিল না। আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া শক্ত চিরুনি দিয়া নিজের রুক্ষ চুলগুলি ছিঁড়িতে-ছিঁড়িতে ম্যানেজারের উপর রাগটা প্রশমিত করিতে লাগিল।

এই যুগে ভীষ্মকে হয় ত' প্রদীপ ক্ষমা করিত না, কিন্তু তাই বলিয়া পৈতৃকসম্পত্তি অটুট রাখিবার জন্য সুধী-র এই পিতৃভক্তিকেও স্বর্গারোহণের সোপান বলিয়া সে স্বীকার করিতে পারে নাই। তাই সুধী-র বিবাহে সে ত' যায়ই নাই, বরং তাহাদের দুইজনে যে উপন্যাসখানি লিখিতে সুরু করিয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া দিয়া সুধী-কে লিখিয়াছিল : তোমার বর্তমান মনোভাব নিয়ে তুমি উপন্যাসের চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। অতএব এই খাতাগুলি তুমি ফিরিয়ে নাও। যেটুকুন লেখা হয়েছে তাই একদিন তোমাদের অভ্যস্ত বিরস জীবনযাপনের ফাঁকে তোমার ভার্য্যাকে পড়িয়ে শুনিয়ে ও যথাসময়ে তোমাদের প্রথম শাবকের আবির্ভাবের পরে কালক্রমে যখন তার জন্যে মাতৃস্তন্য অকুলান হয়ে উঠবে, তখন গো-দুগ্ধ তপ্ত করবার জন্যে এই খাতাগুলো ব্যবহার করা। ইতি।

তাহারই উত্তরে এই বুঝি সুধী-র চিঠি আসিল—সাত মাস বাদে। আশ্চর্য্য হইবার কারণ আছে বৈকি। এবং আশ্চর্য হইবার কারণ ঘটিলে কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে বেশিক্ষণ চিরুনি চালানো অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব ম্যানেজারের পিতৃকুলকে নরকে পাঠাইয়া প্রদীপ চিঠি খুলিয়া ফেলিল।

সুধী বেশি কিছু লিখে নাই; শুধু দু'টি কথা: যত শিগগির পার চলে এস। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

সাত মাসে নদী শুকাইয়া যে চর জাগিতেছিল, তাহাকে কখন এবং কি করিয়া যে অজস্র জোয়ার আসিয়া ভাসাইয়া দিয়া গেল, তাহা সত্যই বুঝা গেল না। প্রদীপ তখুনি তাহার ছেড়া সুটকেসটা নিয়া ম্যানেজারের ভাতের থালায় লাথি মারিয়া ষ্টেশনের মুখে বাহির হইয়া গেল।

সুধী-দের বাড়িতে যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখনো বিকালের আলোটুকু আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। দুয়ারের কাছেই উমার সঙ্গে প্রথম দেখা। প্রদীপ সরাসরি জিজ্ঞাসা করিল,—"সুধী কোথায়?" উমা ভড়কাইয়া গিয়া কি বলিবে কিছু ভাবিতে না ভাবিতেই, প্রদীপ প্রায় উমার গা ঘেঁসিয়া তাড়াতাড়ি যে-ঘরটাতে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহারই এক কোণে দরজার দিকে পিছন করিয়া সুধী তখনো টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া তন্ময় হইয়া বই পড়িতেছে। হঠাৎ প্রদীপ তাহার দ্রুত পদবিক্ষেপগুলিকে সংযত করিয়া লইল। অতি

ধীরে নিঃশব্দপদে সুধী-র পিছনে আসিয়া দুই হাত দিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। অল্প একটু মুখ তুলিয়া সুধী কহিল,—"এই উঠছি নমিতা, এখনো ঢের আলো আছে। বেশ অন্ধকার করে না এলে শালমর্ম্মরের সঙ্গে মানুষের প্রেমগুঞ্জনের সঙ্গতি হয় না। ছাড়, দেখি কেমন সেজে এলে।"

চক্ষু হইতে হাত দুইটা সরাইয়া সুধীর কর্ণমূলে স্থাপন করিয়া প্রদীপ কহিল,-"এই তুই পাণিগ্রহণ করেছিস! মূখ। এখনো হাত চিনিস নি?"

সুধী চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। আনন্দদীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "তুই এই অসময়ে এসে পড়লি? কখন চিঠি পেয়েছিস?"

"অসময়ে এসে পড়েছি বলে' এই গণ্ডারের চামড়ার হাতকে তুই এমন অসম্মান কবি? বিয়ে করে তুই কাণা হয়ে গেলি নাকি?"

"দাঁড়া।" বলিয়া সুধী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মুহূর্তমধ্যে যাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া প্রদীপ এতটা অভিভূত হইল যে, মানুষের ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে একাকী আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া নিঃসঙ্গ প্রদীপ এমনি করিয়াই অভিভূত হইত হয়ত। একদিন পুরী-ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া সমুদ্রের খোঁজে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, গাছ আর বৃক্ষান্তরালে আকাশের টুকরো; সহসা এক সময়ে দেখিল সমস্ত গাছ সরিয়া গেছে, দৃষ্টিকে অপরিসীম মুক্তি দিবার জন্য আকাশ শূন্যে বিলীন হইয়া গেছে—সম্মুখে ফেনফণাময় মহাসমুদ্র! সেদিন প্রদীপ এমনিই অভিভূত হইয়াছিল। বিকালবেলা স্বামীর সঙ্গে শালবীথিতলে কয়েকটি নিভৃত মুহূর্ত যাপন করিবার জন্য নমিতা সাজিয়া আসিয়াছে, সেই দেহসজ্জায় কীই-বা ছিল আর! প্রদীপ রূপ দেখিল না, দেখিল বিভা—প্রতিভামণ্ডিত ললাটে ব্রীড়ার স্নিগ্ধতা, বুদ্ধিবিকশিত চোখে কুণ্ঠার মাধুর্য্য! নমিতা যেন শরীরী আত্মা, যেন শেলির মূর্তিমতী কবিস্বপ্ন! প্রদীপ এমন পাগল যে, হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া তৃপ্ত হইবে না বলিয়া, নীচু হইয়া নমিতার পা স্পর্শ করিয়া বসিল।

সুধী বলিল,-"তুই যে দেবর লক্ষ্মণের মতো মুখ ছেড়ে পা-কেই বেশি মর্যাদা দিচ্ছিস?"

নমিতা লজ্জায় চক্ষু নামাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, আর, এমন একটা মুহূর্তে কেহ এমন একটা বাজে রসিকতা করিতে পারে ভাবিয়া প্রদীপের আর কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না।

সুধী নমিতাকে কহিল,—"তুমি নিশ্চয়ই এ কে, বুঝতে পেরেছ। আমাদের উপন্যাসের নায়কের মাথাটাকে যে ভাগ্যের পায়ের ফুটবল বানিয়েছে। ভালো করে চেয়ে দেখ। ঘরে অতিথি এসেছেন, আর্যপুত্রের কুশল প্রশ্ন কর। তুমি সীতা-সাবিত্রীর মাসতুতো বোন হ'য়ে অমন ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় গুজে থাকলে চলবে কেন?"

প্রদীপ কহিল,—“একলা তোমার সম্বর্ধনাই যথেষ্ট হয়েছে। বৌদির নীরব সহানুভূতিটির মূল্য তার চেয়ে কম নয়।”

সুধী। (নমিতার প্রতি) মুখে ও তা’ বলছে বটে, কিন্তু অমন শ্রীমুখের কথা না শুনে ওর পেট নিশ্চয়ই ভরূবে না। তুমি যাদ আজ আকাশের তারাগুলোর যোগাযোগে প্রদীপের দীপধারিণী হতে, তা হ’লে আমি তোমার ঐ বোব মুখের ওপর অত্যাচার করে কথা ফোটাতাম।

নমিতা সুধী-র কনুইয়ে চিমটি কাটিয়া দিল।

সুধী। এ চিমটি তুমি প্রদীপকেও উপহার দিলে বেমানান হত। কেননা সাত মাস আগে তোমার উপর ওর দাবি আমারই সমান। ছিল। তোমার গায়ের গয়না যথেষ্ট নয় দেখে, আমি যদি বিয়ে-সতা থেকে সরোষে গাত্রোত্থান করতাম, আর প্রদীপ যদি সেই পরিত্যক্ত পিঁড়িতে এসে বস্ত, তা হলে তোমার আজকের এই রমণীয় কুণ্ঠাটি আমারই একান্ত উপভোগ্য হ’ত। ও তোমাকে প্রণাম কবুল, আর তুমি ওকে সামান্য একটু চিমটি কাটবে না?

নমিতার পক্ষে ই দাঁড়াইয়া সহ্য করা অস্বাভাবিকরূপে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। স্বল্প একটু ‘যাও’ বলিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইলে প্রদীপ বলিল,—“এ তোমার বাড়াবাড়ি সুধী!”

সুধী। বাড়াবাড়ি মানে? নমিতাকে পাবার জন্যে কী মূল্য দিয়েছি? সমাজকে মেনে নিয়ে ওর দেহের ওপর একচ্ছত্র রাজত্ব করছি বটে, কিন্তু ওর মনকে আমারই মুঠির মধ্যে চেপে ধরে মলিন করে দেব, আমি সে-বর্বরতা সহ্য করতে পারবো না। ওর লজ্জা তোমাকে জোর করে’ ভেঙে দিতে হবে।

প্রদীপ। ওর লজ্জা ভাঙতে গিয়ে তোমারো মন যদি ভেঙে যায়?

সুধী। (দৃপ্ত-স্বরে) ভাঙুক! এই ঠুনকো মন নিয়ে আমি বাঁচতে চাই নে।

প্রদীপ। তোকে পাগলা কুকুরে কামড়ালে কবে?

সুধী। ঠাট্টা নয়; নমিতাকে আমার ভালো লাগে নি, লাগবেও না।

প্রদীপ। বলিস কি? এমন সুন্দর মেয়েটি থামিয়া গেল)

সুধী। হ্যাঁ জানি, কিন্তু পরখ করে দেখলাম নারী-মাংস আমার রুচবে না। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করবার মত আমার মনের সেই প্রশান্তি বা প্রশস্ততা কিছুই নেই। আমি জীবনে যে ভুল করে বসেছি, তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে তোর সাহায্যের দরকার হয়েছে।

প্রদীপ। যথা?

সুধী। নমিতাকে জাগিয়ে দিতে হবে। ও আমাকে ভয় বা ভক্তি করতে পাবে বটে, কিন্তু ভালোবাসতে পারবে না; কারণ, আমাকে কোনো দিন হারাবে বলে' ওর মনে না থাকবে সন্দেহ না-বা আশঙ্কা। ও জল হয়ে চিরকাল আমার গ্লাশের রঙ ধরে থাকবে। ওর মধ্যে স্থিরতা থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণ নেই। যার প্রাণ নেই সে কুৎসিত।

প্রদীপ। অন্ধকারে ঘরে বসে থেকে সব ঝাপসা দেখছি। চল বেরোই।

সুধী। বাইরেও অন্ধকার বটে, কিন্তু মুক্তি আছে, বিস্তৃতি আছে। নমিতাকে তোর মানুষ করে দিতে হবে; ওর আত্মার অবগুণ্ঠন যদি ছিড়ে ফেলতে পারি ভাই, তবেই হবে ওর পুনর্জীবন!

প্রদীপ। তুই তা হলে কি করতে আছিস, গর্দভ?

সুধী। ওর শরীরের ওপর পাহারা দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করবার নেই। তোর সঙ্গে নমিতার সম্পর্কে-ই একটা বন্ধনহীন ক্ষেত্র আছে, তোর কাছে ও নবীন, মধুররূপে অনাত্মীয়, সেইখানেই তোদের পরিচয় ঘটুক। তোর মাঝে নমিতাকে আমি পুনরাবিষ্কার করতে চাই।

প্রদীপ। এই সাত মাসেই এত সব সিদ্ধান্ত হয়ে গেল?

সুধী। রমণীর মন লক্ষ বর্ষ ধরে'ও আয়ত্ত করা যায় না, উনবিংশ শতাব্দীর এই সেন্টিমেন্টাল উক্তি আমি বিশ্বাস করি না। তাতে শুধু আয়ুরই বৃথা অপচয় ঘটে। আমার হাতে অত সময় নেই।

প্রদীপ। (হাসিয়া) আর আমারই আছে? এর জন্যে তুই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিস? ভেবেছিলাম কারু অসুখ হ'ল বুঝি। আমাকে তোর ভীষণ দরকারের এই যদি নমুনা হয়, দে, সুটকেশটা এগিয়ে দে, চললাম ফিরে'। ফমাসে কবিতা এলেও বন্ধুতা আসে না।

এই সময় বেড়াইতে যাইবার পোষাকে অবনীনাথ সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে অপরিচিত লোক দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি একটু ইতস্তত করিতেছেন, সুধী আগাইয়া আসিয়া কহিল,—"এ আমার বন্ধু, প্রদীপেন্দ্র বসু—ভারতের ভাবী 'ডেলিভারার।"

অবনীনাথ বিস্মিত হইবার আগেই প্রদীপ বলিল,—"তার মানে?"

সুধী। (অবনীনাথের প্রতি) ইনি এক চড় মেরে এক গুণ্ডাকে শুইয়ে দিয়েছিলেন!

অবনীনাথ। তাই নাকি? দেখি, আমার সঙ্গে পাঞ্জা ধর ত'! (শিশুর মত সরলবশ্বাসে হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

প্রদীপ। (সঙ্কুচিত হইয়া) গুণ্ডা ঠেঙিয়ে আমি যদি ভারতের কনিষ্ঠ ডেলিভারার হই তা হলে দু' পাতা গল্প লিখে সুধী নিশ্চয়ই ভলটেয়ার হয়েছে।

প্রসন্নহাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া অবনীনাথ কহিলেন,—“কয়েক দিন আছ ত'?”

প্রদীপের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া সুধী বলিল,-“নিশ্চয়ই।”

তাহার পর বন্ধুকে লইয়া সুধী একেবারে রান্নাঘরে আসিয়া হাজির,-সেখানে তাহার মা বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন। সুধী হাঁকিল,—“তোমার জন্যে আরেকটি ছেলে কুড়িয়ে আনলাম, মা। আরেকটি বাতি জ্বলল।”

প্রদীপ প্রণাম করিতেই অরুণা কহিলেন,—“তোমার কথা অনেক শুনেছি আগে, সুখী-র সঙ্গে তোমার অনেক দিনের চেনা; অথচ আগে দেখিনি। ওর বিয়ের সময় ত' রাগ করেই এলে না।”

প্রদীপ অল্প-একটু হাসিল, কহিল,সুধী-ও বিয়ে করে বয়ে যাবে এ-আঘাতের জন্যে তৈরি ছিলাম না। নিয়তিকে আমবা খণ্ডিত কবুব এই ছিল আমাদের পণ। দেখলাম পণের টাকা মিললে নিয়তি যথারীতি কাঁধে চড়াও হয়।”

সুধী নমিতার খোঁজে তাহার শুইবার ঘরে আসিয়া উঠিল। দেখিল, নমিতা তাহার বেড়াইবার দামী কাপড়-চোপড়গুলি ছাড়িয়া সাদাসিধা একখানি আটপৌঁরে শাড়ি পরিয়াছে। সুধী কহিল,—“হঠাৎ এ বেশ? আমার বন্ধুকে দেখে এক নিমেষেই তপস্বিনী সেজে গেলে নাকি?”

নমিতা। বন্ধু এসেছেন; এখন বেড়াতে যাবে কি? যাও!

সুধী। বাঃ, বন্ধু এসেছে বলেই মাঠে যাওয়া বন্ধ করে আমাকে এমন সন্ধ্যাটা মাঠে মাব্রুতে হবে নাকি? দাঁড়াও, ডাকি প্রদীপকে।

নমিতা। (বাধা দিয়া) দরকার নেই আজ গিয়ে। অমি যাবো না কখনো।

সুধী। কেন? আমার বন্ধুকে তোমার কিসের ভয়? তোমাকে ভয় দেখাতে ও বন্দুক নিয়ে আসেনি, যদিও তোমাকে জয় করতে দুই চক্ষুর দৃষ্টিই ওর যথেষ্ট।

নমিতা মনে মনে স্বামীর উপর নিদারুণ চটিতেছে, এমন সময় সুধী-র ডাকাডাকিতে প্রদীপ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুধী। (নমিতাকে দেখাইয়া) দেখলে?

প্রদীপ। বেশ ত, নিরাভরণেই শ্রী। তারা ফোটার আগেকার স্নিগ্ধ গোধূলি-আকাশটুকুর মতই তোমাকে দেখাচ্ছে, বৌদি।

সুধী। এই যাঃ, মাটি করে দিলে! প্রদীপ। তার মানে?

সুধী। ঐ 'বৌদি'-কথাটা এসে এমন সুন্দর উপমাটাকে একেবারে বধ করলো। কর্ণ, বধির হও! (নমিতাকে) তুমিও যদি এবার কৃপা করে' ওকে ঠাকুরপো বলে ডাক, তবেই কলির পাপ চারপোয়া পূর্ণ হয়ে ওঠে।

হাসিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দ্বারান্তরালে তাহার যখন পুনরাবির্ভাব হইল, দেখা গেল, উমার ঘর হইতে সে আরেকখানা শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। না সাজিলে তাহার লজ্জা যেন ঘুচিবে না। আড়ষ্ট হইতে না পারিলে তাহার এই অপরিচয়ের দৈন্য তাহাকে কেবলই পীড়া দিতে থাকিবে। ভাবের অভাব ঘটিলেই ভাষায় বর্ণবাহুল্যের প্রয়োজন ঘটে—নমিতা সেই ভাববিরহিত অলঙ্কত ভাষা, মূক, নিরর্থক!

উঠানটুকু পার হইবার সময় অরুণা বলিলেন,—"ওকে এক্ষুনি বেড়াতে নিয়ে যাবি কি? এসে একটুও বিশ্রাম করল না।"

সুধী। শালের বনে বসে'ই বিশ্রাম করা হবে 'খন।

অরুণা। বাঃ, একটু জলখাবার খেয়ে যাক্।

সুধী। তুমি ততক্ষণ তৈরি করতে থাক,—তার চেয়ে হাওয়ায়ই বেশি উপকার হবে। তুমি বরং উমাকে ডেকে নাও, বৌ-র সাহায্য আজ পাচ্ছ না! বলিয়া সুধী হাঁক ছাড়িল,—"উমি উমি!"

উমা তবুও লুকাইয়া রহিল।

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর অবারিত অনুরাগের মাঝে একটি স্বচ্ছ অন্তরাল রচনা করিয়া তাহাকে মধুর তর করিয়া তুলিবার জন্য যে-তৃতীয়। ব্যক্তিটির আবির্ভাব শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, প্রয়োজনীয়, সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে ত্যাগ করিয়া সহসা স্বামী যদি অন্তর্হিত হয়, তবে ব্যাপারটা সত্যই বিসদৃশ হইয়া উঠে। সুধী-কে পাশে না দেখিয়া প্রদীপের স্নায়বিক দৌর্বল্য উপস্থিত হইল। কিছু একটা কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শালবীথিকে বেষ্টন করিয়া প্রশান্ত ধ্যান-গাম্ভীর্যের মত যে-সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিতেছে, একটা সামান্য ও সাধারণ কথা বলিয়া তাহার তপোভঙ্গ করিবার দুঃসাহস প্রদীপের হইল না। যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। অদূরে নমিতা সঙ্কোচে, ভীরুতায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেছে। নিজের বসিবার ভঙ্গীটি হইতে সুরু করিয়া। এই অর্থহীন নিস্তব্ধতা পর্যন্ত তাহার কাছে অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া উঠিল।

এমন মুস্কিলে কে কবে পড়িয়াছে! এত নিকটবর্তী হইয়া ও এমন অনুচ্চারিত পরিচয় লইয়া কাহারা মুহূর্ত গুণিয়াছে! শালের বনে সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় হৃদয়ের ভাষায় আলাপ করিবার জন্য মানুষের মুখের ভাষা। যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয় নাই কেন? ইহার চেয়ে যদি প্রদীপদের মেসের কাছে গ্যাসপোসটের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া একটা ছাড়া গাড়ি উল্টাইয়া পড়িত, তাহা হইলে গাড়ির মধ্য হইতে আহত সুধী ও নমিতাকে নামাইয়া তাহার ঘরের ষ্টোভে দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া আলাপ জমাইতে বেগ পাইতে হইত না। কিম্বা, কল্পনা করা যাক, সুধী ও নমিতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে হাওয়া খাইতে গিয়া একটা বেঞ্চিতে। বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় ছোরা-হস্তে এক গুণ্ডার আবির্ভাব হইল, অমনি পেছন হইতে যুযুৎসুর এক পাচ কসিয়া নিমেষে প্রদীপ ব্যাপারটাকে ইন্দ্রজালের চেয়েও রোমাঞ্চময় করিয়া তুলিল—এমন সাহসিক কীর্তি যে সে দুই একটা করে নাই তাহা নয়। তাহা হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলাপ করিবার ভার পড়িত নমিতারই উপর (ধরা যাক সুধী উপস্থিত ছিল না), প্রদীপকে তাহা হইলে এমন ঘামিতে হইত না। কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে আলাপটা কথা না কওয়ার মতই সহজ হইয়া উঠিত। এই সময় শুকনা পাতার ভিড় সরাইয়া একটা সাপ আসিয়া দেখা দিলেও অসঙ্গত হইত না—হিংস্র সাপ অনায়াসে কবিতার বিষয়ীভূত হইতে পারিত। কথা কহিতে পারিবে না, অথচ এই অতলস্পর্শ স্তব্ধতায় আত্মার গভীরতম পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে, মানুষের ভাষাকে বিধাতা এত অসম্পূর্ণ ও নিস্তেজ করিয়াছেন কেন? যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই ত জ্ঞানের একমাত্র মূল নয়; কিন্তু যাহা প্রকাশের অতীত হইয়াও অনুভবের অগোচর নয়, সেই চেতনাকে নমিতার প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দিবার উপায় কোথায়? এই নীরব আকাশকে ব্যঙ্গ না করিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে অকৃত্রিম সঙ্গতি রাখিয়া এই হৃদয়চাঞ্চল্যটিকে প্রকাশিত করিবার অমিতশক্তি বাঙলা-ভাষা কবে লাভ করিবে?

সুখনিদ্রার মত অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছে, অথচ সুধীর ফিরিবার নাম নাই। অবশেষে প্রদীপের মুখে অজ্ঞাতসারে ভাষা আসিল : "আর বসে কাজ নেই, চল।" এবং এই একটি মাত্র আহ্বানে নমিতা উঠিয়া পড়িল দেখিয়া, প্রদীপের খেয়াল হইল যে সে কথা বলিতে পারিয়াছে। এবং একবার যখন ব্যূহদ্বারের বিপুল বাধা পরাভূত হইয়াছে, তখন প্রদীপকে আর পায় কে? মাঠটুকু পার হইয়া রাস্তায় নামিয়াই প্রদীপের রসনায় ভাষা অনর্গল হইয়া উঠিল : "দেখ, আমাদের দেশে মেয়ে-পুরুষে সহজ পরিচয়ের বাধা বিস্তর, কিছুতেই আমরা সামঞ্জস্য রাখতে পারি না। তোমরা আমাদের কর সন্দেহ, আমরা তোমাদের করি অশ্রদ্ধা। তাই আমরা মধুর সখ্যের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে, আত্মাকে খর্ব্ব ও কর্মশক্তিকে পঙ্গু করে' রেখেছি। আমরা কিছুতেই সহজ হতে পারি না—সে আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য সাধনা। জড়িমার আবরণ রচনা করে আমরা আত্মরক্ষা করি —তোমরা হও সতী, আমরা হই সাধু। কিন্তু তা যে কত অসার, তার মূল্য যে কত অল্প, তা আমরা বুঝি যখন একে-অন্যের বন্ধুতায় নতুন করে আবার আমরা আবিষ্কৃত হই, যখন আমাদের জীবন প্রসারিত আয়তন লাভ করে।—দেখো, হোঁচট খেয়ে না—"

এই সব কথার উত্তর দিতে হইলে বড়-বড়ো কথা না কহিলে বেমানান হইবে, তাহার জন্য নমিতা এখনো প্রস্তুত হয় নাই; তাই হোঁচট খাইবার কথায় সামান্য একটু হাসিয়া নমিতা চুপ করিয়া রহিল। প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল,—"সুধী হঠাৎ আমাকে ডেকেছে কেন বলতে পারো?"

নমিতা কহিল,—"কাশ্মীর বেড়াতে যাবেন, আপনি সঙ্গী হবেন তার।"

প্রদীপ। কাশ্মীর? হঠাৎ? পৃথিবীতে এত লোক থাকতে কাশ্মীরের শীত সইতে আমি তার সঙ্গী হ'ব, আমার অপরাধ?

নমিতা। জানি না, কিন্তু তার অপরাধ আরো গুরুতর। আমাকে সঙ্গে নেবেন না। বলুন তো এটা তার অত্যাচার নয়?

প্রদীপ। তোমাকে সঙ্গে নেবে না কেন?

নমিতা। সে-প্রশ্ন আমি তাকে করেছিলাম। তিনি বল্লেন, "আমি বিশ্রাম করতে যাচ্ছি, সম্ভব হয় তো প্রদীপের সঙ্গে উপন্যাসটা শেষ করে ফেলব।

প্রদীপ। তুমি গেলে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে কেন? নমিতা। প্রথমত, আমি গেলে অনৈক্য ঘটবে, দ্বিতীয়ত, তার সাহিত্য-সাধনা সিদ্ধ হবে না।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই নমিতা বুঝিল, তাহাদের গোপন মনোমালিন্যের এই ইতিহাসটুকু ব্যক্ত না করিলেই ভালো হইত। কিন্তু তাহার উত্তরে প্রদীপ যাহা বলিয়া বসিল, তাহাতেও

তাহার লজ্জা কম হইল না। প্রদীপ কহিল,—“তোমাকে একা ফেলে রেখে আমি ওর সঙ্গী হ’ব আমাকে ও এত বোকা ভাবলে কিসে? তোমার সান্নিধ্যে ও যদি শ্রান্ত হয়ে থাকে, তা হলে ওর নৈকট্যে আমাকে সন্ন্যাসী হতে হবে নিশ্চয়।” বলিয়া কথাটাকে লঘু করিবার চেষ্টায় সে হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু নমিতা আর কোন কথাই কহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। মনে হইল তাহাদের দুর্লক্ষ্য গোপন বেদনাটা প্রদীপের চোখে ধরা পড়িয়াছে। ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই তাহার কথায় এমন স্পষ্টতা আসিয়াছে। ইহা নমিতার অভিপ্রেত ছিল না। স্বামীর কাছে কবে ও কেমন করিয়া যে সে তাহার রহস্য-মাধুর্য হারাইয়াছে, এমন নিবিড় মিলনে কবে যে অবসান ঘটিয়া অবসাদ আসিল, তাহা নির্ধারণ করিবার মত জ্যোতির্বিদ্যা নমিতার জানা ছিল না। নমিতাকে সুধী যে-পরিমাণ স্নেহ করে তাহার বিশেষণ দিতে গেলে অপর্যাপ্ত বলিতে হয়, অথচ নমিতাকে তাহার ভাল লাগে না— এই মনস্তত্ব বুঝিবার মন তাহার নাই। এই বেদনাটি মনেমনে লালন করিবার অবকাশে নমিতার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, একদিন স্বামীর চক্ষে সে এত মহিমা ও মর্যাদা লইয়া উদ্ভাসিত হইবে, যাহার তুলনায় তাহার কল্পনাকায়া সাহিত্য-লক্ষ্মী নিত, নিরাভরণ। তাহারই জন্য সে স্বামীর কাছে মনে-মনে একটি শিশু কামনা করিয়াছে। এবং এই কামনার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া স্বামী তাহাকে ভাবিয়াছেন গ্রাম্য, স্কুল। স্বামী তাহাকে বলিতেন,—“তুমি যে আমার স্ত্রী এই কথা সব সময়েই মনে রাখতে হয় বলে আমার ভালো লাগে না।” অথচ, এই প্রকার কৃত্রিম বিবাহজাত মিলনকে মাধুর্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য যে বিবাহের পরেও দীর্ঘকালস্থায়ী প্রণয়োপাসনার প্রয়োজন আছে, তাহা প্রথমে স্বামীই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রেমকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যে-অনন্যপরায়ণ প্রতীক্ষা দরকার, তাহার ধৈর্য্য হারাইতে স্বামীই দ্বিধা করেন নাই। আজ সহসা নমিতা তাহার কাছে আবিষ্কৃত হইয়া গেছে!

বাড়ি আসিবার পথটুকু শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। সুধী তখনো ফিরিয়া : আসে নাই। নমিতা আসিয়া শুধাইল,—“মা বল্লেন, আপনার চা এখন নিয়ে আসবে?”

প্রদীপ কহিল,—“মাকে বোলো, এখন চা খেলে আমার ক্ষুধার অকালমৃত্যু ঘটবে।”

নমিতা হাসিয়া বলিল,—“রাতের খাওয়া হতে আমাদের বাড়িতে বেশ দেরি হয়, অতএব চা খেলে আপনার ক্ষুধা মরে গিয়েও ফের নবজীবন লাভ করবার সময় থাকবে।”

প্রদীপ কহিল,—“যদিও ক্ষুধাকে বাঁচিয়ে রাখবার ধৈর্য্য আমার আছে, তবু যখন বলছে, নিয়ে এস। দেখো, অতিমাত্রায় অতিথিপরায়ণ হ’য়ো না। অসুখ করিয়ে শেষে সেবার বেলায় ছুটি নেবে, সেটা। আতিথ্যের বড়ো নিদর্শন নয়।”

রাত্রের খাওয়ায় দেরি হয় বটে, কিন্তু সকলে একসঙ্গে বসিয়া খায়— একই চতুষ্কোণ টেবিলের চারধারে চেয়ার পাতিয়া। দৃশ্যটা দেখিয়া প্রদীপ মুগ্ধ হইয়া গেল। পারিবারিক প্রীতির এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে সে নরনারীর সমানাধিকারের সঙ্কেত পাইল। এত আনন্দ করিয়া, এত পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে কোনোদিন আহার করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল

না। আহার্য্য বস্তুগুলি অরুণাই বটিয়া দিতেছিলেন, স্বাভাবিক সঙ্কোচের বাধা সরাইয়া বন্ধু নমিতাও তাহার অভিভাবকদের সম্মুখে সামান্য প্রভা হইয়া উঠিয়াছে, কথোপকথনের ফাঁকে-ফাঁকে উমার কলহাস্য বিরাম মানিতেছে না। নানা বিষয় নিয়া কথা হইতেছে—ভারতবর্ষের পরাধীনতা হইতে সুরু করিয়া গো-মাংসের উপকারিতা পর্যন্ত; সবাই সাধ্যমত টিপ্পনি কাটিতেছে, এবং অবনীবাবু তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের মুখোস খুলিয়া যেই একটু রসিকতা করিতেছেন, অমনি সবাই সমস্বরে উচ্চহাস্য করিয়া নিজের নিজের পরিপাক-শক্তিকে সাহায্য করিতেছে। প্রদীপ যে এই বাড়িতে একজন আগন্তুক অতিথিমাত্র, তাহা তাহাকে কে মনে করাইয়া দিবে? সামান্য খাইবার মধ্যে যে এত সুখ ছিল, মানুষের হাসি যে সত্যই আনন্দজনক,–এই সব স্বতঃসিদ্ধ তথ্যগুলি সম্বন্ধে সে হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল। অরুণা প্রদীপকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সব আমার নিজের হাতের রাধা, তোমার মুখে রুচছে ত'?" দাঁতের ফাঁক হইতে মাছের কাটা খসাইতে-খসাইতে অবনীবাবু কহিলেন,—"তুমি কি আশা কর তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রদীপ বলবে যে রুচছে না, ন্যাকার করছে? প্রদীপের সত্যবাদিতায় নিশ্চয়ই তুমি সুখী হবে না। ভদ্র হবার জন্যে কেন যে এ-সব মামুলি কথা বল তোমরা, ভেবে পাইনে।" উমা টিপ্পনি কাটিল,—"আর প্রদীপবাবু যদি ভদ্রতর হ'বার জন্যে বলেন যে স্বর্গসভায় সুধা খাচ্ছি, তা হলে তার সেই অতিশয়োক্তিকে তুমি সন্দেহ করূবে; তাতেও তুমি সুখী হবে না।" প্রদীপ কহিল, —"অতএব কোননা বাক্-বিস্তার না করে নিঃশব্দে খেয়ে চলাই আমার পক্ষে ভদ্রতম হবে।"

খাওয়ার পরে শুইবার ঘরে আসিয়া সুধী নমিতাকে কহিল, —"তুমি মা'র কাছ আজ শোও গে; প্রদীপের সঙ্গে রাত্রে আমার ঢের পরামর্শ আছে।"

প্রদীপ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল : "না বৌদি, অত আড়ম্বরে কজি নেই। খেয়ে-দেয়ে পরামর্শ করবার মতো ধৈর্য্য ও অনিদ্রা বিধাতা আমাকে দেননি। বুঝলে সুধী, স্ত্রীকে ত্যাগ করে বন্ধুকে শয্যার পার্শ্ব দেওয়ার আতিথ্য এ-যুগে অচল হয়ে গেছে। তোমাদের ঘরের পাশেই যে ছোট বারান্দাটুকু আছে, তাতেই একটা মাদুর বিছিয়ে দাও, আমি এত প্রচুরপরিমাণে নাক ডাকাবো যে, জানলাটা খুলে রাখলেও তোমাদের প্রেমগুঞ্জন শুতে পাব না। ভয় পাবার কিছুই নেই, সুধী। তা ছাড়া না-ঘুমিয়ে বসে-বসে কলম কাড়াব, আমি আজো তত বড় সাহিত্যিক হইনি।"

মাথা নাড়িয়া সুধী কহিল,—"না, এ-ঘরে আজ নমিতার শোওয়া হবে না, তোমার সঙ্গে আমার অনেক গোপন কথা আছে।"

প্রদীপ। কী গোপন কথা? কাশ্মীর যাওয়ার কথা তো? তোকে সোজাসুজি বলে রাখছি সুধী, বৌদি না গেলে আমি যাব

কখনো।

সুধী। অত দূরে যাবার নমিতার কোনো দরকার নেই।

প্রদীপ। আর, আমারই জন্যে যেন কাশ্মীরের সিংহাসন খালি পড়ে আছে। বৌদির সান্নিধ্যে সাত মাস থেকে তোর যদি হাঁপানি উঠে থাকে, তবে তোর সঙ্গে একদিন থেকে আমার হবে প্লুরিসি।

নমিতাকে ঘর হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া, সুধী গম্ভীর হইয়া কহিল,—"সত্যি প্রদীপ, বিয়ের পর এই একঘেয়েমি আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। আমি দিন কয়েকের জন্যে বিশ্রাম চাই, চাই বৈচিত্র্য।"

প্রদীপ জোর দিয়া কহিল,—"এ তোর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, সুধী। বিয়ে এত ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে এই যদি তোর ধারণা ছিল, তবে বিয়ে করা তোর পক্ষে নিদারুণ পাপ হয়েছে।"

সুধী। ধারণা আমার আগে ছিলো না। তাই বলে ভুলকে সংশোধন কবে না—আমি তত ভীরু নই। নমিতা আমাকে তৃপ্ত করতে পারে নি।

প্রদীপ। কিন্তু বিয়ের আগে এই নমিতার রূপ ও তার বাপের টাকা হোর নয়নতৃপ্তিকর হয়ে উঠেছিল—তুই লোভী! বিয়ে করে' ফেলে নমিতার ওপর বীতরাগ হওয়া নীতিতে তো বটেই, আইনেও দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।

সুধী। তা আমি বুঝি। তাই প্রকাশ্যে আমি আমার এই ঔদাসীন্যের পরিচয় দিতে সব সময়েই ক্লেশ বোধ করেছি। আমি নমিতাকে ভালোবাসি না এমন নয়, কিন্তু ভালো লাগে না। আমার রুচির সঙ্গে ওর মিল নেই।

প্রদীপ। সেজন্যে নমিতাকে দায়ী কলে অন্যায় হবে। তোর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ওর ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে রাখার চেয়ে তাকে একটা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল মূর্তি দেওয়ার চেষ্টা করাই উচিত মনে করি। মোট কথা জানিস কি সুধী, এই সব জায়গায় স্বামীকে তার অহঙ্কারের চূড়া। থেকে নেমে আসতে হয় স্ত্রীর সঙ্গে এক সমতল ভূমিতে,নইলে সঙ্গতির আর আশা নেই। তুই যেমন আপশোষ করছি, নমিতাও তেনি হয় তো তার ভাগ্যকে ভৎসনা করূছে। ভাবছে, কেন সাহিত্যিককে বিয়ে কলাম—এর চেয়ে একটি গৃহস্থকেরানি শতগুণে লোভনীয় ছিল। বিয়ের অপর নামই হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক একটা রফা। সন্ধির সর্ত ভাঙতে গেলেই আসে সামাজিক অশান্তি; আমরা সত্য লোক, ওটাকে এই জন্যেই এড়িয়ে যেতে চাই যে, অশান্তিটা কালক্রমে মনেও সংক্রামিত হয়। ভুল সংশোধন করার অর্থ আরেকটা ভুল করে বসা নয়। বিয়েটা দুইটা জীবনের সঙ্গে সমাজকে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, তাকে ভাঙার চাইতে জোড়াতালি দিতে গেলে অগৌরব হয় না। ডিভোর্সের আমি পক্ষপাতী,—কিন্তু ভালো লাগে না' এই ওজুহাতকেই যদি বিবাহচ্ছেদের প্রধান কারণ বলে

স্বীকার করা যায়—তা হ'লে পৃথিবীতে আত্মহত্যাও অত্যন্ত সুলভ হয়ে উঠবে। নমিতা তেমন লেখা-পড়া শেখেনি, রাজধানীর আবহাওয়ায় তার অঙ্গসজ্জা রাজসংস্করণ লাভ করেনি বা সে স্নায়ুহীন কবিপ্রিয়া না হয়ে সংসারকর্ম্মক্ষমা গৃহিণী হতে চায়—এই যদি তার ত্রুটির নমুনা হয়, তবে বিয়ের আগে তোরই সাবধান হওয়া উচিত ছিলো, এখন তোর কাজ হচ্ছে নমিতাকে তোর উপযুক্ত করে তোলা।

সুধী। যে-কাজে আনন্দ নেই, সে-কাজে আমার মন ওঠে না। আচ্ছা এক কাজ করা যায় না? বাঙলা-সমাজ আঁৎকে উঠবে হয় তো।

প্রদীপ। কি?

সুধী। ধ আমি যদি আজ নমিতাকে ত্যাগ করি—হ্যাঁ, অন্য কোনো কারণে নয়, খালি তাকে আমার ভালো লাগে না বলে— এবং তার বিস্ময়ের ভাবটুকু কাটতে না কাটতেই, যদি তুই ওকে লুফে নিস—ব্যাপারটা কেমন হয়?

এমন একটা গুরুতর কথার উত্তরে কেহ যে এত জোরে হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্নটাকে ব্যঙ্গ করিবার সাহস দেখাইতে পারে, তাহা সুধীর জানা ছিল না। তাহার মনে হইল, কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে যেন কি-একটা অপরাধ করিয়াছে। নমিতা কি-একটা কাজে বারান্দা দিয়া যাইতেছিল, প্রদীপ ডাকিয়া উঠিল : “সঙ্গে তুমি কি কি জিনিস নেবে, তার একটা ফর্দ আজ এক্ষুনি করে ফেলতে হবে। লেপ দু'খানা হলেই চলবে—লেপ গায়ে দিয়ে ট্রেনে ট্র্যাভেল করার মত সুখ আর নেই। শুনে যাও, বৌদি।”

“আস্‌চি”—বলিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইতেই প্রদীপ কহিল, “কাশ্মীর ছেড়ে কাকে গেলেই ভালো করতিস, সুধী।”

অল্পক্ষণ পরেই নমিতা আসিল, তাহার সংসারের সব কাজ সমাধা হইয়াছে। প্রদীপ কহিল, —“যাবে তো, কিন্তু তোমার অনেক কাজ করতে হবে, মনে থাকে যেন। চা করে দেবে, গাড়ি ধবার সময়। প্ল্যাটফর্মে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে, ভুলে লাগেজের গাড়িতে উঠে পড়বে না, গাড়ির ঝাঁকুনির টাল সামলাতে গিয়ে শেকল টেনে দেবে না, কলিশান্ হ'লে বাড়ির জন্যে মন-কেমন করূলে জরিমানা দেবে।”

নমিতা হাসিয়া উঠিল। ভারতের ভূস্বর্গে সশরীরে আরোহণ। করিতে পারিবে ভাবিয়া, আরেকটু হইলে সে ছোট খুকির মত হাততালি দিয়া উঠিত। স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,—“কবে যাচ্ছি?”

সুধী-র উৎসাহ যেন উবিয়া গেছে। বিরসকণ্ঠে কহিল,—“যেদিন সুবিধে হবে।” পরে প্রদীপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,-“তোমার সঙ্গে কাশ্মীর যাওয়ার আমার উদ্দেশ্যই ছিল

আমার মনের এই সমস্যাকে পরিষ্কার করে তুলতে। যখন এ সম্বন্ধে তোমার কোনো সহানুভূতি নেই, তখন কাশ্মীর যাওয়া বন্ধ রইলো। বাকি জীবনটা এখানেই যা হোক্ করে কাটিয়ে দেব'খন।"

"জীবন-সম্বন্ধে তোমার এই দিব্যজ্ঞান দেখে বাধিত হ'লাম।" কিন্তু চাহিয়া দেখিল নমিতার মুখ চূণ হইয়া গেছে। আবহাওয়াটাকে হাল্কা করিবার জন্য, মুখে হাসি আনিয়া প্রদীপ কহিল,—"সুবিধে আমার কাল-ই হচ্ছে। কালকেই আমি সকালের ট্রেনে কল্কাতা গিয়ে গাড়ি-টাড়ি সব রিজার্ভ করে আসছি। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে এস বৌদি, কি-কি জিনিস কিনে নিতে হবে, তার একটা হিসেব করে' নেওয়া দরকার। আমরা তীর্থ কর্‌তে যাচ্ছি না যে, পথের কষ্টভোগকে আমরা স্বর্গারোহণের দাম বলে মেনে নেব। আমরা যাচ্ছি বেড়াতে পান থেকে চুণ খসলেই আমাদের মুস্কিল। রেলের কামরাটাকে আমরা একটা অতি-আধুনিক ড্রয়িংরুম করে' ছাড়বো।"

নমিতার মুখ তবুও প্রসন্ন হইল না। একান্তে প্রদীপকে বলিবার জন্যই সে একটু নিম্নস্বরেই কহিল,—"মুখ থেকে কথা যখন একবার বেরিয়েছে তখন আর তার নড়চড় হবে না, দেখবেন।"

প্রদীপ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল,—"বেশ তো, নাই বা গেল সুধী— তুমি আর আমি যাবো। তুমি তার জন্যে ভেবো না, কাশ্মীর হোক, লিলুয়া পর্যন্ত আমরা যাবোই,আমি আর তুমি।"

দেখিতে-দেখিতে তাহাদের দুই জনের আলাপ এত জমিয়া উঠিল যে, তাহারা এক সময়ে টাই-টেবিল খুলিয়া বধে মেইল ও লাহোর এক্সপ্রেসের স্পিড়-এর তারতম্য বাহির করিতে অঙ্ক কষিতে বসিল। সুধী কখন চেয়ার ছাড়িয়া বিছানায় গিয়া শুইয়াছে, তাহা নমিতা লক্ষ্য করিলেও প্রদীপের খেয়াল ছিল না; সে গল্প নিয়া এমন মাতিয়া উঠিয়াছে! নমিতা তন্ময় হইয়া কথা শুনিতেছিল, শ্রোত্রী হিসাবে তাহাকে কেহ কোনো দিন এত প্রাধান্য দেয় নাই— এই ক্ষণ-বন্ধুতাটি তাহার কাছে এত রমণীয় লাগিতেছিল যে, স্বাভাবিক সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া নিজের কথা কিছু বলিতে পারিলে তাহার তৃপ্তির শেষ থাকিত না।

সেই সুযোগ আসিল। প্রদীপ হঠাৎ সচেতন হইয়া কহিল, "নজের কথাই পাঁচ কাহণ বলে যাচ্ছি—আমার জীবন-ইতিহাসের আদ্যোপান্ত নেই, বৌদি। আমি একটা চলমান গ্রহ— কখনো-কখন বা কারো অচল উপগ্রহ হয়ে থাকি। তোমার বাপের বাড়ির কোননা বৃত্তান্তই জানা হ'ল না। বর্তমানের বন্ধুতাকে অতীত কালেও বিস্তৃত করে দিতে হয়। এই কথা মনে রাখা চাই বৌদি, যে, বহু আগেই আমাদের দেখা হ'বার কথা ছিল—হয় নি, সে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র।"

কি বলিবে নমিতা কিছু ভাবিয়া পাইল না। তবু কথা কহিবার অদম্য-উচ্ছাসে অসংলগ্ন ভাষায় যাহা সে বলিয়া চলিল, তাহা গুছাইয়া সংক্ষেপে এই:

নমিতার বাবা রঙ্গপুরে ওকালতি করিতেন। তাহার এক দাদা ছিল, বছর দুই আগে স্বদেশী করিতে গিয়া পুলিশের হাতে যে মার খাইয়াছিলেন, তাহাতেই মারা গিয়াছেন। সেই শশাকেই বাবা ভাঙিয়া পড়িলেন; সমস্ত সংসার ছত্রখান হইয়া গেল। বাবা ওকালতি করিয়া টের পয়সা জমাইয়াছিলেন, খুড়া-মহাশয় চালাকি করিয়া তাহাতে হাত দিলেন। মা ও তাহার ছোট বোনটি এখন তাহার কাকারই আশ্রিত। কাকা কলিকাতায় দালালি করেন, অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়—তবে বাবার জমাননা পয়সা হাতড়াইয়া এখন একটু সুরাহা করিতে পারিয়াছেন। কাকার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ, কাকিমা তাহারই সহধর্মিণী। সম্পর্কের দাবিতে গুরুজন হইলে কি হইবে, কাকার প্রতি নমিতার মন মোটেই প্রসন্ন নয়। মা'র প্রতি তাহাদের ব্যবহার ঠিক গুরুভক্তির পরিচায়ক হইয়া উঠে নাই। মা বিষয়বুদ্ধিহীন—এমন কেহ নাই যে, তাহাদের এই সম্পত্তি-সঙ্কটের সময় সাহায্য করে; মা যে কাকার আশ্রয় ছাড়িয়া অন্যত্র বাসা করিবেন, তদারক করিবার জন্য তেমন। আত্মীয় অভিভাবকও তাহাদের নাই। নমিতাকে ভালো ঘরে বিবাহ দিবার জন্য তাহার বাবার একান্ত অভিলাষ ছিল, সেই জন্য যথেষ্ট টাকাও রাখিয়া গিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহার ভালো ঘরে বিবাহ হইয়াছে বটে, (এখানে নমিতা একটু হাসিল) কিন্তু পণের টাকা দিয়া বিবাহের যাবতীয় খরচেই নাকি বাবার বিত্ত প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাকা যে মা ও তাহার ছোট মেয়েকে এতদিন ভরণপোষণ করিতেছেন, তাহার টাকা নিশ্চয়ই ছাত ফুড়িয়া পড়িতেছে না। নমিতা মেয়ে হইয়া জন্মিয়া মা ও ছোট বোটির কাছে অপরাধী হইয়া আছে। এমন সুযোগ্য জামাই পাইয়া মা যে আত্মীয়-গৌরবে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা তাহার সামান্য দিবাস্বপ্ন মাত্র।

হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া নমিতা বলিল,—"যান, এক্ষুনি শুয়ে পড়ুন গে। আমি মার ঘরে যাচ্ছি। মা আবার এত রাত পর্যন্ত গল্প করেছি টের পেলে বকূবেন হয় তো।" বলিয়া নমিতা বারান্দার দরজা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, প্রদীপ তাহাকে বাধা দিল; কহিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? মা'র বকুনি খাবার লোতে তুমি তোমার এই উত্তপ্ত সুখশয্যা অতিথিকে ছেড়ে দিয়ে যাবে, এতে সতীধর্মের অবমাননা হবে, বৌদি। বারান্দায় একটা ডেক্-চেয়ার দেখা যাচ্ছে, না? দাঁড়াও।"

নমিতাকে এক পা-ও নড়িবার অবকাশ না দিয়া প্রদীপ তাড়াতাড়িতে তাহাকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া পেছন হইতে দরজাটা টানিয়া শিকল তুলিয়া দিল।

ডে-চেয়ারটায় বসিল বটে, কিন্তু ঘুম আসিবার নাম নাই। তাই বলিয়া অন্ধকার আকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, অস্তমান চাঁদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার মত দৌর্বল্য প্রদীপের ছিল না। চক্ষুর পাতা দুইটাকে জোরে চাপিয়াও নিদ্রাকে বন্দী করা যাইতেছে না — নানা পারম্পর্যহীন ছবি অন্তর-চক্ষুর সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে উদ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। নমিতাদের ঘরের আলো কখন নিবিয়া গেল, তাহা টের পাওয়া মাত্রই প্রদীপের

কেমন একটা বিশ্বাস হইল যে, নমিতারো দুই চোখে শুষ্ক, বেদনাহীন বিনিদ্রতা বিরাজ করিতেছে। প্রাচীরের ব্যবধানের অন্তরাল হইতে প্রদীপের আত্মা যেন নমিতার আত্মার স্পর্শ পাইল, সেই স্পর্শরসে স্নান করিতে করিতে অতলস্পর্শ নিদ্রার সমুদ্রে সে ডুবিয়া গেল।

সকালে চায়ের টেবিলে সুধী বলিল,-"কাল রাতে একটু জ্বরভাব হয়েছে। গাড়ি ইত্যাদি ঠিক করতে আজকেই তোমার কলকাতা গিয়ে কাজ নেই, প্রদীপ। চায়ের সঙ্গে এই দুটো ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট খাচ্ছি—বিকেলেই মাথাটা ছাড়বে হয়ত। রাত্রের ট্রেনে যেয়ো।"

সেই জ্বরই সতেরো দিন পরে যখন ছাড়িল, তখন সুধী কাশ্মীর উত্তীর্ণ হইয়া যে-পথে পাড়ি জমাইয়াছে সে-পথ ঘুরিয়া-ফিরিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া সমাপ্ত হয় নাই। আবার এই ধূলার ধরণীতেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে—এমন একটা বৈচিত্র্যহীন পৌঁনঃপুন্যতে অভিসারিক আত্মা অমর্যাদা বোধ করে। সুধী আর এই মৃত্তিকায় ফিরিয়া আসিবে না, আকাশের অগণন তারার মধ্য হইতে সে একটিকে বাছিয়া লইয়া সেইস্থানে অবতীর্ণ হইবে; সেখানে নবজন্মের নবতর আস্বাদ পাইবে, নরদেহ লইয়া তাহা কল্পনা করিবারও তাহার সাধ্য ছিল না।

সুধীর তিরোধানে

সুধীর তিরোধানে সমস্ত সংসার ওলোটপালট হইয়া গেল। না আছে শৃঙ্খলা, না আছে শ্রী। সব চেয়ে আশ্চর্য এই, মানুষগুলিও তাহাদের মুখের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে মনের চেহারাও বদলাইয়া ফেলিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিয়া সংসারের এই অবস্থা দেখিলে, সুধী নিশ্চয়ই বনবাসী হইত।

নমিতা এখন এই সংসারে কায়াহীন ছায়ামাত্র—এখানে তাহার আর প্রয়োজন নাই, সে যেন তাহার জীবনের সার্থকতা হারাইয়া বসিয়াছে। নমিতা যেন একটা নির্বাপিত প্রদীপ—অন্ধকারে তাহার নির্বাসন। বিকাল-বেলা নমিতা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পিঠের উপর ঘন চুল নামিয়া আসিয়াছে, বসিবার ভঙ্গীটিতে একটি অসহায় ক্লান্তি। এইবার নমিতা কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই ভাবিয়া কিনারা করিতে পারিতেছে না। এই সংসারে উপবাসী ভিক্ষুকের মত কৃপাপ্রার্থিনী হইয়া তাহাকে কাল কাটাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার অসহায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অথচ এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে এই সামান্য ক্ষুদ্র গৃহকোণটি ছাড়া তাহার পা ফেলিবার স্থানই বা কোথায়? স্বামীর কাছে অপ্রতিবাদ আত্মদানের ফাঁকে সে স্বামীকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই প্রেম সন্তানস্নেহ দ্বারা রঞ্জিত হয় নাই। তাই সুধী-র মৃত্যুতে অরুণা শোক করিয়াছেন সুধী-রই জন্য, নমিতা শোক করিয়াছে তাহার নিজের জন্য, তাহার এই অবাঞ্ছিত নিরুপায় বৈধব্যের ক্লেশ ভাবিয়া। এই বৈধব্যপালনে সে না পাইবে আনন্দ, না-বা তৃপ্তি। কিন্তু ইহাকে লঙ্ঘন করিবার মত বিদ্রোহাচরণের উদ্দাম শক্তিও তাহার নাই। মাথা পাতিয়া এই কৃত্রিম অনুশাসনের অত্যাচার তাহাকে সহিতে হইবে।

প্রদীপ কখন যে নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নমিতা টের পাইলে নিশ্চয়ই মাথার উপর ঘোম্‌টা টানিয়া দিত। সে দুই হাতে জানালার শিক্‌ ধরিয়া তেমনি বসিয়া রহিল। যেন দুই হাতে দুইটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য সে সংগ্রাম করিতেছে। নমিতার মূর্তিতে এই প্রতিকারহীন বেদনার আভাস দেখিয়া, প্রদীপের মন ম্লান হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া সে কহিল,—"নমিতা, আমি চল্লাম।"

নমিতা চমকিয়া উঠিল। বেশবাস তাড়াতাড়ি পরিপাটি করিয়া প্রদীপের মুখে তাহার নামোচ্চারণ শুনিয়া, সে একটি ক্ষীণ রোমাঞ্চ অনুভব করিতে করিতে স্তব্ধ হইয়া রহিল। আজ সুধীর অবর্তমানে নমিতার পরিচয়—সে একমাত্র নমিতা-ই; প্রদীপ তাহাকে সম্বোধন করিবার আর কোন সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাইল না। নমিতার ইচ্ছা হইল, অনেক কিছু বলিয়া নিজেকে একেবারে হালকা করিয়া ফেলে —এই অপরিমেয় স্তব্ধতার সমুদ্রে পড়িয়া সে একা-একা আর সাঁতার কাটিতে পারিতেছে না। প্রদীপ ও তাহার মধ্যে যে-পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, মৃত্যু আসিয়া তাহার মধ্যে অনতিক্রম্য বাধা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। তাই নমিতা কোনো কথাই বলিতে পারিল না, স্বামীর অবর্তমানে প্রদীপের কাছে নমিতার

পরিচয়—আর বন্ধু নয়, মৃত বন্ধুর বিধবা-বধু মাত্র,—দেহের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মাকেও তাহার আজ নিমীলিত অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিতে হইবে। জগতে তাহার সত্তাহীনতাই এখন প্রধান সত্য।

নমিতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রদীপ কহিল,—"পারিবারিক সম্পর্কে তোমার নিকটে না থাকলেও আমি তোমার আত্মীয়, নমিতা। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সংসার আজকাল পরিবারকে ছাড়িয়ে উঠেছে, সেখানে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ের বাধা নেই। অতএব প্রয়োজন বোধ কর্‌লে আমাকে কাজে লাগাতে কুণ্ঠা কোরো না। আমি আপাতত তোমাদের ছেড়ে চল্লাম বটে, কিন্তু হয়তো আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে। ট্রেনের সময় বেশি নেই; আচ্ছা, আসি। নমস্কার!" বলিয়া প্রদীপ দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল।

এইরূপ অনড় জড়পদার্থের মত বসিয়া থাকাটা অস্বস্তিকর মনে হওয়াতে নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু যে-নমিতা একরাত্রে হৃদ্যতার আবেগে অত্যন্ত প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছিল, সে আজ নীরবে সামান্য নমস্কারটুকু পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দিতে পারিল না। সুধী যেন তাহার ব্যক্তিত্বকে লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছে; ভাঙা চশমার খাপের মতই সে আজ অপ্রয়োজনীয়, নিরর্থক।

নমিতাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রদীপ ফিরিল। নিভৃতে বলিবার জন্যই সে নমিতার কাছাকাছি রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "সংসারের খরচের খাতায় তুমি নাম লেখাবে—এই আত্ম-অপমান থেকে তুমি নিজেকে রক্ষা কোরো। তোমার মূল্য খালি সুধী-র স্বামীত্বই নির্ধারণ করেনি। স্ত্রী হওয়া ছাড়াও তোমার বড় পরিচয়। আছে—তুমি নারী, তুমি স্বপ্রধান। একজনের মৃত্যুর শাস্তি তোমাকেই সারা জীবন সয়ে' বিড়ম্বিত হতে হবে—তা নয়, নমিতা। মৃত্যু যদি সুধী-র পক্ষে রোগমুক্তি হয়, তোমার পক্ষে দায়িত্বমুক্তি। সে-কথা ভুলে তোমার পাপ হবে।" বলিয়া ভাবাবেগের আতিশয্যে প্রদীপ হঠাৎ রেলিঙের উপর নমিতার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল।

সেই দৃশ্যটি দুর হইতে অবনীবাবু দেখিলেন। তিনি নীচে নামিতে ছিলেন, থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দৃশ্যটা তাহার চোখে মোটেই ভাল লাগিল না; ভাল লাগিল না নয়, তাঁহার মন মুহুর্তের মধ্যে প্রদীপের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। অবনীবাবু জানিতেন, স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার পথে সুধী প্রদীপের জন্য কোনো বাধাই রাখে নাই; এই পরিবারে প্রদীপ অবারিত অভ্যর্থনাই লাভ করিয়াছে। সুধী বাঁচিয়া থাকিলে নমিতার সঙ্গে প্রদীপের এই সান্নিধ্য হয়তো অবনীবাবুর চোখে বিসদৃশ বা অসঙ্গত ঠেকিত না, কিন্তু সুধীর অবর্তমানে প্রদীপের এই সৌহার্দ্য তাহার কাছে শুধু অন্যায় নয়, অনধিকারজনিত অপরাধ বলিয়া মনে হইল। নিমেষে পূর্বার্জিত সমস্ত উদারতা বিসর্জন দিয়া, অবনীবাবুর মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেই নমিতা আবার তেমনি রেলিঙ ধরিয়া বসিয়াছে। আন্দোলিত মনকে শান্ত করিবার চেষ্টায় সে তাহার মা'র মুখ স্মরণ করিতেছিল, এমন সময় পেছন হইতে অবনীবাবু ডাকিলেন : "বৌমা!" সহসা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর-দোর দুলিয়া উঠিলেও নমিতা এত চমকাইত না। শ্বশুরের মুখে এমন কর্কশ ডাক শুনিতে সে অভ্যস্ত ছিল না। সংশয়ে তাহার মন ছোট হইয়া গেল। দুই চোখে নীরব কাকুতি নিয়া সে উঠিয়া বঁড়াইল। অবনীবাবু কণ্ঠস্বর একটুও স্নিগ্ধ করিলেন না; কহিলেন,—"প্রদীপ চলে গেল বুঝি? তোমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অত ঘটা করে' থিয়েটারি ঢঙে কী বলছিল ও?"

নমিতার মন শত রসনায় ছি ছি করিয়া উঠিল। তাহার দেবতুল্য শশুর এত সন্দিগ্ধ ও সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন ভাবিয়া নিদারুণ অপমানে নমিতার আত্মা ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না। এ-যুগে মাতা বসুন্ধরার কাছে আশ্রয় চাহিলে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না, তাই নমিতা তেমনি অচল নিষ্প্রাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। কিন্তু কিছু একটা তাহার বলা দরকার, শ্বশুর-ঠাকুরের মুখ সন্দেহে ও ঘৃণায় কুটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে ও দুঃখে তাহার কণ্ঠস্বর ফুটিতে চাহিল না, তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় ভয়কে দমন করিয়া সে কহিল,—"আমাদের খোঁজ নিতে আবার আসবেন বলে গেলেন।"

—"আবার আসবে?" অবনীবাবু এত চেঁচাইয়া উঠিলেন যে, পাশের ঘর হইতে অরুণাও আসিয়া দাঁড়াইলেন: "এবার এলে রীতিমত তাকে অপমানিত হতে হবে। পরস্ত্রীর সঙ্গে কি-ভাবে আলাপ করতে হয় সে-সৌজন্য পর্যন্ত শেখেনি, ঘোটলোক অতন্দ্র কোথাকার! আবার আসবে! কিসের জন্য আবার আসা হবে শুনি? তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বৌমা —"

মুখ পাংশু করিয়া অরুণা বলিয়া উঠিলেন,—"কি, কি হয়েছে?"

কথাটার সোজা উত্তর না দিয়া অবনীবাবু কহিলেন,—"মুখ দেখে লোক চেনা যায় না, যত সব মুখোস-পরা জানোয়ার। বিশ্বাসের সম্মান যে রাখতে না পারে, তার মত হীনচরিত্র আর কেউ নেই। আবার আসবে সে! আসুক না।" বলিয়া রাগে ফুলিতে-ফুলিতে অবনীবাবু ফিরিলেন; ব্যাপারটা খোলসা করিয়া বুঝিতে অরুণাও তাহাকে অনুসরণ করিতে দেরি করিলেন না।

কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল, নমিতা কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিল না। বজ্রাহত লোক যেমন স্তম্ভিত হইয়া থাকে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি তেমনি আড়ষ্ট হইয়া রহিল। লক্ষ্য করিল তাহার পা কাঁপিতেছে; সে রেলিঙ ধরিয়া আবার বসিয়া পড়িল। তাহার মন কাচের বাসনের মত ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর মুষ্ট্যাঘাতে শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেছে। শরীরের এই অমানুষিক ক্লেশভোগের সঙ্গে মনেরও এই জঘন্য লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হইবে, ইহা সে তাহার নিরানন্দ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে গিয়াও কোনোদিন কল্পনা করে নাই।

অথচ, পরস্ত্রীর প্রতি প্রদীপের এই অসৌজন্যকে সে মনে-মনে তিরস্কার করিতে বিবেকের সায় পাইল না। প্রদীপ যদি তাহার হাতে অনাবিল বন্ধুতা-রস উৎসারিত করিয়া দিতে চায়, হাত পাতিয়া। সে তাহা গ্রহণ করিবে না-নমিতার মন এত কঠিন বা অনুদার নয়। ইহা ভাবিতেই তাহার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না যে, যে-প্রদীপ এত দিন তাহার বন্ধুর রোগশয্যার পার্শ্বে না-ঘুমাইয়া, অক্লান্ত সেবা। করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিল, সে সহসা এক মুহূর্তের আচরণে এমন কলুষিত হইয়া দেখা দিল! অথচ সেই আচরণটিতে নমিতা কোনো অন্যায় স্বীকার করিতে পারিল না। মানুষের যখন দৃষ্টিভ্রম হয়, তখন সে দড়িকেও সাপ ভাবে, এবং দড়ি হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া সাপের গর্তেই পা ফেলে। আজ নমিতার হৃদয়ের সকল স্তব্ধতা ঠেলিয়া শোকাশ্রুধারা নামিয়া আসিল। সেই অশ্রু তাহার মৃত স্বামীর উদ্দেশে নয়, নিজের দুরপনেয় দুর্ভাগ্যের জন্য নয়—একটি অপমানিত অনুপস্থিত বন্ধুর প্রতি।

নমিতা তাহার কাকার কাছে

নমিতা তাহার কাকার কাছে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

নবীন কুণ্ডুর লেনে ছোট একখানা দোতলা বাড়িতে নমিতার কাকা গিরিশবাবু তখন প্রকাণ্ড একটা সংসারের ভার কাঁধে লইয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন। নিজের কাচ্চাবাচ্চা লইয়াই তিনি এই ঘোট বাড়িতে কুলাইতে পারিতেছিলেন না, হঠাৎ বৌঠান ও তাহার ঘোট মেয়েটি নিরাশ্রয় অবস্থায় ভাসিয়া আসিল। গিরিশবাবুর এক শ্যালক অজয়, পাটনা হইতে বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় ল' পড়িতে আসিয়াছে; পাটনা তাহার ভাল লাগে না বলিয়া আইন-পাঠে বেশি এক বৎসর অযথা নষ্ট করিলেও তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না। অজয় প্রথমে একটা মেসে গিয়াই উঠিয়াছিল, কিন্তু একদিন ডালের বাটিতে আরশুলা মরিয়া আছে দেখিতে পাইয়া, বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়াই সেই যে দিদির বাড়িতে চড়াও হইয়াছে, আর তাহার গাত্রোত্থান করিবার নাম নাই। নীচের একটা অপরিসর অপরিচ্ছন্ন ঘরে একটা তক্তপোষ টানিয়া অজয় চুপ করিয়া অবরুদ্ধ বন্দী গলিটার দিকে চাহিয়া থাকে, আর আইন-পাঠের নাম করিয়া যে-সব বই অধ্যয়ন করে, তাহারা আইনের চোখে মার্জনীয় কি না কে বলিবে।

এমন সময় সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া আবার নমিতা আসিল। এইবার গিরিশবাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। অবশ্য তাহার দাদা মৃত হরিশবাবু যত টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্ত্রী ও নাবালিকা কন্যাটির সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন যাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে নমিতার জীবিকানির্বাহের খরচটা ধরা ছিল না। নাবালিকা কন্যাটিকে অবাঞ্ছিত মার্জার-শিশুর মত অন্যত্র পার করিয়া দিবার জন্য গিরিশবাবু তোড়জোড় করিতেছিলেন ও শোকবিধুরা ভ্রাতৃজায় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে মহাপ্রয়াণ করিয়া, বাকি টাকাগুল দেবরের হস্তেই সমর্পণ করিবেন বলিয়া তাহাকে নীরবে আশ্বাস দিতেছিলেন, এমন সময়ে অপ্রার্থিত অশুভ আশঙ্কা লইয়া নমিতার আবির্ভাব হইল। গিরিশবাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটা অব্যক্ত অভিশাপ আওড়াইলেন; তাহার স্ত্রী কমলমণি মুখোনাকে হাঁড়ি করিয়া রহিল।

চারিপাশে এতগুলি বান্ধব লইয়াও নমিতার একাকীত্ব তবু ঘুচিতে চায় না। সূর্যোদয়ের আগে উঠিয়া সে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করিয়া চলে—তবু তৃপ্তি পায় না। এত কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও সে তাহার অন্তরের নির্জনতাকে ভরিয়া তুলিতে পারিল না, তাই রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে, সে ধীরে ধীরে গলির ধারের সরু বারান্দাটিতে আসিয়া বসে। কি যে ভাবে, বা কি যে সে ভাবিতে পারিলে শান্তি পাইত তাহা খুজিতে গিয়া সে বারে বারে হাঁপাইয়া উঠে, তবু রাত্রির সেই নিস্তব্ধ গভীর স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া নিতে তাহার ইচ্ছা হয় না, চুপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে, কখনন সেইখানেই মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়ে। মা টের পাইয়া তিরস্কার করিলেই নমিতা ধীরে-ধীরে বিছানায় আসিয়া শোয়, কিন্তু চোখ ভরিয়া ঘুমাইতে পারে না। উহার হাতের সমস্ত কাজ

যেন এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া গেছে। হয়তো উহাকে অনেক দিন বাঁচিতে হইবে, কিন্তু এমনি করিয়াই চিরকাল পরপ্রত্যাশিনী হইয়া: নতনেত্রে লাঞ্ছনা সহিয়াসহিয়া জীবনধারণের লজ্জা বহন করিবে ভাবিতে তাহার ভয় করিতে থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়া আর পথই বা কোথায়? এক জনের মৃত্যুতে আরেকজনকে অযথা এমনি জীবন্মৃত থাকিতে হইবে, এমন একটা রীতির মাঝে কোথায় কল্যাণকরতা আছে, তাহা নমিতা তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ধরিতে পারি না। কিন্তু এই পঙ্গুতা বা বন্ধ্যাত্ব হইতে উদ্ধার পাইবারও যে কোনো উপায় নাই, সে সম্বন্ধেও সে স্থিরনিশ্চয় ছিল। তাহার এই বেদনাময় ঔদাসীন্য বা বৈরাগ্যভাবটি যে তাহার স্বামী-বিরহেরই একটা উজ্জ্বল অভিব্যক্তি, এই বিশ্বাস এই সংসাবের সকলেব মনে বদ্ধমূল আছে। বলিয়া নমিতা স্বস্তি পাইত বটে, কিন্তু তাহার এই অপরিমেয় দুঃখ যেন উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ কবিত না। কোনো ব্যক্তিবিশেষ হইতে সম্পর্কচ্যুত হইয়াছে বলিয়াই যদি সে তপশ্চাবিণী হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার তৃপ্তির অবধি থাকিত না, কিন্তু এই নামহীন অকারণ দুঃখ তাহাকে কেন যে বহন করিতে হইবে, মনে-মনে তাহার একটা বোধগম্য মীমাংসা করিতে গিয়াই সে আর কূল পায় না।

সেদিন ববিবার, দুপুর বেলা; তাহার ছোট বোন সুমিতা একখানা, বই তাহার কোলে ফেলিয়া হঠাৎ ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল,-ইখানি তুলিয়া দেখিল, আয়ল্য কত দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, তাহারই বাঙলা ইতিহাস। এই বই সুমিতা কোথা থেকে পাইল মনে-মনে তাহারই একটা দিশা খুঁজিতেছে, হঠাৎ সেইখানে গিরিশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন এবং নমিতাকে বই পড়িতে দেখিয়া কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া কহিলেন,—"কি পড়ছিস ওটা?"

নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া বইটা কাকাবাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

গিরিশবাবু বইটার নাম দেখিয়া অর্থ হয়তো সম্যক উপলব্ধি করিতে চাহিলেন না, রাগিয়া কহিলেন,—"বাঙলা উপন্যাস পড়া হচ্ছে কেন?"

বইটা বাঙলা না হইয়া ইংরাজি হইলেই হয়তো তাহার জাত যাইত; কিন্তু ইংরাজি নমিতা তেমন ভাল করিয়া জানে না, এ-জন্মে শিখিবার সাধ তাহার খুব ভালো করিয়াই মিটিয়াছে। নমিতা গিরিশবাবুর কথার কোনো উত্তর দিল না, বইটা যে উপন্যাস নয়, সেটুকু মুখ ফুটিয়া বলা পর্যন্ত কাছে অবিনয় মনে হইল, নিতান্ত অপরাধীর মত হেঁট হইয়া সে বসিয়া রহিল।

গিরিশবাবু পুনরায় কহিলেন,—"এ-সব বাজে বই না পড়ে' গীতা মুখস্ত কবি, বুঝলি?"

নমিতা সুশীলা ছাত্রীর মত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, একবার মুখ ফুটিয়া বলিতে পর্যন্ত সাহস হইল না যে, গীতার বাংলা অনুবাদ পর্যন্ত সে বুঝিবে না। যেহেতু সে বিধবা, তাহাকে গীতা পড়িতে হইবে, কবিতা বা উপন্যাস পড়িলে তাহার ব্রহ্মচর্য আর রক্ষা পাইবে না।

কিন্তু বিরোধ করিয়া কিছু বলা বা করা নমিতা ভাবিতেও পারে না, পাছে কাকাবাবু অসন্তুষ্ট হন্‌ ও পারিবারিক শান্তি একটুও আহত হয়, এই ভয়ে নমিতা সেই বইখানির একটি পৃষ্ঠাও আর উল্টায় নাই, বরং এমন একটা লোভ যে দমন করিতে পারিয়াছে, সেই গর্বে সে একটি পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। ' তাহার ব্যবহারে একটু ব্যতিক্রম বা কর্মে একটু শৈথিল্য দেখিলে মা অপ্রসন্ন হন, কারণ পরের সংসারে তাহারা পরগাছা বই আর কিছুই নন, অতএব যতই কেন না নিরানন্দ ও রুক্ষ হোক্‌, এই কর্তব্যসাধনে পরাজুখ হইলে তাহাদের চলিবে না। নমিতার আসার পর হইতে ছোট চাকরটাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, দোতলার তিনটা ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ তাহাকে সম্পন্ন করিতে হয় —বিছানা পাতা থেকে সুরু করিয়া ঝাট দেওয়া, কাকাবাবুর তামাক সাজা পর্যন্ত। সপ্তাহে দুইবার করিয়া কাকাবাবুর জুতায় কালি লাগাইতে হয়, পূর্ণিমাঅমাবস্যায় ক্রমান্বয়ে কাকিমার দুই হাঁটুতে বাতের ব্যথা হইলে কাকিমা না ঘুমাইয়া পড়া পর্যন্ত তাহাব পরিচর্য্যায় ক্ষান্ত হওয়ার নাম করা যাইত না; তাহার পর কখনো কখনো কাকিমার কোলের মেয়েটা মাঝরাতে হঠাৎ চেচাইতে আরম্ভ করিলে, নমিতাকেই আসিয়া ধরিতে হয়, অবাধ্য মেয়েটাকে শান্ত করিবার জন্য বুকে ফেলিয়া বারান্দায় সে সেই থেকে পায়চারি করিতে থাকে। এত বড় পৃথিবীতে এই স্বল্পায়তন বারান্দাটিই নমিতার তীর্থস্থান, গভীররাত্রে এখানে বসিয়াই সে মহামৌনী আকাশের সঙ্গে একটি অনির্বচনীয় আত্মীয়তা লাভ করে। তাহার চিন্তাগুলি বুদ্ধি দ্বারা উজ্জীবিত নয়, ভারি অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন—তবু নমিতা তাহার জীবনের চতুর্দিকে একটা প্রকাশহীন প্রকাণ্ড অসীমতা অনুভব করে, তাহা তাহার এই নিঃসঙ্গতার মতই প্রগাঢ়। রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া সে তাহারই মত বাক্যহারা হইয়া বসিয়া থাকে। সব চেয়ে আশ্চর্য, সে এক ফোটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলিতে পারে না। মাঝে-মাঝে তাহার সরমার কথা মনে পড়ে। সে নমিতার চেয়ে বয়সে কিছু বড়, একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। বিধবা হইয়াও সে আরসবায়ের মত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়, কোনো কিছু একটা আয়ত্তাতীত অথচ অভিলষিতের অভাববোধ তাহাকে অধীর উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে নাই। একটি সন্তান পাইলে নমিতার অন্তরের সমস্ত নিঃশব্দতা হয়তো মুখর হইয়া উঠিত—এমন করিয়া দুরপনেয় ব্যর্থতার সঙ্গে তাহার দিনরাত্রি মিথ্যা বন্ধু তা পাইতে হইত না। একটি সন্তান পাইলে নমিতা তাহাকে মনের মত করিয়া মানুষ করিত, তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিধিতে যতগুলি মহামানবের পদচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহাদের সকলের চেয়ে মহীয়ান, সকলের চেয়ে বরেণ্য— তাহা হইলে এত কাজের মধ্যেও সব কিছু তাহার এমন শুন্য ও অসার্থক মনে হইত না। সঙ্গোপনে একটি স্বল্পায়ু স্বপ্ন লালন করিবে, নমিতার সেই আশাটুকুও অস্তমিত হইয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার প্রেম এত গভীর ও সত্য হইয়া উঠে নাই যে, এই ক্লেশকর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে সে আনন্দ উপভোগ করিবে। কিন্তু স্বামী যদি তাহাকে একটি সন্তান উপহার দিতে এমন অমানুষিক কৃপণতা না করিতেন, তাহা হইলে হয় তো সেই অনাগত শিশুর মুখ চাহিয়া সে স্বামীর পূজা করিতে পারিত। বারান্দায় বসিয়া বা কখনো-কখনো কাকিমার ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইবার অবকাশে সে এই চিন্তাগুলিই নির্ভয়ে মনে-মনে নাড়াচাড়া করে, নিজের এই অকৃতার্থতার অতিরিক্ত আর কোনো চিন্তার অস্তিত্ব সে কল্পনাই করিতে পারে না।

নমিতার আসার পর হইতেই এ সংসারে যে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে ইহা অজয় লক্ষ্য করিয়াছিল। ছোট চাকরটাকে বিড়ি খাইতে কালেভদ্রে দুয়েকটা পয়সা দিলেই, সে পরম আপ্যায়িত হইয়া কুঁজোয় জল ভরিয়া, টেবিল সাফ করিয়া, বিছানাটা তকৃতকে করিয়া তুলিত। ইদানিং টের পাইল, চাকরটা অন্তর্হিত হইয়াছে; এবং দিদি হুকুম দিয়াছেন যে, এ-সব কাজ অজয়কে নিজ হাতেই সম্পন্ন করিতে হইবে। গূঢ় কারণটার মর্মার্থ সুমি-ই এক সময়ে অজয়কে জানাইয়া দিয়া গেল। অজয় বুঝিল, তাহার পরিচর্যা করিবার জন্যই চাকরটাকে রাখা হয় নাই এবং উপরের ঘরকরনা করিবার জন্য যখন নমিতার শুভাগমন হইয়াছে, তখন চাকরটার জন্য বাহুল্য খরচ করা সমীচীন হইবে না। নমিতার যে নীচে নামা বারণ, তাহাও সুমি অনুচ্চকণ্ঠে অজয়ের কানে বলিয়া ফেলিল; তাই তাহার ঘর-দোরের স্ত্রী ফিরিবার আর কোনই আশা রহিল না। তবু ছেলেটা এমন অকেজো ও অলস যে, নিজের বিছানাটা গুছাইয়া লইবে। তাহাতে পর্যন্ত তাহার হাত উঠিল না; সুপীকৃত অপরিচ্ছন্নতার মাঝে সে দিন কাটাইতে লাগিল। নমিতাকে সে চোখে এখনও দেখে নাই, তবু সংসারের আবহাওয়ায় যে একটা মাধুর্য সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা সে প্রতিনিয়ত অনুভব করে। নমিতার কাজে হাজার রকম ত্রুটির উল্লেখ করিয়া তাহার দিদি সর্ব্বদাই কর্কশ কথা বলিয়া চলিয়াছেন, আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও যে শিষ্টাচার মানুষে প্রত্যাশা করে কখনো কখনো তাহার কথাগুলি সেই ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিতেছে —অজয় মনে-মনে একটু পীড়িত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া দিদির অশিক্ষাজনিত এই অসৌজন্যকে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করে। সব চেয়ে আশ্চর্য এই, সব নিষ্ঠুর গালিগালাজের প্রতিবাদে নমিতা আত্মরক্ষা করিতে একটিও কথা কহে না, তাহার এই নীরব উপেক্ষাটি অজয়ের বড় ভালো লাগে। অজয়ের উপরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু পাছে তাহার অযাচিত সান্নিধ্যে একটি নিঃশব্দচারিণী নির্বাককুণ্ঠিত মেয়ে অকারণে সঙ্কুচিত ও পীড়িত হয়, সেই ভয়েই সে তাহার ছোট ঘরটিতেই রহিয়া গেছে—নমিতাকে উঁকি মারিয়া দেখিবার অন্যায় কৌতূহল তাহার নাই।

সেদিন রাত্রে কিছুতেই অজয়ের ঘুম আসিতেছিল না, পাশের নর্দামা হইতে মশারা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে আলমারির মাথা হইতে বহুদিনের অব্যবহৃত মশারিটা নামাইল, কিন্তু প্রসারিত করিয়া দেখিল, সেটার সাহায্যে বংশানুক্রমে ইদুর গুলির ভূরিভোজন চলিয়া আসিতেছে। অগত্যা নিদ্রাদেবীকে তালাক দিয়া সে রাস্তায় নামিয়া আসিল। গলিটুকু পার হইয়া হারিস রোডে পড়িবে, বাঁক নিবার সময় সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহাদের দোতলার বারান্দায় একটি মেয়ে রেলিঙে ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অজয় থামিল; বুঝিল, ইনিই নমিতা, নিদ্রাহীনা। স্তম্ভিত হইয়া কতক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল খেয়াল নাই, সে যেন তাহার চোখের সম্মুখে একটা নৈর্ব্যক্তিক আবির্ভাব দেখিতেছে। রাত্রির এই গাঢ় স্তব্ধতা যদি কোনো কবির কল্পনাস্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া আকার নিতে পারিত, তবে এই পবিত্র সমাহিত সুগম্ভীর নারীমূর্তিই সে গ্রহণ করিত হয়ত। মুহূর্তে অজয়ের হৃদয়ে বেদনার বাষ্প পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। এত বড় সৃষ্টি হইতে সম্পর্কহীন এমন একটি একাকিনী মূর্তি দেখিয়া বিস্ময়ের প্রাবল্যে যেন

চলিবার শক্তিটুকুও সে হারাইয়া বসিয়াছে। চরিতার্থতাহীনতার এমন একটা সুস্পষ্ট ছবি সে ইহার আগে কোনো দিন কল্পনাও করিতে পারিত না।

পরের দিন রাত্রেও আবার সে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, নমিতা তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যেন এই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে বিলীন হইয়া গেছে। আজ হঠাৎ কেন জানি না নমিতাকে দেখিয়া তাহার মনে নূতন আশা-সঞ্চার হইল, নমিতা যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একটি সুস্পষ্ট সহজ সঙ্কেত। এই নমিতাকে তাহাদের দলে লইতে হইবে। কৃত্রিম সংসাবের গণ্ডীতে জন্মান্ধ কূপমণ্ডুকের মত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া দিনযাপন করিলে তাহার চলিবে না; কর্মে, শিক্ষায়, চরিত্রমাধুর্যে তাহাকে বলশালিনী হইতে হইবে। সেই সুষুপ্ত মধ্যরাত্রিতে অবারিত আকাশের নীচে নমিতার প্রতি অজয় এমন একটি সুদূববিস্তৃত সহানুভূতি অনুভব করিল যে, যদি তাহার শক্তিতে কুলাইত, তখনি তাহাকে ঐ অবরোধের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া দৃপ্ত বিদ্রোহিনীর বেশে পথের প্রান্তে নামাইয়া আনিত।

ছোট মেয়েটা যথারীতি চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে। নমিতা ছুটিয়া গিয়া যথাপূর্ব্ব মেয়েটাকে কোলে নিয়া প্রবোধচেষ্টায় পাইচারি আরম্ভ করিল। নমিতা যে সামান্য সংসার কর্তব্যসাধিকা এই সত্যটি অজয়ের চোখে এখন সহসা উদঘাটিত হইল দেখিয়া তাহার চমক ভাঙিল। তুচ্ছ সন্তানপালন কি তাহাকে মানায়? বাঙলাদেশে তাহার জন্য ঝাঁকেঝকে মেয়ে আছে। নমিতা সর্ববন্ধনমুক্তা সর্বদায়িত্বহীনা বিজয়িনী।

তাহার পরদিন অজয় সুমিতাকে নিয়া পড়িল। নমিতা কিছু পড়াশুনা করে কি না, এইটুকু জানিতেই তাহার প্রবল ঔৎসুক্য হইয়াছে—সুমি ইহার উত্তরে যাহা বলিল তাহা স্বীকার করিতে গেলে তাহার দিদিকে কালিদাসের চেয়েও বড় পণ্ডিত বলিতে হয়, কিন্তু দিদির প্রতি সুমির এই প্রশংসমান পক্ষপাতিত্বে অজয় বিশ্বাস করিল না।

আলমারি হইতে একখানা বই বাহির করিয়া বলিল,-“এ বইখানা তোমার দিদিকে পড়তে দিয়ে এসো, কেমন?”

সুমি ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—“দিদি আমার মত বানান করে পড়ে না, একনাগাড়ে পড়তে পারে। আমি যাচ্ছি এখুনি।”

অজয় সুমিকে ডাক দিয়া ফিরাইল, প্রায় কানে কানে কহিবার মত করিয়া বলিল,-“বইটা কে দিয়েছে বলে না যেন, বুঝলে?”

সুমির সঙ্গে অজয়

সুমির সঙ্গে অজয় লুকোচুরি খেলিতেছিল। আত্মরক্ষা করিতে সে এক-এক লাফে তিনটা করিয়া সিড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতেছে, মাঝপথে হঠাৎ নমিতাকে নামিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া বসিল,—"আমি এই দরজার আড়ালে গিয়ে লুকোচ্ছি, সুমি খুজতে এলে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়ো।" বলিয়া অজয় দরজার পিছনে আত্মগোপন করিল। দুইটা দুয়ার যেখানে আসিয়া মিশিয়াছে তাহারই সামান্য ফাঁক দিয়া সে দেখিতে পাইল, নমিতা নীচে না নামিয়া সুমিকে ভুল সংবাদ দিবার জন্য সেইখানে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় মিনিট দুই কাটিল, নমিতার নড়িবার নাম নাই।

সুমি হঠাৎ চীনে-বাদাম-ওলার ডাক শুনিয়া যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া ততক্ষণ বাদাম চিবাইতেছে-সে-খবর ইহাদের কানে পৌঁছাইবার সম্ভাবনা ছিল না। জয়-দা যে তাহার আক্রমণের ভয়ে এমন সন্ত্রস্ত হইয়াছেন ও তাঁহার দুর্গ-দুয়ারে প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াছেন, তাহা জানিলে সুমি নিশ্চয়ই এত অনায়াসে রণে ভঙ্গ দিত না।

আরো কিছুক্ষণ কাটিলে অজয় বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, নমিতা তখনো কুণ্ঠিতকায়ে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন একটা নিভৃত মুহূর্তে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া অন্তর্হিত হইলেই সৌজন্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখানো হয় কি না, সেই বিষয়ে মনে মনে কোনো প্রশ্ন না তুলিয়াই অজয় আবার কহিল, "সুমি বোধ হয় কয়লার ঘরে আমাকে খুঁজতে গেছে। সত্যি, সেখানে গিয়ে লুকলে আমাকে ওর আর এ-জন্মে বার করা চলত না।"

এটা অবশ্য অত্যুক্তি, কেননা বর্ণসম্পদে অজয় এতটা হেয় নয় যে, একেবারে কয়লার উপমেয় হইয়া উঠিবে। তবু, অতিশয়োক্তিটার দরুণ একটা প্রত্যুত্তর পাইবার আশা আছে মনে করিয়া, অজয় নিজের গায়ের রঙ সম্বন্ধে এমন একটা বিনয় করিয়া বসিল। নমিতা স্বল্প একটু হাসিল, ঘোমটা টানিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং সরিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে মনে করিয়া এক পা বাড়াইয়া আর যাইতে পারিল না।

কয়েক ধাপ নীচে নামিয়া অজয় নমিতার প্রায় নিকটে আসিয়া কহিল,—"বাড়িটা কঁকা-ফঁকা ঠেছে। দিদি ওঁরা কোথায় গেলেন?"

এ-প্রশ্নটা এমন নয় যে ইহার উত্তরে বাক্যস্ফুরণ করিলে নমিতার অঙ্গহানি হইবে, যদিও কড়া শাসনের অত্যাচারে তাহার আত্মকর্তৃত্বহীনা অবামুখী হইয়া থাকিবারই কথা ছিল। কিন্তু উত্তরটা এত সহজ ও সময়টি এত নিভৃত যে, নমিতা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। স্পষ্ট করিয়াই কহিল,—"কাকিমারা সবাই ম্যাটিনিতে থিয়েটার দেখতে গেছেন।"

—“ছেলেপিলেরাও গেছে?”

–“হ্যাঁ।“

—“সুমি গেল না কেন?”

একটু থামিয়া নমিতা বলিল,-“মা যেতে দিলেন না।”

এই থামিবার অর্থ টুকু অজয় বুঝিল। সাহস করিয়া কহিল,-“কিন্তু তুমিও বাড়িতে রইলে যে। গেলেই ত’ পারতে।”

দৃঢ়নিবদ্ধ ঠোঁট দুইটি ঈষৎ প্রসারিত করিয়া নমিতা আবার একটু হাসিল! কিছু বলিবার আর প্রয়োজন ছিল না। এই হাসিটিতে বিষাদের স্বাদ পাইয়া অজয় বলিল,—“তোমার বুঝি আনন্দ করবার অধিকার নেই?”

নমিতার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, অজয় সিড়ির যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নামিতে হইলে তাহার স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে; তাই সচকিত হইয়া নমিতা কহিল,—“সরুন।”

—“নীচে কেন যাচ্ছ?”

—“মা-র আহ্নিকের জন্যে গঙ্গাজল আতে।”

-“তুমি আহ্নিক কর না?”

অজয় ভাবিয়াছিল ইহার উত্তরে নমিতার মুখে আবার হাসি ফুটিবে। কিন্তু নমিতা সত্যভাষণের উপযুক্ত সহজ ও স্পষ্টস্বরে বলিল,—“পূজোর পরে আমাদের গুরুদেব আসবেন—তার কাছ থেকে আমার মন্ত্র নেবার কথা আছে।”

কথাটা শুনিয়া অজয়ের সমস্তগা যেন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু চিত্তের অসন্তোষ দমন করিয়া সংযত শান্তকণ্ঠে কহিল,—“এই অল্প বয়সেই স্বর্গের জন্যে তোমার এত লোভ?”

উদাসীনকণ্ঠে নমিতা উত্তর দিল : “এ-ছাড়া আমার আর কী-ই বা করবার আছে?” বলিয়া সিড়ি দিয়া একটু তাড়াতাড়িই নীচে নামিয়া গেল।

ঘটে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া উপরে উঠিবার সময় নমিতা দেখিতে পাইল অজয় তেমনি সিড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে—যেন তাহারই প্রতীক্ষায়। সঙ্কুচিত হইয়া স্পর্শ বাচাইয়া আবার সে উঠিতে যাইতেছে, অজয় বলিল,-“তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—অনেক

কথা। তোমার সঙ্গে এতদিন এক বাড়িতে বাস করে'ও যে আলাপ হয় নি, তার কারণ আমার সৌজন্যের আতিশয্য আর তোমার ভীরুতা। কিম্বা সত্য কথা বলতে গেলে আমাদের সমাজের অনুশাসন। আজ যখন দৈবক্রমে তোমার সঙ্গে আলাপ হ'লই, তখন একটু সবিস্তারে তোমার সঙ্গে কথা ববার অনুমতি আমাকে দেবে না?"

কি বলিবে নমিতা কিছু ভাবিয়া পাইল না; যেন তাহার গ্রীবা সম্মতিসূচকসঙ্কেত করিয়া বসিল।

উপরে উঠিবার পথ ছাড়িয়া দিয়া অজয় আবার কহিল,—"অনুমতি ত' তুমি দেবে, কিন্তু তোমার অভিভাবকরা যে তাতে আলাদে আটখানা হবেন তার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এতদিন একসঙ্গে থেকে আমি এটুকু যে একেবারেই বুঝিনি তা তুমি মনে কোরো না। আচ্ছা, সে-কথা পরে হবে—মাকে গঙ্গাজল দিয়ে এস। আজকে বিকেলে অন্তত অভিভাবকদের শুভেচ্ছা তোমাকে স্পর্শ কবে না।"

বলিয়া অজয় চলিয়া যাইতেছিল, নমিতা সোৎসাহে প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

—"এই আসছি—আমার ঘরের জালাগুলো ভোলা আছে, কী রকম মেঘ করেছে দেখেছ? একবার বৃষ্টি নামলে আর রক্ষে নেই— বিছানা-বালিশ সব কাদা! অভিজ্ঞতাটা অবশ্যি নতুন হতো না, কিন্তু কাল থেকে জ্বর-ভাব হয়েছে বলে একটু সাবধান হচ্ছি। আমি যাচ্ছি ওপরে-বারান্দায়। দু' মিনিট।"

বারান্দা বলিতে ঐ দক্ষিণের বারান্দাটিই বুঝায়,—মাকে আহ্নিকে বসাইয়া, দুয়েকটি গৃহকর্ম্ম সারিয়া নমিতা ধীরে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আগেই অজয় রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। প্রথম অজয় নমিতার আবির্ভাবটিকে লক্ষ্য করিল না বলিয়া, আর দুয়েক পা অগ্রসর হইয়া আরো একটু কাছে আসিতে নমিতার ভারি লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু আরো একটু কাছে না আসলে আলাপ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে না। নুমিতা কি করিবে কিছু ভাবিয়া না পাইয়া তেমনি রেলিঙ ধরিয়া দূরে কালো আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল।

অজয়ই হঠাৎ সজাগ হইয়া কাছে সরিয়া আসিল। কোনো রকম ভূমিকার সূচনা না করিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিল : "পূজো-আহ্নিক করা ছাড়া তোমার আর কোনো বড় কাজ করবার সত্যিই কি কিছু নেই?"

নমিতা কথা বলিতে জোর পাইল না বটে, কিন্তু তবু কহিল, "ওঁদের মতে পূজো-আহ্নিক করে বাকি জীবনটা কোনো রকমে কাটিয়ে দেওয়াই আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

—“বাকি জীবন?” অজয় যেন আকাশ হইতে পড়িল : “বাকি জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছু স্পষ্ট ধারণা করতে পারো? তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে এই ছোট সঙ্কীর্ণ আকাশটুকু দেখে সমস্ত পৃথিবীর ছবিটা মনে মনে একে নিতে পারো? বাকি জীবন! অসৌজন্য মাপ করো, তোমার বয়েস কত?”

নমিতা লজ্জায় মুখ নামাইল। অজয় আবার কহিল,-“তোমার মতো বয়সে ফ্রান্সে জোয়ান অব আর্ক দেশ স্বাধীন করতে যুদ্ধ করেছিলো—বাকি জীবনটাকে খরচের ঘরে ফেলে দেউলে হয় নি। সেসব খবর তুমি নিশ্চয়ই রাখে না, তাই এমন স্বচ্ছন্দে নিজের সম্বন্ধে এতটা উদাসীন হ’তে পেরেছ। তোমাকে তিরস্কার করছি না, কিন্তু এটা মনুষত্ব নয়।”

নমিতার স্বর ফুটিতেছিল না, তবু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কহিল,–কিন্তু বিধবার আর অপর কর্তব্য নেই। ভগবৎ-ভক্তিই তার একমাত্র ভরসা।”

অজয় হাসিয়া উঠিল; কহিল,—“তোমাকে এ-সব কথা কে শেখালে? বিধবা তুমি কি ইচ্ছে করে’ হয়েছ? তুমি কি সাধ করে স্বেচ্ছায় এই বৈরাগ্যের বেশ নিয়েছ? নিয়তির বিধানের চেয়েও সমাজের শাসন যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন অন্ধের মতো তার কাছে। বশ্যতা স্বীকার করা মানে নিজেকে অপমান করা। তোমার ভগবান তোমাকে ঘরে বসে’ মুড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করতে উপদেশ দিয়েছেন? এই যে দলে দলে লোক যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে, দেশ স্বাধীন কতে কারাগারকে তীর্থ করে তুলছে, তারা সব ভগবানের বিরুদ্ধাচারী?”

নমিতা ঘাড় নীচু করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল,—“কিন্তু সংসারের শান্তি রাখতে হলে প্রতি পদে আমাকে তার মুখ চেয়ে চলতে হবে। সংসার চায় আমি বসে বসে কড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করি।”

অজয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে : “কাদের নিয়ে সংসার? জান, সমাজ আমরা সৃষ্টি করেছি, আমরাই তাকে ভাঙবো। আমাদের আবার অধিকার না থাকলে আমরা তাকে মান্বো কেন? যা তোমাকে তৃপ্তি দেয় না বরং সমস্ত জীবনকে সঙ্কুচিত খর্ব করে রাখে, সেই আচার তোমাকে পাড়ার পাঁচজনকে খুসি করতে অম্লানবদনে পালন করতে হবে, সেটা খুব উচ্চাঙ্গের সতধর্ম্ম নয়। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনের উপর প্রভুত্ব খাটাতে পারে এমন একটা কৃত্রিম শক্তিকে যদি তুমি মাননা, তবে সেই হবে তোমার সত্যিকারের মৃত্যু। আমরা এমন মরবার জন্যে জন্মাইনি।”

ঝর ঝর করিয়া শরৎকালের বৃষ্টি নামিয়া আসিল। নমিতা কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া কহিল, —“কিন্তু সংসার বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার শক্তি বা যোগ্যতা আমার কিছুই নেই। যারা দেহে মরবার আগে আত্মায় মরে থাকে, আমি তাদেরই একজন। আমাকে দিয়ে আমার নিজেরো কোনো আশা নেই।”

কথা শুনিয়া অজয় মুগ্ধ হইয়া গেল,বৃষ্টির সঙ্গে এই কথা কয়টি মিলিয়া আকাশে ও মনে এমন একটি মাধুর্য বিস্তার করিল যে, ক্ষণকালের জন্য সে অভিভূত হইয়া রহিল।

পরমুহূর্তেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল : "ভারতবর্ষ বহু বৎসর ধরে' স্বাধীনতার সাধনা করছে, সে খবর তুমি রাখ?"

একটু হাসিয়া নমিতা বলিল,—"রাখি বৈ কি।"

—"কিন্তু কেন সফল হচ্ছে না জান?"

—"কেন?"

—"আমরা এত সব ছোটখাটো শাসন ও সংস্কারের দাসত্ব করছি যে বড়ো একটা মুক্তির পথে আমাদের পদে-পদে বাধা ঘটছে। আমরা যে মন্দির-বেদী গড়তে চাই তার থেকে অস্পৃশ্য বলে' অনেক কাউকে সরিয়ে রাখি। নিজের কাছে মুক্ত, স্বতন্ত্র না হতে পারলে বাইরের মুক্তি আমরা কি করে পেতে পারি বলল? প্রকৃতির রাজ্যে সব কিছুই নিয়মাধীন— আমাদের বেলায়ই তার ব্যতিক্রম ঘটবে সেটা আমাদের প্রকাণ্ড দুরাশা। আমরা সমাজে ছ'শো ছত্রিশটা দেওয়াল গেঁথে একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে কোটি কোটি স্বার্থপরতার সর্ষ বাধাবো, সমাজগঠনে সুবিধে না দিয়ে নাবীকে রাখব পদদলিত, চাষা-মজুরকে রাখবো পায়ের ক্রীতদাস আর হাতের ক্রীড়নক—আমরা কি করে বৃহত্তর স্বাধীনতার দাবি করতে পারি? তার মানে, সাফল্য আমাদের সেইদিনই অনিবার্য নমিতা, যেদিন আমরা প্রত্যেকে বর্তমানের এই শূন্য না থেকে এক হয়ে উঠেছি। আমরা প্রত্যেকে যদি এক হই, তবে কেউ আর একাকী থাকবে না। তেত্রিশ কোটি শূন্য যোগ দিলে সেই শূন্যই থেকে যাবে— শত যোগবলেও সেই যোগফল তুমি বদলাতে পারবে না কখনো।"

খানিক থামিয়া অজয় আবার কহিল,—"হ্যাঁ, বিদ্রোহ করবার যোগ্যতা তোমার নেই—নিজের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তোমার এই জ্ঞানটুকু আছে বলে তোমার ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেলো। কিন্তু সেই যোগ্যতা তোমাকে অর্জন করতে হবে। তুমি চম্‌কে উঠো না। যোগ্য না হয়ে আজ যদি তুমি সংসারের বিরুদ্ধাচরণ কর, সেটা তোমাকে শোভা পাবে না বলেই লোকের চোখে লাগবে প্রখর দৃষ্টিকটু, এবং স্বয়ং আমি পর্যন্ত বলববা অন্যায়—তোমাকে ধিক্কার দেবব। কিন্তু যেদিন তুমি আত্মার শৌর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়ে উঠে এই সব তুচ্ছ সংস্কার ও মিথ্যাচারকে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে—সেদিন সব্বারই আগে যার প্রণাম পাবে সে আমাব।"

নমিতার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল; ধীর সংযতকণ্ঠে সে কহিল,—"কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণটাই কি বড়ো কীর্তি হবে?"

—"যাকে তোমার এখন মাত্র বিদ্রোহাচরণ মনে হচ্ছে, তখন দেখবে সেই তোমার জীবন। তখন যেটা তোমার কাছে একান্ত সহজ, ন্যায্য ও স্বাভাবিক মনে হবে—সেটাই অন্যের মতে হবে অন্যায়, কেউ-কেউ বা তার সংজ্ঞা দেবে পাপ। পরের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার জন্যে আমরা হাটতে শিখিনি। অনবরত সীমারেখা টেনে-টেনে জীবনকে আমরা কুণ্ঠিত ও সঙ্কীর্ণ করে রেখেছি বলেই আমরা অহর্নিশ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাদৃশ্য বাঁচিয়ে চলতে চাই। কিন্তু জীবনের পরিধিকে বিস্তৃত করে দিতে থাক, ব্যক্তিত্বের সাধনায় তুমি ক্রমোন্নতি লাভ কর, দেখবে তুমি অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছ। তাকে যদি বিদ্রোহ বল, আমরা সেই বিদ্রোহ নিশ্চয়ই করব। তখন বিদ্রোহ না করাটাই হবে আত্মহত্যা।"

শরৎকালের বৃষ্টি স্বল্পায়ু—অনেকটা নারীর ভালবাসার মত। বৃষ্টির পরে আকাশ আবার স্নিগ্ধ ও বেদনাতুর চোখের মত ভাবগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। আবার কথা সুরু বরিতে দেরি হইতেছিল। চুপ করিয়া কত ক্ষণ কাটিল কাহারো কিছু খেয়াল ছিল না। হঠাৎ অজয় প্রশ্ন করিল : "সমস্ত দিন তুমি কি করে কাটাও?"

নিমেষে নমিতার ঘোর কাটিল বুঝি,—আবার সে তাহার নিরানন্দ পৃথিবীর মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কহিল,–"কি করে আর কাটাই? কাজ কর্ম্ম করি আর ঘুমুই।"

—"এ রকম করে' ক'দিন কাটাবে? তোমার মুখের সেই অসার উত্তরটা আমি শুনতে চাই না। বলতে চাই, এম্‌নি করে অমূল্য সময় অপব্যয় করে তোমার কোন পরমার্থ লাভ হচ্ছে?"

—"কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কী-ই বা করবার আছে?"

—"তুমি পড় না কেন? সুমিকে দিয়ে তোমাকে যে একটা বই। পাঠিয়েছিলুম তা পড়েছিলে?"

নমিতার মুখে অল্প একটু হাসি দেখা দিল; কহিল,-"তা পড়া বারণ হয়ে গেছে।"

—"বারণ হয়ে গেছে? কারণ?"

—"কারণ, কাকা ও-সব উপন্যাস-পড়া নিষেধ করেছেন।"

অজয় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; "উপন্যাস? ও ত' একটা ইতিহাস মাত্র—শাদা সত্য ঘটনা। আর, মাছ মাংস মশুর ডালের মত উপন্যাসও তোমাদের নিষিদ্ধ নাকি? মনুর কোন্ অধ্যায়ে তা লেখা আছে?"

নমিতার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাস স্পষ্ট হইয়া উঠিল : "আমাকে গীতা পড়তে বলেছিলেন। সংস্কৃত শব্দরূপই জানি না তা তার মাথামুণ্ডু আমি কি বুঝবো ছাই? ওটা আমার চমৎকার

ঘুমুবার ওষুধ হয়েছে।”

আরো একটু কাছে সরিয়া আসিয়া অজয় কহিল,—“এটা তোমার কাছে জুলুম মনে হয় না?”

—“জুলুম কিসে?”

-“মানুষকে ভালো করার মধ্যেও একটা পরিমাণ জ্ঞান থাকা উচিত। জামাইবাবুকে একখানা টিগোনোমেট্রির বই দিয়ে আঁক কষতে বল না।”

—“কিন্তু ধর্মগ্রন্থ ছাড়া আর আমাদের পাঠ্য কী হতে পারে?”

—“আমাদের আমাদের করে তুমি নিজেকে একটা গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে ছোট করে তুলছ কেন? তুমি কি মানুষ নও? তোমার কপালে সিদূর নেই বলেই যে তোমার জীবনধারণে কোনো সুখ থাকবে না—এ যারা তোমাকে বোঝাতে চায় তারা তোমার আত্মার অত্যাচারী। তাদেব তুমি মেনো না। আমি আছি তোমাব বন্ধু। কী করে সময় কাটাবে? খুব করে পড়ে। প্রথমত তাই পড়ে। যা বুঝতে ব্যাকরণ লাগে না, লাগে শুধু অনুভূতি। যেমন ধরো কবিতা। তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।”

নমিতা একটু ভীত হইয়া বলিল,—“কিসের জন্যে?”

—“নিজেকে আবিষ্কার করবার জন্যে।”

—“ও-সব কথার মানে আমি বুঝি না।”

—“সে বোঝবার সময়টুকু পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি আনছি বই। জীবনকে দেখবার জন্যে বই হচ্ছে বাতায়ন, সে বাতায়ন দিকে দিকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।” বলিয়া দ্রুতপদে অজয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

মধ্যরাত্রে নমিতা আবার ঘুম হইতে উঠিয়া বারান্দার ধারটিতে আসিয়াছে। কয়েকবার বৃষ্টি হইয়া যাইবার পরেও আকাশের স্তম্ভিত ভাবটা এখনো কাটিয়া যায় নাই—সেই নিরানন্দ বিবর্ণ আকাশের তলে সমস্ত শহরটা যেন অবসন্ন হইয়া ঝিমাইতেছে—পৃথিবী আর চলিতে পারিতেছে না। বিকাল হইতে নমিতার মন-ও রাতের আকাশের মত ঘোলাটে হইয়া রহিয়াছে—নানা সমস্যা ও সংস্কারের আবর্তে পড়িয়া সে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ মুহূর্তগুলি যেন তাহাকে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে না—প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ফলবান হইবার জন্য তাহাকে উদ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই আত্মবিস্মৃতিময় আরাম তাহাকে আর পোষাইবে না। কিন্তু এই দুঃখের আরামকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া নবজীবনের ঝড় আসিবে কবে?

হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল রাস্তায় কে একজন পাইচারি করিতেছে। আজ তাহার চোখ কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে, ভালো করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিল, অজয়। রোজই ত' এই সময় এমনি একটি লোক রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে, এমন করিয়া কোন দিনই সে লক্ষ্য করে নাই। এত দিনের সেই লোকটিই যে অজয় ইহার সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহও তাহার মনে রহিল না এবং এই বিশ্বাসটুকুকেই অন্তরে লালন করিতে গিয়া নিমেষে নমিতা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আজ দূর হইতে অজয়কে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্য তাহার দৃষ্টি একাগ্র হইয়া উঠিল এবং এমন আগ্রহ সহকারে চাহিয়া থাকাটার মধ্যে কোথাও যে এতটুকু অসৌজন্য থাকিতে পারে, তাহা তাহার ঘুণাক্ষরেও মনে হইল না। লোকটিকে অজয় জানিয়া চোখ ফিরাইয়া লইলে এই রাত্রি বোধ করি আর কাটিত না। চলিতে চলিতে অজয় যখন মোড়ের গ্যাস-পোসটের কাছে আসিতেছে, তখন অনতিস্পষ্ট আলোতে তাহাকে একটু দেখিয়া লইতে না লইতেই অন্ধকার আসিয়া সব কালো করিয়া দিতেছে। তবু যেটুকু সে দেখিতে পাইতেছে না, সেইটুকুর জন্যই তাহার মন উচাটন হইয়া উঠিল।

কাকিমার ছোট খুকিটা অভ্যাসমত চেচাইয়া উঠিয়াছে। একটা হাত-পাখা দিয়া কাকিমা তাহাকে খুব পিটাইতেছেন : "মর মরু শুনি। সারা থিয়েটার জালিয়ে এসে হারামজাদির এখনো কান্না থামে না। কোনো দেবীর কৃপা হলেও ত' বেঁচে যাই।"

পাশের খাট হইতে কাকা হাকিলেন : "নমি উঠে আসে না কেন?"

কাকিমার উত্তর শোনা গেল : "ধুমুসসা হয়ে গিলতেই পারে সব। নমি আসবেন! মায়ে-ঝিয়ে দিব্যি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। পরের পয়সায় খেলে ডানিও নবাবের বেটি হয়ে ওঠে। '

এইবার সামনের ঘর হইওে মা'র ডাক অসিল : "নমিতা।"

অজগর সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া বিপুল রাজপথ ঘুমাইয়া রহিয়াছে; আকাশ নির্বাক, অন্ধের চক্ষুর মত সঙ্কেতহীন, গম্ভীর। অজয় আরেকবার মোড় ফিবিয়া গ্যাস-পোসটের তলা দিয়া ঘুরিয়া আসিল, আবার চলিয়াছে। দেয়ালের প্রান্তটুকু ঘেঁসিয়া বসিয়াও তাহাকে আর দেখা গেল না, ফিরিতে আবার এক মিনিট লাগিবে। না, খুকিকে কাঁধে ফেলিয়া হাঁটিয়া-হাটিয়া ঘুম পাড়াইতে হইবে। অজয়ের চোখে কি ঘুম নাই? না, নমিতাকে উঠিতে হইল।

অজয়কে বুঝিয়া উঠা ভার

অজয়কে বুঝিয়া উঠা ভার। সেই যে সেদিন দুই হাতে করিয়া কতকগুলি বই পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর দেখা হয় নাই। অথচ এমন কতকগুলি মুহূর্ত্ত খুঁজিয়া পাওয়া কখনই মুস্কিল হইত না যখন উদ্যত শাসনের উপদ্রব একটু শিথিল ছিল। একদিন এমন করিয়া সমস্ত হৃদয়ে সংশয়ের ঝড় তুলিয়া সহসা নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার কারণ কি, নমিতা কিছুই বুঝিতে পারিল না। নিজে গিয়া যে অজয়কে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা ভাবিতেও তাহার ভয় করে—সমস্ত সংসারের চোখে সেটা একটা বীভৎস অবিনয় মনে করিয়া সে নিবৃত্ত হয়, দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়া বইগুলিকে আঁকৃড়াইয়া ধরে। সুমিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর জয়-দা কি করছে রে?"

সুমি বলিল,—"কাল রাতে বাড়ি ফেরে নি। দু'দিন আমার সঙ্গে দেখা নেই।"

অজয়ের জন্য নমিতার মনে উদ্বেগ ও সহানুভূতি পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। সংসারের দৈনন্দিন চলা-ফেরার সঙ্গে তাহার একটুও মিল নাই, দূর হইতে অজয়ের ব্যবহারের এই প্রকাণ্ড অসঙ্গতিটা নমিতা লক্ষ্য করিয়াছে। কখন যে অজয় বাড়ি আসে তাহার ঠিক নাই, দুই দিন হয় ত' আসিলই না, স্নান না করিয়াই হয় ত' ভাতের থালা লইয়া গিলিতে বসে, মধ্যরাতে কল হইতে জল পড়িতেছে শুনিয়া কাকিমার আদেশে কল বন্ধ করিতে আসিয়া দেখিয়াছে, অজয় স্নান করিতেছে— আর অগ্রসর হয় নাই। এই সব নিয়মবহির্ভূত আচরণে দিদির মুখে তিরস্কারেরও আর বিরাম ছিল না, তবু এই ছেলেটি সমস্ত অভিযোগ আলোচনায় কান না পাতিয়া দিব্যি আত্মসম্মান লইয়া এই বাড়িতেই কালাতিপাত করিতেছে। অজয়কে নমিতার মনে হয় অসাধারণ, কোনো অভ্যাস বা নিয়মের সঙ্গেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে যেন কি-এক কঠোর সাধনায় লিপ্ত, একা-একা সংগ্রাম করিতে তাহার নিজের শক্তি যেন আর কুলাইতেছে না—তাহার ললাটে প্রতিজ্ঞার তীব্র দীপ্তি থাকিলেও দুই চোখে একটি ঔদাস্যময় ক্লান্তির ভাব আছে। ক্ষণেকের জন্যও সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে অজয়কে দেখিতে পাইলে নমিতা যেন তাহার অন্তরের এই অন্তহীন ক্লান্তিকর সংগ্রামের ইতিহাস এক মুহুর্তেই পড়িয়া নেয়। মনে হয় অজয়কে কোনো কাজে সাহায্য কবিতে পারিলে সে ধন্য হইয়া যাইত। কিন্তু যে দুই হাতে সবেগে নাড়া দিয়া তাহাকে এমন করিয়া জাগাইয়া দিল, সে সহসা আবার অপরিচয়ের অন্ধকারে ধীরে-ধীরে অপসৃত হইয়া যাইবে, ইহা ভাবিতে নমিতা চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

সেদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলে প্রায় একটার সময় এক মাথা রুক্ষ চুল লইয়া অজয় আসিয়া নীচের উঠানটুকুতে দাঁড়াইয়া হাঁক দিল : "দিদি হাঁড়িতে ভাত আছে?"

দিদি তখন দিবানিদ্রা ভোগ করিতেছিলেন, তাই এক ডাক যথেষ্ট নয়। অজয় আবার ডাক দিল। পাশের ঘরে নমিতা দেয়ালে পিঠ রাখিয়া অভিধানের সাহায্যে একটা রুষীয় উপন্যাসের মর্ম্মোদঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ক্ষুধিত অজয়ের ডাক শুনিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গিয়া ঘুমন্ত কাকিমার পায়ে নাড়া দিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিল। এই ব্যবহারটাও যে তাহার নীতিশাস্ত্রের ঠিক অনুযায়ী হয় নাই তাহা সে জানিত, কিন্তু ক্ষুধার সময় অজয় দুইটা ভাত চাহিতে আসিয়াছে, এই খবর পাইয়া সে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

কাকিমা উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"এই অসময়ে কে তোর জন্যে ভাতের থালা নিয়ে বসে থাবে শুনি? রাতে কোথায় পড়ে ছিলি? তুই তোর খুসি-মত যা-তা করবি, কখন খাবি কখন খাবি নেবসে বসে' কে তার হিসেব রাখবে? আমি বাড়িতে বাবাকে লিখে দিচ্ছি—এরকম হলে তোমার এখানে আর পোষাবে না। সংসারের সুবিধে না দেখে নিজের খেয়ালমাফিক চলা-ফেরা করতে চাও, হোটেল আছে।"

এত কথায়ও অজয়ের স্থৈর্য্য একটুও টলিল না—এ-সব কথা যেন তাহার একেবারেই গ্রাহ করিবার নয়। সে পরিষ্কার সহজ গলায় কহিল,—"বেশ ত' নাই পেলুম ভাত—চৌবাচ্ছায় জল আছে ত'? স্নান করতে পারলেই আমার অর্দ্ধেক খিদে যাবে। যাঃ, জলও নেই। আমি এখন আবার বেরুচ্ছি, দিদি। সন্ধ্যের সময় আসতে পারি, তখন দু'মুঠো ভাত পেলেই আমার চলবে।" বলিয়া অজয় সেই অভুক্ত অবস্থায়ই বাহির হইয়া গেল।

বিড়বিড় করিতে করিতে কাকিমা জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার শয্যা লইলেন, কিন্তু নমিতার মনে কোথায় বা কেন যে ব্যথা করিয়া উঠিল, তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কাকিমার এই ব্যবহারে তাহার নিজেরই আর লজ্জার শেষ ছিল না—এ-সব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিবার তাহার কোনোই অধিকার নাই। তবু যতদূর সম্ভব কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া সে কহিল, "না খেয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। সামান্য দুটো ফুটিয়ে দিলে হত না?"

একে নমিতাই অকারণে তাঁহার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে, তাহার উপর তাহার মুখের উপর অজয়ের হইয়া সে ওকালতি করিতে চায়—কাকিমা জ্বলিয়া উঠিলেন : "তোর আবার আদর উথলে উঠলো কেন? তুই যে দিন-কে-দিন বড় বেহায়া হচ্ছি।"

নিজের উপর সমস্ত তিরস্কার ও লাঞ্ছনা নমিতা নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু অজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া এই হীন বাক্যযন্ত্রণা সে সহিতে পারিল না। তবু স্বভাবসুলভ বিনয় করিয়াই কহিল,—"না খেয়ে বাড়ি থেকে কেউ চলে গেলে বাড়ির মঙ্গল হয় না শুনেছি—সংসারে শ্রী থাকে না।"

কথার তাৎপর্যে যতটা না হোক, নমিতা যে আবার তাহার কথার প্রতিবাদ করিল, এই অশ্রদ্ধা দেখিয়া কাকিমা রাগে একেবারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন; সুর চড়াইয়া দিতে হইল : "বাড়ির মঙ্গল হবে না মানে? তুই আমার সমস্ত বাড়িকে শাপ দিচ্ছিস নাকি? নিজে স্বামী খেয়ে শাকচুন্নি সেজে পরের মঙ্গলে তোমার হিংসে হচ্ছে।" ধীর-কণ্ঠে নমিতা কহিল,—"অমন যা-তা বলল না কাকিমা।"

—"কেন বলবো না শুনি? সংসারে শ্রী থাকবে না? শ্রী আছে তোমার কপালে!"

গোলমাল শুনিয়া নমিতার মা উঠিয়া আসিলেন। তাহাকে শুনাইবার জন্য কাকিমা গলায় আরো শান্ দিতে লাগিলেন : "আমার ভায়ের জন্য এতই যদি তোর মন পুড়ছিল হতভাগী, নিজে গিয়ে মাছ মাংস বেঁধে দিলি নে কেন? ক্ষীরের পুলি তৈরি করে দিতি বসে' বসে।"

নমিতা নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। শুনিতে পাইল মা-ও কাকিমার পক্ষ লইয়া তাহাকেই মন্দ বলিতেছেন। মা'র এই অসহায় অবস্থায় কাকিমার বিরোধিতা করিবার উপায় ছিল না, তাই তাহাকে বাধ্য হইয়া কাকিমার এই কটুবাক্যে সায় দিতে হইতেছে। আর-আর দিন তিরস্কৃত হইয়া নমিতা নিজেকে একান্ত ব্যর্থ মনে কবিয়া চোখের জল ফেলিত, আজ সে বুঝিল, এইভাবে এই অন্যায় বরদাস্ত করা তাহার আত্মসম্মানের অনুকূল হইবে না। নারী এবং পরাবলম্বী হইয়াছে বলিয়াই যে, তাহাকে মাথা পাতিয়া চিরকাল এই ঘৃণ্য নির্যাতন সহিতে হইবে এবং আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া একটা প্রতিবাদ করিবার জন্য পর্যন্ত ভাষা পাইবে না, তাহা ভাবিতে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বালতে লাগিল। কিন্তু সম্প্রতি তাহার কোনো প্রতিকার নাই—তবু মনে মনে এই একটা বিদ্রোহতাব পোষণ করিয়া তাহার তৃপ্তির আর অবধি রহিল না।

মা নমিতার সঙ্গে কোনো কথা না কহিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাদিতে লাগিলেন; নমিতাও নিঃশব্দে বইয়ের উপর মুখ গুঁজিয়া রহিল। এই অবরোধ হইতে তাহারা কবে মুক্তি পাইবে? প্রদীপ সেই যে একটু বন্ধুতার আশ্বাস দিয়া পলাইয়াছে, আর তাহার দেখা নাই। পরের কাছ হইতে আশ্রয় বা সাহায্য নিতে গেলে কত বিপদ, কত ভয়, নমিতাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। কত নিন্দা, কত গ্লানি, কত অখ্যাতি—নমিতা শিহরিয়া উঠিল। সংসারে বন্ধুরূপে কাহাকেও স্বীকার বা গ্রহণ করাও বাঙালি মেয়ের নিষিদ্ধ,স্বামী যদি মরিল, তবেই তুমি অব্যবহৃত ছিন্ন জুতার সামিল হইয়া উঠিলে। এক বেলা আলোচাল খাইয়া তোমাকে ইহজীবন সার্থক করিতে হইবে। কোথায় একটা লোক মরিল, আর অমনি তোমার দেহ ও আত্মা একসঙ্গে পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া উঠিবে : এই বিধান মাথা পাতিয়া নিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না, অথচ প্রদীপ একটু স্নেহাতিশয্যে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া, শ্বশুর-মহাশয় তাহাকে কেবল মারিতে বাকি রাখিয়াছিলেন। এমন কি, সেখানে তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটিবার সুযোগ আছে বলিয়া, তাহাকে কাকার বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত বাড়ি নিঝুম হইয়া গিয়াছে। নমিতা বই মুড়িয়া রাখিয়া চুলের খোঁপাটা বাঁধিয়া লইয়া নীচে নামিতে লাগিল। এই তাহার প্রথম বিদ্রোহ। ভয় যে করিতেছিল না তাহা নয়, তবু যে-লোক সামান্য দুইটি ভাত চাহিয়া না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সে কেন যে একটি মধুর সমবেদনা অনুভব করিতেছে বুঝা কঠিন। সুমি কাকিমার ছেলেপিলেদের সহিত তাস নিয়া ঘর-বানানোর খেলাতে মত্ত ছিল, দিদিকে লক্ষ্য করিল না। নমিতা সোজা অজয়ের ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দরজা দু'ফাঁক হইয়া রহিয়াছে, বেশ দেখা গেল ঘরে কেহ নাই। ঘরে কেহ নাই ভাবিয়াই নমিতা আসিতে পারিয়াছে, নচেৎ তক্তপোষের উপর অজয়কে শুইয়া থাকিতে দেখিলে বিদ্রোহিনী নমিতা লজ্জায় জিত, কাটিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করিত হয় তো।

ঘরের চেহারা দেখিয়া নমিতা ছি ছি করিয়া উঠিল—এই ঘরে মানুষে থাকে! তক্তপোষের উপর ছেড়া একটা মাদুর পাতা—তাহার উপর একটা তোষক আছে বটে, কিন্তু সেটাকে একটা কথা বলিলেও অত্যুক্তি করা হয়। মশারির তিনটা কোণ ছিঁড়িয়া গিয়া বিছানার উপরই বিস্তৃত হইয়া আছে, ছেড়া বালিশের তুললাগুলি মেঝেয় ও বিছানায় এলোমেলো হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে। সদ্য-কাচাননা কয়েকটা ধুতি মেঝেয় ধূলার উপরই পড়িয়া আছে—ঘরে কতদিন যে। ঝট পড়ে নাই, তাহার চেয়ে আকাশে কয়টা তারা আছে বলা সহজ। টেবিলটার উপর স্তূপীকৃত বই, খাতা, ওষুধের শিশি, দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম—যেন একটা প্রকাণ্ড বাজার বসিয়াছে। নমিতা যেন হঠাৎ একটা কাজ পাইয়া গেল। এই বিশৃঙ্খল ঘরে যে-লোকটি বাস করে, সে কোন নিয়মের অনুগত নয় বলিয়া তাহার মনে ক্ষোতের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ একটি স্নেহ জমিয়া উঠিতে লাগিল।

অতি যত্নে নমিতা এই নংরা ঘরকে মার্জনা করিতে বসিল। ঝাঁটা কুড়াইয়া আনিয়া ধূলা ঝাড়িল, টেবিলটা ভদ্রলোকের ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তুলিল এবং টেবিলের কাছে যে চেয়ার আছে, নিজের অলক্ষিতে তাহারই উপর বসিয়া সামনের আয়নায় নিজের মুখ হঠাৎ দেখিতে পাইয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বিছানাটার সংস্কার করিতেছে, বলা-কহ নাই, হঠাৎ খোলা দরজা দিয়া সেই একমাথা রুখু চুল নিয়া অজয় আসিয়া হাজির!

বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটিতেই অজয় চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া শ্রান্তকণ্ঠে কহিল,—"যতই কেন না নাস্তিকতা করি, ভগবান বারে বারে প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, তিনি আছেনই আছেন। এখান থেকে ভাত

পেয়ে একবার ভাবছিলুম বেলেঘাটায় যাব, বাস্-এও উঠেছিলুম, কিন্তু হঠাৎ জ্বর এসে গেল। ভীষণ জ্বর!" বলিয়া নিজেই নিজের কপালে হাত রাখিল। কহিল,—"ভাব ছিলুম ঘরে

ত’ ফিরে যাব, কিন্তু বিছানা-পত্র যে রকম নোংরা হয়ে আছে শোব কি করে? বিছানা গুছোবার প্রবৃত্তি আমার কোনো কালেই ত’ নেই।”

মশারির একটা কোণ, হাতে ধরিয়া নমিতা চিত্রাপিতের মত দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়ের সঙ্গে বেদনা মিশাইয়া কহিল,-“জ্বর হ’ল?”

—“কত অত্যাচার আর সইবে বল? তখন যে ক্ষুধার সময় ভাত পেলুম না, স্নানও যে করতে পারলুম না—ভালোই হয়েছে। অসুখটা তা হলে আরো বাড়ত—আমার অসুখ বাড়তে দিলে চলবে কেন? আমার যে কত কাজ—কী প্রকাণ্ড দায়িত্ব আমার হাতে।” একটু থামিয়া আবার সে প্রশ্ন করিল,—“কিন্তু তুমি হঠাৎ এ-ঘরে কেন, নমিতা?”

বিছানাটা ক্ষিপ্রহাতে যথাসম্ভব গুছাইয়া নিতে নিতে নমিতা কহিল, —“আপনিই ত’ তার উত্তর দিয়েছেন। আপনাকে নাস্তিকতা থেকে রক্ষা কতে।”

একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া অজয় বলিল,-“হবে।”

বিছানাটাকে শুইবার মত উপযুক্ত করিয়া নমিতা কহিল,—“আপনি। কাপছেন, শিগগির শুয়ে পড়ুন।”

অজয় এক লাফে বিছানায় আসিয়া আশ্রয় নিল।

নমিতা একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল,—“খুব কষ্ট হচ্ছে?”

অজয় কহিল,—“আমাকে এক গ্লাশ জল দিতে পার? খাব।”

—“আছি।” নমিতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে জল নিয়া আসিল।

জল খাইয়া সামান্য একটু সুস্থ হইয়া অজয় বলিল,-“এ ক’দিন বরাদুরে ত’ আর কম ঘুরিনি। মাথাটা যেন ফেটে পড়ছে। একটু হাওয়া করবে, নমিতা? দেখ, পাখাটা বোধ হয় তক্তপোৰের তলায় ঘুমুচ্ছে।”

তক্তপোষের তলা হইতে পাখাটা টানিয়া আনিয়া নমিতা শিয়রে দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহাতে বাতাস করিতে লাগিল। কহিল,—“কাকিমাকে ডেকে আনি, কেমন?”

অজয় অস্থির হইয়া কহিল,—“না না, আর কাউকে ডাকতে হবে। চেয়ারটা টেনে এনে এখেনে বসে’ তুমিই হাওয়া কর একটু।”

নমিতা না বলিয়া পারিল না : “কিন্তু কেউ দেখতে পেলে কি বলবেন ভাবুন দিকি।”

নমিতার মুখের উপর স্থির দুইটি চক্ষু তুলিয়া অজয় বলিল,–"তোমাকে মন্দ বলবেন? কিন্তু মন্দ তুমি ত' কিছু করছ না। কছ? রোগীর প্রতি যদি একটু পক্ষপাতিত্ব দেখাও, তার ত' একটা বড়ো রকম প্রশংসাও আছে।"

—"কিন্তু যারা নিন্দা করবেন তারা ত' আমার এই সেবাটুকুকেই দেখবেন না, দেখবেন অন্য কিছু।"

—"লোকে যদি ভুল দেখে তার জন্যে তুমি শাস্তি নেবে কেন? তুমি নিজে যদি অন্যায় বা অসঙ্গত বা অশিষ্টাচার মনে কর, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যাও—কিন্তু লোকেব তুচ্ছ মিথ্যাকে ভয় করে যদি পালাও, তা হলে আমার দুঃখ থেকে যাবে। আমাকে একটু হাওয়া করা কি তোমার অন্যায় মনে হচ্ছে?"

তাড়াতাড়ি চেয়ারটা টানিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া নমিতা কহিল, —"এখন আপনি চুপ করে একটু শুয়ে থাকুন তো, বিকেলে হয় ত' জ্বরটা নেবে যাবে।"

একান্ত বাধ্য ছেলেটির মত অজয় চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কয়েক মিনিট পাখা চালাইবার পর অজয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া, নমিতা চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া নিল। তারপর চোরের মত অতি সন্তর্পণে তাহার ডান-হাতখানি অজয়ের কপালের উপর রাখিয়া, তাড়াতাড়ি তখুনি আর সরাইতে পারিল না।

বাস-এ উঠিয়া প্রদীপের বিস্ময়

বাস্-এ উঠিয়া প্রদীপের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না : সামনের জায়গাটাতে পিছন ফিরিয়া উমা বসিয়া আছে। নিশ্চয়ই উমা। তাই বলিয়া এক-বাস লোকের সামনে হঠাৎ তাহাকে সম্ভাষণ করিলে সেটা বাঙলা-সমাজের রুচিতে হয়তো বাধিবে। উমা কোথায় নামে সেইটুকু লক্ষ্য করিবার জন্য প্রদীপ তাহার গন্তব্য স্থানের সীমাটুকু পার হইয়া চলিল। কেন না উমাকেও হঠাৎ চমকাইয়া দিতে হইবে।

বাস একটা গলির মোড়ে আসিয়া থাকিল। উমা এত উদাসীন যে, নামিবার সময়ও প্রদীপকে একবার লক্ষ্য করিল না, কিন্তু রাস্তায় পা দিতেই টের পাইল, পেছন হইতে কে তাহার আঁচল টানিয়া ধরিয়াছে। ভয়ে চোখ মুখ পাংশু হইয়া উঠিতে না উঠিতেই আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল :

—"আপনি এখানে? বা রে! আর আমি আপনাকে সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

প্রদীপ ততক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার আঁচল ছাড়িয়া দিয়াছে। ফুটপাতের উপর উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছ কি রকম? গুপ্তচর নাকি? এখানে এলে কবে?"

উমা কহিল,—"বাঃ, এখানে এসেছি আজ ঠিক সাত দিন হ'ল। বাবা-মাও এসেছেন। বাবা দু'মাসের ছুটি নিয়েছেন যে। আমি যে বেথুন-ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।"

প্রদীপ উমারই বিস্ময়ের প্রতিধ্বনি করিল: "বাঃ, এত খবর—আমি ত' কিছুই জানতে পাইনি।"

—"কি করে পাবেন? আমাদের খবর পাবার জন্যে ত' আপনার আর মাথা ধরে নি! ল্যাঙ্কাশায়ারে ক'টা কাপড়ের মিল বন্ধ হ'ল এ-সব বড়-বড় খবর রাখতেই আপনাদের সময় যায় ফুরিয়ে, না? আমরা বাচলাম কি মরুলাম—তাতে আপনার বয়ে গেল।"

উমার কথার সুরে স্নিগ্ধ অভিমান ঝরিয়া পড়িল। সে যে মনে মনে কখন এমন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে, প্রদীপ তাহা ভাবিয়া পাইল। কণ্ঠস্বর কোমলতর করিয়া কহিল,—"আমি যে এখানে ছিলাম বহুদিন। গিয়েছিলাম বহু দূরে—পাঞ্জাবে। জরুরি কাজ ছিল।"

একটি অস্ফুট ভঙ্গি করিয়া উমা কহিল,—"সবই ত' আপনার জরুরি কাজ। কিন্তু যাবার আগে আমাদের আপনার ঠিকানাটা লিখে পাঠালে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবের ট্রেন মিস করতেন না। তা', আমাদের সঙ্গে আপনার আর সম্পর্ক কি বলুন। দাদার সঙ্গে সব ছাই হয়ে গেছে।"

রাস্তায় দাঁড়াইয়া এই সব কথার কি উত্তর দিবে, প্রদীপের ভাষায় কিছুতেই কুলাইয়া উঠিল না। এই মেয়েটির কথায় তাহার চিত্ত যেন ভরিয়া উঠিল। এই পৃথিবীর পারে কেহ তাহার জন্য একটি সশঙ্ক স্নেহ নিভৃতে লালন করিতেছে, ভাবিতে তাহার মন ভিজিয়া গেল। বলিল,-"আমার ঠিকানার হঠাৎ এত দরকার হল?"

—"না, দরকার আর কি! অজানা মানুষ, কলকাতায় এলাম— তেমন কোনো বন্ধু-আত্মীয়ও আর নেই যে, দু-চারটে উপদেশ দেবে। দাদা থাকলে বরং—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই উমা প্রদীপের মুখের দিকে তাকাইল এবং চোখোচাখি হইতেই সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সেই স্বল্প সঙ্কেতময় হাসিটিতে প্রদীপের মর্মবেদনা নিমেষে মুছিয়া দিয়া উমা কহিল,—"দাদার পুরোনো ডায়রিতে আপনার মেস্-এর একটা ঠিকানা পেয়েছিলাম। সেখানে বার তিনেক লোক পাঠিয়েছি; প্রথম বার বল্লে, বাবু ঘুমুচ্ছেন; দ্বিতীয় বার বল্লে, বাবু বাড়ি নেই; তৃতীয় বার বলে, ও বাড়ীর কেউ বাবুকে চেনেই না।" বলিয়া উমা একটু নুইয়া পড়িয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রদীপ কহিল,—চতুর্থ বার লোক পাঠালে খবর পেতে, বাবু মাথা। ন্যাড়া করে বেলতলায় গেছেন হাওয়া খেতে। কিন্তু তোমাদের বাড়িটা কোথায়?

আঙুল দিয়া দেখাইয়া উমা কহিল,—"ঐ গলিতে। বিয়াল্লিশ নম্বর। যাবেন? গরিবদের ঘরে পায়ের ধূলো দিতে বাধা নেই ত'?"

—"তুমি কী যে বল, উমা!" বলিয়া প্রদীপ উমার হাত ধরিয়া রাস্তাটুকু পার হইয়া গলির মধ্যে আসিয়া পড়িল।

গলিতে পা দিতেই প্রদীপের কেন জানি মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে। কণ্টকসঙ্কুল রুক্ষ পথ-প্রান্তে কেহ তাহার জন্য একটি আশ্রয়-নীড় নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া, বিধাতাকে তাহার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল বোধ হয়। আকাশ-বিস্তীর্ণ মহাশূন্যতায় তাহার উডডান দুই পাখা আবার ক্ষণতরে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে।

এই মেয়েটি তাহার ছোট দুইটি করতলে এ কী সান্ত্বনা লইয়া আসিয়াছে! নয়, নয়—তাহার জন্য স্নেহ নয়, সেবা নয়—সুধার আস্বাদ সে এই জীবনে নাই বা লাভ করিল! তবু একবার সে এই তিমিরময়ী রাত্রির পার খুজিবে—এই নিরানন্দ পথরেখা কোথায় আসিয়া আবার সুখস্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার সন্ধান না লইলে চলিবে কেন?

বত্রিশ, তেত্রিশ—বাড়িটার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে আর কি! উমার ডাকে সে আরেকটি দুঃখিনী নারীর অনুচ্চারিত অনুনয় শুনিয়া থাকিবে হয় ত'। আরেকটু অগ্রসর হইলেই

নমিতার দেখা পাইবে ভাবিতেই প্রদীপের মন বাজিয়া উঠিল। আশ্চর্য, এত দিন নমিতার কথা তাহার একটুও মনে হয় নাই। সে এত দিন এত সব ভয়ঙ্কর সমস্যায় জর্জরিত হইয়া ছিল যে, তাহার কাছে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সামান্য দুঃখ-দুর্দশা সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের চেয়েও হীন ছিল। কিন্তু এখন নিবিষ্টমনে নমিতার নিরাভরণ ব্যথা-মলিন মূর্তির কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার ধ্যানের ভারতবর্ষ ত' এমনই। এমনিই বিগতগগীরব, হৃতসর্বস্ব। শুধু অতীতের একটি ক্ষীণায়মান স্মৃতির সুধা সেচন করিয়া নিজের বর্তমান বিকৃত জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। নমিতার মত তাহারো কোনো ভবিষ্যৎ নাই। এমনি মূক, এমনি প্রতিবাদহীন।

বাড়ির দরজা পর্যন্ত আগাইয়া আসিল, কিন্তু নমিতার বিষয়ে উমাকে একটা প্রশ্নও করা হইল না। সে কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছে না জানি। প্রশ্ন করা হইল না বটে, কিন্তু উমার পদানুসরণ করিয়া উপরে আসিয়াই তাহার চক্ষু সন্ধিৎসু হইয়া উঠিল। একটা তক্তপোষের উপর বসিয়া অরুণা একটি যুবকের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন; প্রদীপ আসিয়া প্রণাম করিলে তিনি পা দুইটাকে একটু সরাইয়া লইলেন মাত্র, কুশলজিজ্ঞাসা বা আনন্দজ্ঞাপনের সাধারণ সাংসারিক রীতিটুকু পর্যন্ত পালন করিলেন না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইহার বিসদৃশতাটা প্রথমে প্রদীপের চোখে পড়িল না; সে আপনার খুসিতে বলিয়া চলিল : "দেখা আবার হ'তেই হবে। হয় ত' এতক্ষণে কোনো অতিথিশালায় গিয়ে পচতে হত, কিন্তু দিব্যি উমার সঙ্গে মা'র কাছে চলে এলাম। আমাকে আর পায় কে?"

এই কথাগুলির সস্নেহ প্রতিধ্বনি মিলিল না। অরুণা একটু দুরে বসিয়া কহিলেন, "তোমার এ বাড়িতে আসাটা উনি পছন্দ করেন না।"

উমা প্রখর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কারণ?"

মেয়ের মুখের এই প্রশ্ন শুনিবার জন্য অরুণা প্রস্তুত ছিলেন না। উমাই যে প্রদীপকে ডাকিয়া আনিয়াছে, এবং তাহাকে হঠাৎ বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলাটা যে উমার পক্ষেই অপমানকর, তাহা অরুণাকে তখন কে বুঝাইয়া দিবে? তাই তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন, – "কারণ আবার কি? সত্যি প্রদীপ, তুমি না এলেই উনি খুসি। হবেন।"

প্রদীপ বিস্ময়ে মূক, পাথর হইয়া গেল। মুহূর্তে ব্যাপারটা কি হইয়া গেল সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে একবার উমার মুখের দিকে তাকাইল। সে মুখ কালো, লজ্জায় বিধুর। কোথায় যে একটা কদর্যতা রহিয়াছে, প্রদীপ ধরিতে পারিল না। তবু কহিল,—"কোথাও বসে থাকবার সময় আমাদের এমনিই কম, তবু চেনা লোকের মুখ দেখতে পেলে তাদের পাশে একটুখানি না জিরিয়ে যেতে পারি না, মা! আমরাও না। একজনকে ত' চিরদিনের জন্যেই হারিয়েছি, কিন্তু নমিতাকে দেখতে পাচ্ছিনে ত'। তাকে একবার ডাকবে, উমা?"

অরুণার দৃষ্টি কুটিল হইয়া উঠিল; কথা শুনিয়া তিনি এমন সবেগে ‘সরিয়া বসিলেন যে, যেন শারীরিক গ্লানি বোধ করিতেছেন। দৃশ্যটা উমা ও প্রদীপ দুই জনেরই চোখে পড়িল। কিন্তু এই আচরণের একটা বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা বাহির করিবার আগেই অরুণা কহিলেন, —“তার খোঁজে দরকার কি? সে বাপের বাড়ি আছে।”

কটুকণ্ঠস্বরে প্রদীপ সামান্য বিচলিত হইল। তবু সহজ স্বরে স্মিতমুখে কহিল,—“ভালই হ’ল। তার বাপের বাড়ি শুনেছিলাম কলকাতায়ই। ঠিকানাটা ভুলে গেছি। ঠিকানাটা বলুন না, একবার না-হয় দেখা করে রাখি। কখন আবার কোথায় যাই ঠিক নেই।”

প্রদীপের এতটা অবিনয় অরুণার সহ হইল না। তিনি একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—“তার ঠিকানা নিয়ে তোমার কি এমন স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে শুনি?”

—“আমার না ঘটলে দেশের কিছুটা ঘটতে পারে হয় ত’। নমিতার হাতে এখন আর কী কাজ থাকতে পারে? জীবনে তার যা পরম ক্ষতি ঘটেছে তাকে পরের সেবায় পুষিয়ে নিতে না পারলে নিজের কাছে লজ্জার যে তার সীমা থাকবে না।”

—“তুমি যে চমৎকার বক্তা হয়েছ দেখছি। নমিতার কি করা উচিত না উচিত তার জন্যে তার অভিভাবক আছে। তোমার মাথা না ঘামালে কোনো ক্ষতি নেই।”

প্রদীপ তবু হাসিল বটে, কিন্তু গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল : শাস্ত্রবিহিত অভিভাবকের চেয়ে নিজের বিবেকের শাসনই প্রবল হয়ে ওঠে, মা। বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মই এই। নমিতার কি করা উচিত না উচিত সে-পরামর্শ তার সঙ্গেই করা ভালো।”

অরুণার মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল; কহিলেন,—“তুমি বলতে চাও স্বামীর ধ্যান ছেড়ে তোমাদের এই তুচ্ছ দেশসেবায় তাকে তুমি প্ররোচিত করবে?”

–“আমার সাধ্য কি মা? নিজে না জাগলে কেউ কাউকে ঠেলে জাগাতে পারে না। যদি নমিতা একদিন বোঝে তার এই স্বামীধ্যানটাই তুচ্ছ, তা হলে সেটা দেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্যসূচনা। কেন না দেশের সেবায়ই সে বেশি মর্যাদা পাবে। মরা লোককে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমরা আমাদের মনগুলিকে মিউজিয়মে রূপান্তরিত করি নি। যাক্, ঠিকানাটা দিন, সত্যিই আমারো বেশি সময় নেই।”

অরুণা কহিলেন,—“তোমাকে তার ঠিকানা দিতে পার্লাম না।”

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া গেল। বলিল,—“কারণটা জানতে পারি?”

—“নিশ্চয়। কারণ, আমরা চাই না বাইরের লোক এসে আমাদের ঘরের বউর সঙ্গে বাজে আলাপ করে।”

সমস্ত কুয়াসা এতক্ষণে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। প্রদীপের নিশ্বাস হালকা হইয়া আসিল। যেন সে একটা গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কা হইতে এতক্ষণে মুক্তি পাইয়াছে। একটু হাসিয়া কহিল,—"আপনার বিধান আমি মেনে নিলাম, মা। ঠিকানা আমি তার চাইনে। যদি সত্যিই তার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা আন্তরিক হয়ে ওঠে, তবে একদিন দেখা তার পাবই—এ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। আগে ভাবতাম, নমিতা আমার বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি আমারো দায়িত্ব আছে। এখন সে-সম্পর্ক থেকে মুক্তি দিলেন বলে ভালোই হ'ল। এখন যদি নমিতার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয়, সে আর আমার বন্ধুর স্ত্রী নয়, মা, খালি বন্ধু। চাইনে ঠিকানা।" বলিয়া প্রদীপ দ্রুতপদে সিড়ি দিয়া সোজা নামিয়া আসিল।

হঠাৎ সিড়িতে উমার ব্যগ্র কলকণ্ঠ শোনা গেল : "দাঁড়ান দাঁড়ান। দীপ-দা। বউদির ঠিকানা নাই বা পেলেন, নিজের ঠিকানা না দিয়ে পালাচ্ছেন যে।"

দরজার গোড়ায় প্রদীপ

দরজার গোড়ায় প্রদীপকে উমা ধরিয়া ফেলিল। কহিল,—“আপনার সঙ্গে দেখা হবার ইচ্ছাটা আমার একান্ত আন্তরিক ছিল বলেই ত’ আজ বাস-এ আমাদের দেখা হয়ে গেল। কিন্তু সেই দেখা অসম্পূর্ণ রাখতে হবে এমন দুর্ঘটনা অবশ্যি এখনো ঘটেনি।”

প্রদীপ আশ্চর্য হইয়া উমার মুখের পানে তাকাইল। দুইটি উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু বুদ্ধিতে দীপ্তি পাইতেছে, ছোট সঙ্কীর্ণ ললাটটিতে প্রতিভার স্থির একটি আভা বিরাজমান। কৃশ দেহটি ঘিরিয়া স্নানাভ যৌবনের যে একটি লালিত্য লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মুহূর্তের জন্য প্রদীপের ক্লান্ত মন ও চক্ষু আবিষ্ট করিয়া তুলিল। উমার এই ছুটিয়া ডাকিতে আসাটির মধ্যে কোথায় যে একটি সযত্নসমৃদ্ধ সুস্নিগ্ধ স্নেহের স্বাদ আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে গিয়া এই মেয়েটির প্রতি প্রদীপের মায়ার আর শেষ রহিল না। কিন্তু কি বলিবে তাহাই ভাবিয়া লইবার জন্য প্রদীপ এক পলক অপলক চোখে উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমা কহিল,—“এখুনি পালাতে চাইলেই আমি ছাড়ব আর কি। আপনার সঙ্গে আমার কত যে কথা আছে, তা এতদিন ভেবে ভেবে আমি শেষ করতে পারিনি। দাঁড়ান, সব আমাকে ভেবে নিতে দিন।”

প্রদীপ ম্লান হাসিয়া কহিল,—“সময় নেই, উমা। তা ছাড়া আমার সঙ্গে মিশতে দেখলে মা খুসি হবেন না।”

উমা নির্ভীক কণ্ঠে কহিল,—“আপাতত নিজে খুসি হলেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে খন। বেশ ত, এ বাড়িতে ডেকে এনে আপনাকে যদি অপমানিত করে থাকি, দাঁড়ান, আমি আপনার মেস্-এ যাব। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রকাণ্ড ইতিহাস শেষ করা যাবে না।”

—“তুমি পাগলের মতো কী বকতে সুরু করলে?”

—“বকূলেই পাগল হয় না এবং ঢের পাগল আছে যারা মোটেই বকে না। আমি বছিও না, পাগলও হইনি। দেখবার ইচ্ছাটা আন্তরিক হলে দৈবাৎ এক আধবার মাত্র দেখা হতে পারে, কিন্তু দেখাটা যখন আবশ্যকীয় হয় তখন ইচ্ছাটা খালি আন্তরিক হলেই চলে না, দস্তুরমত ঠিকানা জানা দরকার। আপনার ঠিকানা যদি না দেন, তবে বলব মা’র থেকে বৌদির ঠিকানা না পেয়ে আপনি ছোট ছেলের মত অভিমান করেছেন। পুরুষ-মানুষের রাগ আমি সইতে পারি, কিন্তু ছিচকাদুনের মত অভিমান আপনাদের মানায় না কক্ষনো।”

প্রদীপ আবার ভালো করিয়া উমাকে না দেখিয়া পারিল না। উহার সাদাসিধে শাড়িখানা যেন নিমেষে তাহার অজস্র স্নেহে মাখিয়া উঠিল, উহার দুই চোখে যেন অদেখা আকাশের

ছায়া পড়িয়াছে! কিন্তু নারীর রূপকে সে ধ্যানী বা কবির চোখেই দেখিতে শিখিয়াছে, তাই এই দৃপ্ত সাহসিকাকে ভারতোদ্ধারবাহিনীর অগ্রবর্তিনী করা যায় কি না, তাহাই ভাবিয়া তাহার আশা ও আনন্দ একসঙ্গে উথলিয়া উঠিল। কহিল,—"কিন্তু আমাকে নিয়ে তোমার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? ভবিষ্যৎ বলে আমার যেমন কিছু নেই, তেমন আমার। ঠিকানাও আমি নিজেই খুঁজে পাই না। স্থায়িত্ব জিনিসটা আমার ধাতে সয় না। আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, স্নেহ, জীবন-মরণ সব কিছু স্বল্পায়ু বলেই আমরা কাজ করতে এত বল পাই এবং তাড়াতড়ি করে ফেলবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি।"

উমার দুইটি চোখের কোলে তরল হাসি টলটল করিয়া উঠিল। কহিল,—"আমি দার্শনিকতা বুঝি না। সোজা স্পষ্ট কথা বলতে পারলে বেঁচে যাই। অবশ্যি আপনার দেশসেবায় আমি ব্রতধারিণী হ'তে পাবে না, সে আমার বোকা মুখ ও বেচারা চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন, কিন্তু দেশসেবা ছাড়া জীবনে আর বড় কাজ নেই এ-কথা আপনি বুদ্ধিমান হলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না। তেমন কোনো কাজে আপনাকে দরকার হলে কোথায় আমি কড়া নাড়ব?"

প্রদীপ কহিল,—"তোমাকে ঠিকানা দিতে পারলে আমিই বেশি খুসি হতাম, উমা, কেননা কড়া-নাড়ার প্রতীক্ষা করে বসে থাকৃতে আমার হয় ত' ভালই লাগত। কিন্তু আজ এখানে আছি, কালকেই হয় ত' লাহোর, দু'দিন পরেই কে জানে ফের রেঙ্গুন পাড়ি মারতে হবে। এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকলে খালি মনে হয় বৃথা আয়ুক্ষয় করছি। অন্তত চছি—এটুকু চেতনা না থাকলে মরতে আর আমার বাকি থাকে না।"

-"হেঁয়ালি রাখুন দিকি—বড়ো বড় কথা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বলবেন। ঠিকানা না থাকে, এমন একটা জায়গার নাম করুন যেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে দু' দণ্ড আপনার সঙ্গে বসে কথা কইলে সমাজ বা আইনের চোখে দণ্ডনীয় হবে না। মা বোধ হয় আসছেন নেমে, বলুন, শিগগির করে।"

প্রদীপ ফটু করিয়া বলিয়া বসিল: "১৬, শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইন। ওটা একটা মে। তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, চিঠি লিখো, কেমন?"

উমা হাসিয়া কহিল,-"কলমের চেয়ে পা চালাতে আমি বেশি ভালোবাসি। কিন্তু বৌদিদির ঠিকানা আপনি সত্যিই চান? তার সঙ্গে দেখা করবেন?"

কাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া প্রদীপ নিদারুণ বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, অরুণা সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়াছেন। চলিয়া যাইবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল,—"দরকার নেই। ঠিকানা নিয়ে সে-বাড়িতে গেলেও যে ফিরে যেতে হবে না তার ভরসা কি? তবে নমিতার ইচ্ছা যদি কোনোদিন সত্যিই আন্তরিক হয়ে উঠে,আকাশের কোটি গ্রহ-নক্ষত্র ষড়যন্ত্র কলেও

আমাদের দেখা হওয়াকে কিছুতেই খণ্ডাতে পাবে না কেউ।” বলিয়া বাহিরের জনাকীর্ণ রাজপথে প্রদীপ মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মা’র দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হইয়া উমা উপরে উঠিয়া আসিল। মা-ও পুনরায় ঘরে আসিলেন। তারপরে এমন একটা তুমুল গোলমাল সুরু হইল যাহাতে শচীপ্রসাদও, প্রদীপের প্রতি যতই কেন না অপ্রসন্ন থা, সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিল না। তক্তপোষের এক ধারে শচীপ্রসাদ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এখন তাহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া মেয়ের এই নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে অরুণা বিচার-প্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। শচীপ্রসাদ সম্প্রতি পরোক্ষে উমার উমেদারি করিতেছিল বলিয়া, তাহার বিপক্ষে কিছু বলিতে তাহার মন উঠিতেছিল না, তাই তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল প্রদীপের উপর। খুব জ্ঞানীর মত মুখ করিয়া শচীপ্রসাদ বলিল,-“ও-সব undesirableদের বাড়িতে ঢুকতে দেয়াই উচিত নয়। সুধী যদি বেঁচে থাকৃত, তার বন্ধু তার একটা মানে ছিল, কিন্তু এখন তার পক্ষে এ-বাড়িতে ঢোকা অনধিকার প্রবেশ ছাড়া আর কি বলব।”

উমা মা’র অন্যায় তিরস্কার শুনিয়াই বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই অযাচিত সমালোচনায় সে আর সংযম রাখিতে পারিল না। উদ্দীপ্তকণ্ঠে কহিল,—“আর কিছু বলবেন কি করে? আপনাদের কি চোখ আছে না চোখের স্বচ্ছতা আছে? উনি নিজে যেচে এখানে আসেন নি, আমিই ওঁকে ডেকে এনেছিলাম। তা ছাড়া দাদা মারা গেছেন বলেই ওঁকেও আমরা ভূত বানিয়ে ফেল্‌ব আমাদের এ অকৃতজ্ঞতা বিধাতা ক্ষমা করবেন না। উনি আমাদের সংসারে অবাঞ্ছনীয় হলেন, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। ওঁর সংস্পর্শে এলে একটা নূতন জগতের আবিষ্কারের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পেতেন নিশ্চয়।”

শচীপ্রসাদ ভাবিল, উমাকে অযথা চটাইয়া দিয়া সে ঠকিয়া গিয়াছে; কিন্তু কি করিয়া নিক্ষিপ্ত তীর ফিরাইয়া আনা যায়, তাহারই একটা দিশা খুঁজিতেছিল এমন সময় অরুণাই তাহাকে রক্ষা করিলেন। কহিলেন,–“কিন্তু অমন গুণ্ডাকে রাস্তা থেকে ধরে আনবারই বা এমন কি দায় পড়েছিল?”

—“দায় পড়ত যদি আমার বা তোমার প্রাণান্তকর অসুখ হ’ত— তখন রাত জেগে গা-গতর ঢেলে সেবা করবার দরকার পড়ত যে। যদ্দিন তিনি দাদার সেবা করেছেন, ততদিন তিনি মহাপুরুষ, সাধু; আর আজ তিনি তার দেশের সেবা করছেন বলেই গুণ্ডা। আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে যে তার সঙ্ঘর্ষ বেধেছে।”

শচীপ্রসাদ টিপ্পনি কাটিল: “দেশ কথাটা বানান করা নেহাৎ সোজা বলে সবাই তা নিয়ে ফেঁপরদালালি করে।”

উমা কহিল,—“দেশ বানান্ করা সোজা বটে, কিন্তু বানানো সোজা নয়। সেটা দয়া করে মনে রাখবেন।”

রূঢ় কথা শচীপ্রসাদও কহিতে জানে, কিন্তু কথায়-কথায় কোথায় আসিয়া পৌঁছিবে তাহার ঠিকানা কি! তাহার চেয়ে চুপ করিয়া সিল্কের রুমাল দিয়া ঘাড়টা বার পনেরো রগড়াইলে বরং কাজ দিবে।

কথা কহিলেন অরুণা : "কিন্তু এমন বেহেড় বকাটের সঙ্গে তোর আবার অত ঘটা করে সম্পর্ক রাখতে যাওয়া কেন? আমি ভাবছি আসচে হপ্তারই তোকে হষ্টেলে ভর্তি করে দেব।"

উমা চুলগুলি লইয়া টানা-হেঁচড়া করিতেছিল; কহিল,—"তার মানে আমাকে প্রদীপদা-র প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চাও। হষ্টেলে ত' আমি যাবই, তা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবারই বা কি দরকার? কিন্তু হষ্টেলে গিয়ে সত্যিই যদি আমাকে দীপদা-র সাহচর্য থেকে সরে থাকতে হয়, তা হলে সেটা আমার সীতার বনবাসের চেয়েও অসহনীয় হবে।"

এই প্রগল্‌ভ দুর্বিনীত মেয়েটাকে প্রহার করিতে পারিলেই বুঝি অরুণা সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু তাহাতে বাধা ছিল। তাই কণ্ঠে বিষ ঢালিয়া তিনি কহিলেন,—"তুই আর ওর চরিত্রের কী জানিস? পরের বাড়ির বৌর ওপর কেন ওর এত দরদ, তা তুই বুঝবি কি করে?

না বুঝিলেও উমাকে বুঝাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত অরুণার স্বস্তি ছিল। শচীপ্রসাদ এ-বাড়িতে সম্পূর্ণ আগন্তুক নয়, অরুণার দিক হইতে তাহার সঙ্গে একটা সম্পর্কের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না। তাই তাহার সামনে প্রদীপের নিন্দাটা শিষ্টাচারের বহির্ভূত হইবে না ভাবিয়াই, অরুণা তাহাকেই সম্বোধন করিলেন :

—"ভেবেছিলাম সুধী-র বন্ধু, ভদ্রলোক, লেখাপড়া শিখেছে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে এমন খারাপ, তা মোটেই আন্দাজ করতে পারিনি, শচী। মরা-বন্ধুর প্রতি এতটুকু যার শ্রদ্ধা নেই, তাকে পুলিশেই ঠিক সম্মান দেখাতে পারবে।"

এইটুকু ভূমিকা করিয়া অরুণ। সবিস্তারে নমিতার সঙ্গে প্রদীপের নীতিবিরুদ্ধ সন্নিধ্যের একটা বিশ্রী বর্ণনা দিয়া ফেলিলেন। পাছে পুত্রবধুর কল্পিত বিশ্বাসঘাতকতায় স্বর্গগত পুত্রের আঘাত লাগে, সেই ভয়ে স্নেহময়ী অরুণা সমস্ত কলঙ্ক প্রদীপের মুখেই মাখাইয়া দিলেন। অবনীবাবুর কাছে প্রদীপ-নমিতা-সংস্পর্শের যেটুকু বিবরণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে সুবিধামত একটু বর্ণচ্ছটা না মিশাইলে চলিত না, তাই সহসা উমার সম্মুখে প্রদীপ একেবারে কালো ও কলুষিত হইয়া উঠিল। অরুণা ফোড়ন দিলেন : "দেশের নাম করে যেদিন থেকে গুণ্ডামি শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই ওর প্রতি আমি আস্থা হারিয়েছি।"

শচীপ্রসাদও রসনাকে নিরস্ত করিতে পারিল না : "চেহারা থেকেই যারা মনস্তত্ব আবিষ্কার করেন, সে-সব লোকের কথায় বিশ্বাস। আমার ঘোল আনা। ওঁর চেহারা দেখেই আমার

মনে হয়েছিল, লোকটা ভালো নয়। এর পর এ-সব পাড়ায় পা দিলে ওঁকে রীতিমত অসুবিধায় পড়তে হবে।”

উমার মুখ পাংশু হইয়া, গলা শুকাইয়া, নিমেষে যে কেমন করিয়া উঠিল বুঝা গেল না। না পারিল তীব্র প্রতিবাদ করিতে, না বা পারিল অভিযোটা আয়ত্ত করিতে। প্রদীপ উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া হইতে নামিয়া আসিয়া একান্ত অকিঞ্চিৎকর পিপীলিকার সমান হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল প্রদীপকে ডাকিয়া আনে, সে নিমেষে এই সব অতি-মুখর নির্লজ্জ কটুভাষণের বিরুদ্ধে তাহার অগ্নিময় ভাষার বাণ হানিয়া এই দুই আততায়ীকে অভিভূত করিয়া ফেলুক।

আর কিছুই না বলিয়া উমা নিজের ঘরে অসিয়া, একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাক, এই সব ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামাইলেও তাহার চলিবে। সে এখানে পড়িতে আসিয়াছে, মন দিয়া পড়িয়া পরীক্ষা-সমুদ্রগুলি পার হইতে পারিলেই তাহার ছুটি মিলিবে। পরে কি হইবে এখন হইতে ভাবিয়া রাখার মত মূখতা আর কি আছে? তাহার মত অবস্থার মেয়ে দেশের জন্য কতটুকু কাজ করিতে পারে, সে বিষয়ে প্রদীপদা’র সঙ্গে খোলাখুলি একটা পরামর্শ করিতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু আপাতত তাহা স্থগিত রাখাই সমীচীন হইবে। কাজের জন্য প্রথমত খানিকটা যোগ্য ত’ দরকার, মনকে সেই আশ্বাস দিয়া সে সেলফ, হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।

এমন সময় শচীপ্রসাদ ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে ফের উদ্বস্ত করিয়া তুলিল। শচীপ্রসাদের বয়স বাইশ, চেহারা দোহারা, পরনের জামা-কাপড়গুলি অত্যুগ্ররূপে পরিচ্ছন্ন। কামানো দাড়ি-গোঁফ, ব্যাক্-ব্রাশড় চুল,-মুখে একটা মেয়েলি-ভাবের কৃত্রিম কমনীয়তা আছে। কলেজের ছাত্র হিসাবে খুবই ভালো, এই বৎসর সসম্মানে বি, এ পাশ করিয়াছে, —বোধ হয় শীঘ্রই বিলাত যাইবে আই-সি-এস্ হইবার জন্য। উহার বাবার ইচ্ছা, শচীপ্রসাদ বিলাত যাইবার আগে এখানেই পাণিগ্রহণটা সারিয়া লয়; পিতার ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া শচীও তাই ঘন-ঘন এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করিতেছে। অবনীবাবু অস্পষ্ট করিয়া মত দিয়াছেন বটে, কিন্তু উমার আগে এক মেয়ে নিজের অনিচ্ছায় বিয়ে করিয়া, স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য মারা গিয়াছিল বলিয়া চট করিয়া মত দিয়া ফেলিতে অরুণা ইতস্তত করিতেছিলেন। মেয়েকে খোলাখুলি কিছু প্রশ্ন না করিয়া বিবাহের যোগাড়যন্ত্র করিবারও কোনো অর্থ নাই, কেননা, দেশের হাওয়া বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেয়েও এমন স্বাতন্ত্রসাধিকা হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে বিয়ের নামে নাক সি টকাইয়া একদিন বাহির হইয়া পড়াটা তাহার পক্ষে বিচিত্র নয়। সুতরাং স্বয়ং শচীপ্রসাদকেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ও নির্বিঘ্ন অবকাশের সুবিধা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা স্বামী-স্ত্রী নেপথ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।

খবরটা উমার কানে যাইবে না, উমা তেমন নিরীহ ছিল না, কিন্তু সে বোধ করি বুঝিত যে বিবাহের প্রস্তাবের মধ্য দিয়া প্রেমের শুভাবির্ভাবের সূচনা হয় না। শচীপ্রসাদ তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিত ভীরু ভক্তের মত নয়, অনেকটা কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রভুর মত। অর্থাৎ উমার চিত্ত জয় করিবার জন্য প্রেম দিয়া নিজের চিত্ত-প্রসাধন করিবার প্রয়োজন সে বুঝিত না।

জোয়ারের জলের মত উমার যৌবন উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। উমার বাবা-মা যখন সঙ্কেত করিয়াছেন, তখন কোনো ব্যতিক্রমের জন্য তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে

ভাবিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত ছিল। নতুবা, তাহার রোমান্টিক বা কল্পনাপ্রবণ হইবার বয়স ত' ইহাই। হাত বাড়াইয়াই যখন উমাকে আয়ত্ত করা যায়, তখন তাহাকে আকাশচারিণী শশীলেখার সঙ্গে তুলনা

বামন হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিবার কোনো মানে হয় না। উমা সুন্দর, শোভনাঙ্গী; তাহা ছাড়া অবনী বাবুর সম্পত্তি উমার আঙুলের ফাঁক দিয়া নিশ্চয়ই তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে। অতএব শচীপ্রসাদ যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে অযথা কালবিলম্ব করিলে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কাছে সে হাস্যাস্পদ হইবে।

অথচ, শচীপ্রসাদের এই সকল অধিকার খাটানোর জন্যই তাহার প্রতি উমা প্রসন্ন হইতে পারে নাই। এমন নিলিপ্তের মত আত্মনিবেদনের লজ্জা হয় ত' তাহাকে সঙ্গোপনে আহত করিত। সে এমন করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে মুছিয়া ফেলিতে চাহে না। নিশীথ রাত্রি ভরিয়া কাহাকে ভাবিয়া আকাশের তারাগুলির দিকে তাহার চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে; কেহ আসিবে, এই অসম্ভব একটি বিশ্বাস লালন করিয়া সে তাহার অনতি-উদঘাটিত যৌবনকে পূজার দীপশিখার মত আগ্রহ-কম্প উন্মুখ করিয়া রাখিবে, সে না আসিলে তাহার পড়ায় মন বসিবে না, চুল বাঁধিতে বাধিতে জন-যান-মুখর রাজপথের পানে চাহিয়া, সে সানন্দে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে। জীবনের এমন কতগুলি মুহূর্ত বাঁচিয়া সে এত অনায়াসে ফুরাইয়া যাইতে চাহে না। শচীপ্রসাদ যদি তাহার ঘরে নিঃশব্দ পদপাতে একটি ভয়-ভঙ্গুর অনুচ্চারিত প্রার্থনা লইয়া প্রবেশ করিত, তাহা হইলে উমার সর্ব্বদেহমন রোমাঞ্চময় হইয়া উঠিত কি না কে জানে!

শচীপ্রসাদ হাসিয়া বলিল,-"চল বায়স্কোপে যাই, পর্দায় আবার তোমার সেই লরা লা প্লতে দেখা দিয়েছেন।"

বই হইতে উমা মুখ তুলিল না; কহিল,—"ফিল্ম দেখে পয়সা খরচ করাকে আর ক্ষমা করতে পারুব না। বরং বিকেলে বেরিয়ে আমার জন্যে যদি একটা কাজ করতে পারেন, ত' ভালো হয়।"

শচীপ্রসাদ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল,—"কি?"

দুইটি স্থির জিজ্ঞাসু চোখ মেলিয়া উমা বলিল,—"শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইটা কোথায় জানেন?"

—“না; কেন?”

—“তবে দয়া করে একটু খোঁজ নিয়ে আসবেন, ওখানে যেতে হলে বাস থেকে কোথায় নামূলে সুবিধে।”

শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনে নিশ্চয়ই উমার কোনো সহপাঠিনী আছে বিশ্বাস করিয়া শচীপ্রসাদ একটু প্রফুল্লই হইয়া উঠিল হয় ত’। উমার পরিচয়ের সূত্রে আরেকটি মেয়ের কাছে আসিতে পারিলে যে ভালোই হয়, সে-দুর্বলতা শচীপ্রসাদের বয়সের ছেলের পক্ষে অমার্জনীয় নয়। এবং সেই অনামা মেয়েটির সান্নিধ্যে যে শচীপ্রসাদ স্বাভাবিক সঙ্কোচে তাহার সমস্ত আচরণটিকে সুমধুর করিয়া তুলিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি! তাই সেই গলিটার অবস্থান ও আয়তন-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে আমৃতা-আমৃত করিয়া কহিল,—“কারো সঙ্গে দেখা করূতে যাবে? বেশ ত, চল না, দু’জন বেরিয়ে পড়ি। কাছা কাছি কোথাও হবে হয় ত’। কলকাতার রাস্তা খুঁজে বেড়াতে আমার ভালোই লাগে। বেশ একটু বেড়ানোও হবে খন।”

বইয়ের পৃষ্ঠায় ফের চোখ নামাইয়া উমা বলিল,-“না, সেখানে আমাকে একলাই যেতে হবে। আপনি দয়া করে একটু জেনে এলেই চলবে।”

শচীপ্রসাদ ভাবিত হইল। এইবার তাহার স্বরে আর বিনয়স্নিগ্ধ কুণ্ঠা রহিল না। আরেকটু সরিয়া আসিয়। সে জিজ্ঞাসা করিল, “সেখানে কে আছে শুনতে পাই?”

উমা টলিল না, কহিল,—“সব কথাই কি সব্বাইকে বলতে হয়?”

—“অন্তত আমাকে তোমার বলা দরকার।”

—“এমন অনেক কথা আছে, যা নিজেকে পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলা যায় না।”

রুক্ষস্বরে শচীপ্রসাদ বলিয়া উঠিল,—“আমাকে না বলে আমার সাহায্য করাটা অসঙ্গত হবে।”

উমা একটু হাসিল; বলিল,—“আপনি সাহায্য করলেও এগোপাল মল্লিকের লেইনটা বাড়ির দরজায় চলে আসত না, হেঁটেই যেতে হত। হাঁটুতে আমি একলাই পারি।”

এই বলিয়া বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতে যাইতেই তাহার নজর পড়িল যে, বইটা একটা রেলওয়ে-সম্পর্কিত আইনের ইস্তাহার। এতক্ষণ তাহার মনকে শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনের সন্ধানে পাঠাইয়া, সে এত মনোযোগ সহকারে ইহাই পড়িতেছিল নাকি!

তাড়াতাড়ি বইটা রাখিয়া দিয়া, উমা উঠিয়া দাঁড়াইল। শচী প্রসাদের কিছু বলিবার আগেই সে হাসিয়া কহিল,—"আপনার বায়স্কোপের পয়সা বাঁচিয়ে দিলাম। ও পয়সাটা চোখ মেলে কোনো পুয়োর-কাণ্ডে দিয়ে দেবেন।"

শচীপ্রসাদের কণ্ঠে বিষ আছে : "ভিক্ষা দেওয়াকে আমি পাপ মনে করি। তুমি না গেলেই যে বায়স্কোপ পটল তুলবে এমন কথা না ভাবলেই তোমার বুদ্ধি আছে স্বীকার কবুব। আমার পাশে একটা মাড়োয়াড়ি বসলেও ফিল্ম, আমি কম enjoy করব না।"

সেই রাত্রি নমিতার

সেই রাত্রি নমিতার আর কাটিতে চাহে না। একে একে বাড়ির সমস্ত বাতি নিভিয়া গেল, কিন্তু তাহার চোখে কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুম না আসিলে সে দোতলার বারান্দার রেলিঙের কাছে চুপ করিয়া থাকে; কিন্তু আজ যে স্পন্দমান চঞ্চল হৃদয়কে ঘুম পাড়াইয়া সে উদাসীন হইয়া সীমান্যতার ধ্যান করিবে, তাহা অসম্ভব। প্রথমেই মনে পড়িল রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চক্ষু দিয়া কিছুতেই সে আজ অজয়ের নাগাল পাইবে না। এই উপলব্ধি করিতেই নমিতা বারান্দায় দ্রুতপদে পাইচারি শুরু করিয়া দিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাশের বাড়িতে যে-ছাত্রটি রাত জাগিয়া নীরবে পড়া করে, তাহারা টেবিলের মোমবাতিটা নিভিল। সেই ঘনায়মান চতুঃপার্শ্বের নীরবতার মধ্যে নমিতা কি করিবে, কিছুরই কূল খুঁজিয়া পাইল না। খালি নিজের ডান-হাতখানি বারম্বার কপালের উপর রাখিয়া সে অজয়ের জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিতেছে।

নমিতা খোলা চুলগুলি আঁট করিয়া খোপা বাঁধিল; পরণের কাপড়ের প্রান্তটাকে পায়ের দিকে আরো একটু প্রসারিত ও বুকের উপর আরো একটু রাশীকৃত করিয়া লইল। চাবির গোছাটা আঁচলের প্রান্ত হইতে খুলিয়া বালিশের তলায় রাখিল ও উত্তুরে হাওয়া জোরে বহিতেছে বলিয়া মা'র পায়ের দিকের জানালাটাও বন্ধ করিতে ভুলিল না। অন্ধকারে পথ ঠাহর করিতে নমিতার বেগ পাইতে হয় না, অতিনিঃশব্দপদে সে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা নামাইল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চাদ যে অনেকক্ষণই বিবর্ণ বেদনায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা। করিতেছে, তাহা সে জানিত; এখন সহসা সামনের ভাঙা দেয়ালের ফাঁকে হঠাৎ চাদ দেখিতে পাইয়া তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন লাবণ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সিঁড়িতে একবার পা রাখিলে হয় ত' মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতেই নীচে নামিয়া আসিতে হয়। নমিতা শুধু নীচে নামিয়া আসিল না, একেবারে অজয়ের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে আসিয়া অবতীর্ণ হইল।

এক মুহূর্তও দেরি হইল না। তর্ক করিতে চাও, নমিতা তাহাতে কান পাতিবে না। তাহার পক্ষ হইতেও নীতি-কথা বলা যায় বৈ কি। রুগ্ন পরনির্ভরকামীকে সেবা করা অধর্ম্ম? কিন্তু এত লোক থাকিতে তাহারই বা এমন কোন্ গরজ পড়িল? বচসা করিবার সময় নমিতার আর নাই, কাকিমার মেয়েটার চেঁচাইয়া উঠিবার সময় হইয়াছে।

এক ঠেলা মারিয়া নমিতা বন্ধ দরজা খুলিয়া ফেলিল। যাহা দেখিল, তাহাতে প্রথমে সে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে যে কেন অকারণে দেরি করিতেছিল তাহার জন্য সে শতরসনায় নিজেকে ধিকার দিতে লাগিল। দেখিল, সেই শতছিন্ন তোষকটার উপর উবু হইয়া ঝুঁ কিয়া পড়িয়া অজয় গোঙাইতেছে; কবে কি-সব ছাই-ভস্ম গলাধঃকরণ করিয়াছিল, তাহাই বমি করিয়া মেঝেটাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। বমির বেগ এখনো প্রশমিত হয় নাই, অন্ধকারেও অজয়ের রোগবিকৃত বীভৎস মুখের ছায়া চোখে পড়িল। নমিতা

তাড়াতাড়ি অজয়ের পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার মুখটা দুই হাতের অঞ্জলিতে ভরিয়া। একেবারে তাহার কোলের উপর তুলিয়া পাঞ্জাবির তলায় পিঠের উপর অল্প একটুখানি হাত রাখিয়া দেখিল, জ্বরে অজয় দগ্ধ হইতেছে। কপালের সমুখের যে-চুলগুলি লুটাইয়া পড়িতেছে, তাহা মাথার উপর ধীরে তুলিয়া দিয়া, নিজের আঁচল দিয়া অজয়ের শুনো ঠোঁট দুইটা মুছিয়া দিল। মুহূর্তে যে কি হইয়া গেল জ্বরের ঘোরে মোহাচ্ছন্ন অজয় আনুপূর্বিক কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় শুক্লবাসা একটি মেয়েকে তাহার পার্শ্বচারিণীরূপে ভালো করিয়া তখনো চিনিতে না পারলেও, আজ রাত্রেই যে তাহার আসিবার কথা ও এমন করিয়া যে তাহার এই পীড়িত দেহটাকে বুকে টানিয়া নিবার একটা অলৌকিক চুক্তি ছিল, তাহা সে নিমেষে ঠিক করিয়া ফেলল। জড়িতস্বরে সে কহিল,-"শিগগির আমাকে একটু জল এনে দাও, আমার গলা-জিত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যে।"

নমিতা অজয়ের মাথাটা ধীরে ধীরে নামাইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেয়ালের প্রতিটি ইট ও মেঝের প্রতিটি ধূলিকণা যে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে সে বিষয়ে তাহার খেয়াল রহিল না। রান্নাঘরের দরজার শিকল নামাইয়া সে গ্লাসে করিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইল ও বাঁ-হাতে এক বালতি জল লইয়া আবার ঘরে ঢুকিল। বালতিটা দুয়ারের কাছে নামাইয়া তাড়াতাড়ি জলের গ্লাসটা অজয়ের কাছে আনিয়া ধরিল। কহিল,—"আমার হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠন, জলটা খেয়ে নিন।"

এইবার নমিতাকে অজয় ভালো করিয়া চিনিয়াছে। পিপাসা তাহার সত্যই পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তবু পরিপূর্ণ নির্ভর করিয়া নমিতার অকুণ্ঠিত বাম-বাহুটি অবলম্বন করিয়া সে উঠিল। ঢাক্-ঢক্ করিয়া সমস্তটা জল খাইয়া ফেলিয়া সে ধুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। নিজেই নমিতার আঁচলের প্রান্তটা টানিয়া লইয়া মুখ মুছিল। বলিল,-"আজ সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করেও তোমাকে আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। আমার প্রয়োজনের দাবি এত প্রচুর ছিল যে, কোনো প্রাচীরই আর তোমাকে বন্দী রাখতে পাল না, নমিতা। কিন্তু আমার প্রয়োজন যে কি অসামান্য, তা তুমি জান?" বলিয়া অজয় নমিতার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল।

নমিতা হাত সরাইয়া নিবার স্বল্প চেষ্টা করিয়া বলিল,-"ছাড়ুন, ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলি। দেশলাই নেই? আলো জ্বালতে হবে।"

—"না না, আলো জ্বালিয়ে কাজ নেই, নমিতা। আলোতে তোমাকে সম্পূর্ণ করে দেখা হবে না। তোমাকে কি এই বেশ মানায়? আমি মনে মনে তোমার যে মূর্তি এঁকেছি, আলো জ্বেলে তাকে কলঙ্কিত কোরো না।" বার কয়েক ঘনঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অজয় কহিল, —"তোমার পরনে রক্ত-চেলি, চোখে ক্ষুধা, হাতে কৃপাণচুলগুলি পিঠের উপর আলুলিত হয়ে পড়েছে রুক্ষ সুনিবিড় চুল! বজে তোমার কঙ্কণ, বিদ্যুৎ তোমার কণ্ঠহার! তুমি আমার সঙ্গে যাবে, নমিতা?"

নমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল,-"উত্তেজিত হবেন না। চুপ করে' ঘুমুবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার মাথায় জলপটি দিচ্ছি।"

তাড়াতাড়ি পাশে বসিয়া বালতির জলে ন্যাড়ার অভাবে নিজের আঁচলটাই ভিজাইয়া লইল। কপালের উপর তাহাই স্তুপীকৃত করিয়া রাখিয়া, পাখার অভাবে সামনের দেওয়াল হইতে একটা ক্যালেণ্ডার পাড়িয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল। কহিল, "দেশলাই থাকূলে আলোটা জ্বালাতুম।"

অজয় কহিল,—"আলো জ্বালালেই তোমার আজকের রাতের এই কীর্তিটা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। তোমার কাকিমার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে আনতে পারবে?" বলিয়া অজয় সেই জ্বরের মধ্যেই ভূতের মত হাসিয়া উঠিল। নমিতার পা-দুইটি তক্তপোষের উপর যেখানে গুটাইয়া রহিয়াছে, তাহার অদুর ব্যবধানে নিজের একটা শিথিল হাত রাখিয়া আস্তে একটা আঙুল বাড়াইয়া দিয়া নমিতার পা এমন আলগোছে একটু ছুইল যে, তাহা টের পাইবার সাধ্য নাই। কহিল, "উত্তেজিত আমি হইনি, নমিতা। যেটুকু চাঞ্চল্য আজ তুমি আমার দেখছ, সেটা আমার জ্বরের বিকার নয়। ওটা আমার স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র। আমার কথার উত্তর দেবে, নমিতা?"

নমিতাও কপালের গণ্ডী ছাড়াইয়া হাতখানি অজয়ের গালের উপর ভুলক্রমে আনিয়া ফেলিয়াছে। অস্ফুটস্বরে কহিল,—"কি?"

দৃঢ় স্পষ্ট অনুত্তেজিতকণ্ঠে অজিত কহিল,—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

নমিতার স্বর ভীত, বিমূঢ় : "কোথায়?"

আবার সেই শীতল স্পষ্ট স্বর : "মরুতে। মযৃতে তোমার ভয় হয়, নমিতা?"

নমিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল : "কি বলছেন আপনি যা-তা? বলছি ঘুমুন, তা না খালি বক্ বক্ করছেন!"

অজয় শান্ত, উদাস-স্বরে বলিল,-"তুমিও যে মরতে ভয় পাও না, তা আমার ঘরে তোমার এই আকস্মিক আবির্ভাবেই আমি বুঝেছি। তা হলে চল আজকের এই রাত্রি শেষ না হতেই একটা গাড়ি ডেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমি তোমার খুব বেশি ভার হ'ব না, দেখবে। কাল ভোরেই আবার আমি চাঙ্গা হয়ে উঠব। শুয়ে শুয়ে এই সব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়?"

নমিতা আরো জোরে ক্যালেণ্ডারটা চালাইতে লাগিল, অজয়েব গায়ের চাদরটা আরো ঘন করিয়া টানিয়া দিল; বলিল,—"আপনি এমনি বক বক করুলে আমি চলে যাব ঘর ছেড়ে।"

অজয় কহিল,—“সত্যিই গায়ে চাদর টেনে পাখার হাওয়া খেয়ে জ্বরের ঘোরে এপাশ ওপাশ করবার বিলাসিতা আমার নয়, নমিতা। আমি মরবার পণ করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। রোগে ছাতা ধরে’ দেহ জার্ণ হোক, তবু রোগের হাতে জীবন সমর্পণ করে মৃত্যুকে কলঙ্কিত করব না। তুমি যে-জীবন বহন করছ তা ত’ একটা কলঙ্কিত মৃত্যু, অসতীত্বের চেয়েও লজ্জাকর। সত্যি করে মরে গৌরবান্বিত হতে তোমার ইচ্ছা করে না, নমিতা?” কি ভাবিয়া লইবার জন্য অজয় একটু থামিল, পরে হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গা হইতে চাদর সরাইয়া ফেলিল। নমিতার স্তম্ভিত ভাবটা কাটিবার আগেই তক্তপোষের প্রান্তে সরিয়া আসিয়া জুতার জন্য সেই নোংরা মেঝের উপর পা বাড়াইয়া দিল; কহিল,—“তুমি এমনি চুপ করে এখানে বসে থাক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে—এই আনন্দে আমি রাস্তায় বেরিয়ে যে করে থোক একটা গাড়ি ধরে আনতে পারবই

অজয়ের আর জুতা পরিবার সময় হইল না। নমিতা ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পা দুইটা সহসা অবশ হইয়া আসিল বুঝি। দীপ্তকণ্ঠে কহিল,—“আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? কোথায় যাব আপনার সঙ্গে?”

অজয় আবার সেই নির্লিপ্ত উদাসীন কণ্ঠে কহিল,—“পাগল আমরা সত্যিই। হঠকারিতাকে আর যারা নিশে করুক, আমরা করিনে। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে গেলে সময়ই ফুরোয়, কাজ আর এগোয় না। তুমি কি সত্যিই এই অন্ধকূপের অন্তরালে স্বল্প-পরিমিত জীবন নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারবে? নিশান্তে দুটি ভাত খেয়ে ও দিনান্তে দুঘণ্টা ঘুমিয়েই কি তুমি জীবনকে এমন অনায়াসে ক্ষয় করে ফেলবে? তোমার জীবনের ওপর তোমার একার দায়িত্ব নেই, আমাদেরো ‘লোভ আছে। তুমি একা, সংসারে কারো কাছে তোমার এতটুকু ধার নেই—তোমার কত সুবিধে। তুমি একবার হ্যাঁ বল, দেখবে আমার সমস্ত জ্বর নেমে গেছে। নোংরা মেঝে সাফ অন্যে করলে ক্ষতি হবে না, অনেক বড়ো ও অনেক দুঃখময় কলঙ্ক তোমার নির্মল হাতের স্পর্শে শুচিস্নিগ্ধ হ’বার জন্যে অপেক্ষা করছে। নমিতা,—তুমি এস আমার সঙ্গে বলিয়া অসহায় শিশুর মত অজয় নমিতার দুই হাত ব্যাকুলভাবে চাপিয়া ধরিল।

নমিতা কি ভাবিল কে জানে, সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া কর্কশস্বরে কহিল,—“আপনি আমাকে কী ভাবেন? আপনার অসুখ দেখে আমি ভালো ভেবে আপনার সেবা কবুতে এলুম, আর আপনি তার এই প্রতিদান দিচ্ছেন? ছি! আপনি যে এত খারাপ তা আমি ভাবিনি।” বলিয়া নমিতা আঁচলে চোখ ঢাকিয়া ফেলিল।

এই কাণ্ড দেখিয়া অজয় প্রথমে একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল, তাহার শরীরে কণামাত্রও আর শক্তি রহিল না। সে যেন একটা পর্বতচূড়া আরোহণ করিতে গিয়া একেবারে সমুদ্রের তলায় আসিয়া ডুবিয়াছে। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া যেন

ঘূর্ণমান পৃথিবীর প্রান্ত হইতে ছিটকাইয়া পড়িবার ভয় হইতে সে আত্মরক্ষা করিল। দুই হাত দিয়া মাথার লম্বা চুলগুলি আঁড়াইয়া ধরিয়া সে কান্না রোধ করিল হয় ত'—সে কি না ক্ষীণজীবিনী কোমলকায় বাঙালি মেয়ের মাঝে আকাশের বিদ্যুদ্বতী বাত্যার মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। চাপা স্বরে গোঙাইয়া কহিল,—"আমর সত্যিই ভুল হয়েছে, নমিতা, আমাকে ক্ষমা কর। আমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপই বকছিলুম হয় ত'। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বাতি জ্বলতে পার, হাত বাড়ালেই তাকের ওপর দেশলাই পাবে। অন্ধকারে আর তোমাকে দেখবার প্রয়োজন নেই।"

বাতি না জ্বালাইয়াই নমিতাকে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া অজয় কহিয়া উঠিল: "একটা কথা স্পষ্ট করে জেনে যাও। তোমার দেহের উপর আমার লোভ ছিল, এ-কথা ঘুণাক্ষরে মনে কোরো না—লোভ ছিল তোমার এই জীবনের ওপর। আমরা যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছি তাতে তোমার জীবনকে আহুতিরূপে কামনা করেছিলুম মাত্র। তেমন মরা মরতে পারলে মানুষ হতে পারতে, নমিতা।"

এতটা পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া যাওয়াটা শোভন হইত না, তা ছাড়া দুইটা দরজার ফাঁক দিয়া ঘরের বাহিরে অন্ধকারে কাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নমিতার আর নিশ্বাস পড়িল না। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, কাকিমা কোলে খুকি। নমিতা ভাবিয়াছিল আজ হয় ত' খুকি স্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। কিন্তু কাকিমার নীচে আসিবার আগে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে কত যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়া গেছে, তাহার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার এই আচরণে যেন কিছুই অস্বাভাবিকতা নাই; কণ্ঠস্বর তেমনি সহজ করিয়া নমিতা কহিল,—"অজয় বাবুর জ্বর খুব বেড়ে গেছে, কাকিমা। ডাক্তার ডেকে পাঠানো উচিত।"

এই সব কথার চালাকি করিয়া কাকিমাকে ঠকানো যাইবে না। তিনি ভেঙচাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অজয় বাবু বুঝি তোমাকে বিনাতারে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল যে লোকলজ্জার মাথা খেয়ে দরজা বন্ধ করে তুমি তার জ্বর নামাচ্ছ?" হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন: "ও দিদি! দেখে যাও তোমার মেয়ের কীর্তি! সামনেই অঘ্রান মাস, নতুন করে মেয়ে-জামাই ঘরে তোলো!"

দরজার বাহিরেই এমন একটা বীভৎস রসের অভিনয় শুনিয়া অজয় বিছানায় আর স্থির থাকিতে পারিল না। টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। কোন রকমে দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া • কহিল, "রাত-দুপুরে হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করলে কেন? কী এমন কাণ্ড ঘটেছে?"

অজয়ের শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া কমলমণির গলায় মন্দা পড়িল না: "এই আমাদের অজয় বাবুর অসুখ! রাত্রিবেলা ক'দিন থেকে এই অসুখ চলছে শুনি?"

এমন সময় উপর হইতে নমিতার মা একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাহাকে দেখিয়াই নমিতা তাহাকে দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া একেবারে অবোধ আত্মহারার মত কাঁদিয়া উঠিল। মেয়েকে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি কহিলেন,—"কি, কি হ'ল?"

হাত ও মুখের একটা কুৎসিত ভঙ্গি করিয়া কমলমণি কহিলেন, "কি আবার হবে। রাত্রে তোমার মেয়ে অভিসারে বেরিয়েছিলেন! আর ভয় নেই দিদি, মেয়ে তোমার খুব ভালো রোজকারের পথ পেয়েছে।"

নমিতা ফুপাইয়া উঠিল, কিন্তু এই অন্যায় ও কদর্য্য কথা শুনিয়া। অজয় আর স্থির থাকিতে পারিল না। আর্তস্বরে কহিল,—"মুখে যা আসে তাই বোলো না, দিদি। নমিতা কেন নীচে এসেছিল জানি না, কিন্তু আমার বমি করবার আওয়াজ শুনেই ঘরে ঢুকেছিল! রোগীর প্রতি ওর এই করুণার এমন কদর্য অর্থ কর ত' ভালো হবে না।"

"কি ভালো হবে না শুনি?" কমলমণি খেকাইয়া উঠিলেন : "আর রাতের পর রাত এই ঢলাঢলিই খুব ভালো, না? পরের বাড়ি বসে এই সব কেলেঙ্কারি চলবে না, অজয়। আমি বাবাকে লিখে দিচ্ছি, তোমার মতন বাদরকে আমি পুষতে পারবো না।" ক্রন্দনরতা মেয়েটার গালে সবেগে এক চিমটি মারিয়া ফের জা-কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আর তোমাকেও বলছি দিদি, এই ধুমসো মেয়ে নিয়ে আর কোথাও গিয়ে পথ দেখ। এইখেনে থেকে আর আত্মীয়-স্বজনের মুখ হাসিয়ো না।"

"নমিতা!" অজয়ের ডাক শুনিয়া নমিতা মায়ের বুকের মধ্যে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। "তুমি তবু এই মিথ্যাচার এই পাপের মধ্যে বেঁচে থাকবে? সব ছেড়ে-ছুঁড়ে এস আমার সঙ্গে।" বলিয়া

হঠাৎ দুর্নিবার আবেগে অজয় হয় ত' এক-পা আগাইয়া আসিতে চাহিল। সামনেই সিড়ি। টাল সামলাইতে না পারিয়া একেবারে হুড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে বেশ বুঝা গেল, কপালের সামনেটা ফাটিয়া গিয়া গল্গল করিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। কমলমণি গিরিশ বাবুকে খবর দিতে উপরে ছুটিলেন। গিরিশ বাবু যখন নামিয়া আসিলেন, তখনো অজয়ের জ্ঞান হয় নাই। নমিতার মা'র কোলে মাথা রাখিয়া। সে শুইয়া আছে—আর নমিতা দূরে একেবারে পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে।

গিরিশ বাবু আসিয়াই হাঁক দিলেন : "এ-সব কি কাণ্ড বৌদি! তুমিও এসে এই অনাছিষ্টি ব্যাপারে হাত দেবে ভাবিনি। রাখ, রাখ, রক্ত বন্ধ হয়েছে ত'? শুইয়ে দাও বিছানায়।" বলিয়া চাকরকে উঠাইয়া ধরাধরি করিয়া অজয়কে তাহার বিছানায় আনিয়া ফেলিলেন।

নমিতা তখনো মূঢ়ের মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। গিরিশ বাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়াই ধমক দিয়া উঠিলেন: "তুই আর এখানে মরতে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা এখান থেকে।"

গিরিশ বাবু পেছন হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নমিতার কানে তখনো যেন অজয়ের করুণ গোঙানি লাগিয়া আছে, তবু তাহাকে উপরেই যাইতে হইল। আর বারান্দায় নয়, একেবারে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। মা উপরে আসিলে নমিতা একবার চোখ চাহিয়াছিল হয় ত'; মা ঘৃণার সঙ্গে বলিলেন,—"আমাকে আর তুই চুসনে পোড়ামুখি! তোর কপালে কেরোসিন তেল জুটল না? এর আগে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়তেও ত' পারতিস হতভাগী।" বলিয়াই মা পাগলের মত তাহার কপালটা বারে বারে ঘরের দেয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন।

পরদিন ভোর হইতেই গিরিশ বাবু দরজার গোড়ায় আসিয়া হাকিলেন: "বৌদি!"

নমিতা সমস্ত রাত্রি আর ঘুমাইতে পারে নাই। কাকার ডাক শুনিয়া মাকে জাগাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। নমিতার কুণ্ঠিত মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই গিরিশ বাবু কহিলেন, —"তোমার মেয়েকে আমার বাড়িতে আর রাখা চল্‌বে না, বৌঠান। ওর শ্বশুর ত' এখেনেই আছে, একটা চিঠি লিখে দি, নিয়ে যাক্। অজয়টাকেও আজ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলুম।"

নমিতার মা না বলিয়া পারিলেন না: "এত জ্বরের মধ্যে!"

গিরিশ বাবু একটা ট্রাঙ্কের উপর জায়গা করিয়া বসিলেন, বলিলেন, —"আজ যদি না যায়, সেবা করতে তোমার মেয়েকে ত' আর সেখানে পাঠানো চলবে না।" বলিয়া নমিতার দিকে একটা ব-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

নমিতা অনেক সহ করিয়াছে, কিন্তু এইবার তাহার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা এক সঙ্গে মোচড় দিয়া উঠিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"একজন পরিত্যক্ত রুগীর পরিচর্যা করার মধ্যে আপনারা যতই কেন না পাপ খুঁজে বেড়ান কাকাবাবু, যিনি মানুষের অন্তর পর্যন্ত তন্নতন্ন করে দেখছেন, তিনি কিন্তু ক্ষুন্ন হন্ নি।" বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল নামিয়া আসিল।

গিরিশ বাবুকে কোন কথা কহিতে না দিয়াই নমিতার মা কহিলেন,—"চুপ কর বছি। তাই ভাল, ঠাকুরপো, বেয়াইকে খবর দাও। ওখেনেই গিয়ে থাকুক্ কয়েকদিন।"

নমিতা আবার শক্ত হইল। কহিল,—"কেন আমি ওখানে গিয়ে থাববা? আমি কি করেছি? ওটা কি আমার নির্বাসন নাকি?"

গিরিশ বাবু দাঁত খিঁচাইলেন : "তবে ঐ গুণ্ডাটার গলা ধরে' বেরিয়ে পড়লেই ত' পারতিস।"

মাও কাকার কথার সুরে সায় দিলেন : "শ্বশুর বাড়ি না যাবি ত' যমের বাড়ি যাস।"

নমিতা গোঁ ধরিয়া বসিল : "এমন একটা কাণ্ড' আমি অবশ্য করিনি যাতে রাতারাতি তোমাদের ঘর-সংসার একেবারে উলটে ছত্রখান হয়ে গেল। আমি শুধু শুধু সেখানে যাবো কেন?"

পাশের ঘর হইতে কমলমণি ছুটিয়া আসিলেন,—"বসে বসে কে তোমাকে এখানে গেলাবে শুনি? মদ্দরও ত' বেহদ্দ হয়েছ—এবার রোজকার করে' পয়সা আন, নিজেরটা নিজে জোগাড় কর এবার থেকে। বাবাঃ, কী গলগ্রহই যে জুটেছে।"

নমিতা আর কথা না কহিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিল। এত বড় পৃথিবীতে কোথাও একটুও বদল হয় নাই, রাস্তার ধূলার উপরে তেমনিই রোদের গুড়া পড়িয়াছে। সকাল হইতেই যে কুঠে বুড়োটা বহুলোচ্চারিত ঈশ্বরের নামটাকে একটা বিকৃত-ধ্বনিতে পর্যবসিত করিয়া ফেলিয়াছে, সে লাঠি ভর করিয়া গলির মোড়ে আসিয়া বসিল। কিন্তু কালকের রাত পোহাইতেই নমিতা যেন এক নব-প্রভাতের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। হয় ত' এখন অজয় আরেকবার ডাকিলে সে বাহির হইয়া পড়িতে পারিত। কোথায় যাইত তাহা সে জানে না, কিন্তু এমন করিয়া মরিতে হয় ত' নয়।

রেলিঙে ঝুঁকিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেই তাহার নজর পড়িল একটা ছ্যাড়া গাড়ি এক-রাজ্যের মাল-বোঝাই হইয়া গলি পার হইতেছে। গাড়ির ভিতরে নজর পড়িতেই বাহির হইয়া পড়া দূরের কথা, নমিতার নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিল। পেছনের সিটুটাতে হেলান দিয়া অজয় অতি কষ্টে সামনের জায়গাটায় পা দুইটা ছড়াইয়া শুইবার মতন করিয়া বসিয়া আছে—মাথায় তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দেখিয়া নমিতা সম্বিৎ হারাইল কিনা কে জানে, সে সহসা হাতছানি দিয়া গাড়োয়ানকে থামিবার জন্য সঙ্কেত করিল। গাড়োয়ান তাহা লক্ষ্য করিল না, ভিতরে যে-ব্যক্তি যন্ত্রণায় মুহমান হইয়া পড়িয়াছিল, এই ইঙ্গিতটি তাহারও অগোচর রহিয়া গেল।

গাড়ি অবশ্য অজয় থামাইত না। গাড়ি মোড় পার হইয়া গেলে সে একবার পেছনে বাড়িটা দেখিবার জন্য মুখ বাড়াইল—যাহাকে দেখা গেল না, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল : আমার সঙ্গে না এসে ভালোই করেছ, নমিতা। একদিন যাতে নিজেরই পায়ের জোরে পথের ওপর নেমে আসতে পার, তোমার ওপর ততটা লাঞ্ছনা হোক। আমি সুখী হ'ব।

নানা জায়গা ঘুরিয়া

নানা জায়গা ঘুরিয়া সন্ধ্যাটা কাটাইয়া প্রদীপ তাহার মেসের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল কে একটা লোক তাহার বিছানার উপর উবু হইয়া পড়িয়া আছে। তিন সিটের ঘর—বাকি দুই জনের এত শীঘ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিবার কথা নয়। রমেন বাবু শহরের কি-একটা বায়স্কোপঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া টিকিট কুড়া, আর প্রতিনিধান রাত্রি করিয়া

কো-একট। কোচিং-ক্লাশে মোক্তারি পড়িতে যায়। তাহারা এই অসময়ে মেসে ফিরিয়া আসিলে ও কখনই প্রদীপের বিছানায় গড়াইতে সাহস করিত না। এ উহাদের চেয়ে শয্যা-বিলাস সম্বন্ধে উদাসীন বা অপরিচ্ছন্ন বলিয়া নয়, উহাদের সংশ্রব হইতে সে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিত বলিয়া। তা ছাড়া ঘরের তালাই বা কে খুলিল, খুলিল ত' কষ্ট করিয়া আলোটাই বা জ্বালাইল না কেন!

লণ্ঠন জ্বালাইবার সময় ছিল না; সাহস করিয়া আগন্তুকের গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল, —"কে?"

লোকটি অনেকক্ষণ পরে সাড়া দিল। মুখ না ফিরাইয়া আন্দাজে উত্তর দিল : "প্রদীপ এলে?"

স্বর পরিচিত। এইবার পকেট হাতড়াইয়া দেশাই বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাইল। দেখিল, অজয়। জীর্ণ ময়লা কাপড় জামার মধ্যে নিজের শরীরটাকে শামুকের মত সঙ্কুচিত করিয়া পড়িয়া আছে। অজয়ের গলা শুনিয়া প্রদীপ যেমন সুখী হইয়াছিল, ভয়ও হইয়াছিল ততখানি। ভয় হইয়াছিল, অজয় বুঝি তাহার স্বাভাবিক। যৌবন-প্রমত্ততায় আবার কোথাও হঠকারিতা করিয়া বিপদে পড়িয়াছে; আর সুখী হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে, তাহার আশ্রয়ে সে যখন একবার আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে এমন লোককে পৃথিবীতে প্রদীপ নিশ্বাস নিতে দিবে না। কিন্তু আলো জ্বালাইয়া অজয়ের এই শ্রীহীন কাতর চেহারা দেখিয়া প্রদীপ বিমর্ষ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি অজয়ের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'ল অজয়? কোত্থেকে?"

একটা দুর্বল হাত দিয়া প্রদীপের বাহুটা চাপিয়া ধরিয়া অজয় কহিল,—"জান-ই ত' লোকের সন্দেহ এড়াবার জন্যে একটা ভদ্রআস্তানা ঠিক রেখেছিলুম, আপাতত সেই আস্তানা থেকেই আসছি। ভীষণ জ্বর এসেছে।"

প্রদীপ ব্যাকুল হইয়া কহিল,—"জ্বর নিয়ে বাড়ি ছাড়লে কেন? কেউ তাড়া করেছিল না কি?"

ম্লান একটু হাসিয়া অজয় কহিল,—"এবার যে তাড়া করেছিল সে আমাদের সকল শত্রুর চেয়ে দুর্দম। তার কাছেই আমরা বার বার হেরেছি, বার বার হারব,—সে আমাদের ভাগ্য।"

অজয়ের চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধস্বরে প্রদীপ কহিল,-"তোমার এই বড় দোষ অজয়, তুমি বড় ভাবুক। তুমি সোজা বুদ্ধিকে কল্পনা দিয়ে ঘুলিয়ে তোল। কি হয়েছে স্পষ্ট করে বলবে?"

প্রদীপের ঠাণ্ডা হাতখানি অজয় তাহার উত্তপ্ত গালের উপর চাপিয়া ধরিল; কহিল, —"ভাবুকতা না থাকলে কোনো পরাজয়, কোনো ব্যর্থতাকেই মহনীয় করে দেখা যায় না। সে-তর্ক তোমার সঙ্গে পরে করলেও চলবে। সোজা স্পষ্ট করেই বলছি। কিন্তু সব কথা স্পষ্ট করে' বললে তার মানেটা সব সময়েই পরিস্ফুট হয় না, প্রদীপ। যেমন ধর, আমি যদি বলি, একটি মেয়ে আমার অনুগামিনী হ'ল না বলেই আমি অভিমানে বেরিয়ে পড়লাম —কথাটার আদ্যোপান্ত তুমি বুঝতে পারবে?"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"কথাটাকে যদিও এর চেয়ে স্পষ্ট করে' বলা যেত, তবু এটুকুই আমার কাছে যথেষ্ট অর্থবান হয়ে উঠেছে। মেয়ে! আর আমাকে বলতে হবে না। রোগ শুধু তোমার গাত্রোত্তাপ নয়, অজয়।"

অজয় উচ্ছসিত হইয়া উঠিল : "হ্যাঁ জানি। এ আমার আত্মার উত্তাপ, প্রদীপ। কিন্তু মেয়েটি তাকে দেহের উত্তাপ বলেই ধরে' নিল। তোমাকে স্পষ্ট করেই বলি তা হলে। দেখ কিছু করা যায় কি না।" বলিয়া অজয় তাহার মাথাটা প্রদীপের কোলের উপর তুলিয়া দিল। যেন আপন অন্তরের সঙ্গে কথা কহিতেছে, তেমনি মৃদু-গভীর

ও বেদনাগগদস্বরে বলিতে লাগিল,—"মেয়েটি বিধবা, নিরঙ্করা, অশ্রুমতী! আমাদের ব্রতচারিণী তপস্বিনী ভারতবর্ষ। কিন্তু হঠাৎ

একদিন তারই সেই ম্লান চোখে বিদ্যুৎ দেখতে পেলুম—বুঝলুম সে বিদ্রোহিনী। মনে মনে তাকে প্রার্থনার মত আহ্বান করেছিলুম হয় ত', সে আচার ও কৃত্রিম লজ্জাশীলতার বেড়া টপকে আমার ঘরে চলে এল মর্ত্তাবতীর্ণা মৃত্যুর মত। দুই হাতে সেবা নিয়ে, চোখে নিয়ে করুণা! মনে রেখে প্রদীপ, রাত্রে এল—যে-মুহূর্তে কবির মনে কল্পনাকায়া কবিতার আবির্ভাব হয়। আমি তাকে বল্লুম, আমার হাত ধরে বেরিয়ে পড়, নমিতা।"

কথার মাঝখানে প্রদীপ হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল : "নমিতা?"

অজয় বলিয়া চলিল : "আমাকে শেষ করতে দাও। বল্লম, নমিতা, আমার সঙ্গে এস। লাখো লাখো মেয়ে মরছে, সমাজে সংসারে অসংখ্য তাদের অত্যাচার। কেউ মরছে

আচারের দাসত্ব করে', কেউ সন্তানধারণ করে'-কেউ কেরোসিন জ্বালিয়ে, কেউ গলায় দড়ি দিয়ে। তুমি বীর-ভগ্নীর মত মরবে, এস।"

প্রদীপ আবার বাধা দিল : "নমিতা কি বলে?"

ম্লান বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া অজয় কহিল,-"নুমিতার উত্তর শুনে তুমি হেসো না, প্রদীপ। ভাবলে আমি বুঝি ওকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাই তুচ্ছ দেহ-বিলাসের জন্যে। বললে : আপনি যে এত খারাপ তা আমি ভাবিনি। কথাটা মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে আছে। পরে ভাবলুম, বাঙালি মেয়ের কাছ থেকে এর বেশি আর কী উত্তর আমরা প্রত্যাশা করতে পারি?"

প্রদীপ কহিল,—"ও! নমিতা তা হলে তোমার ভগ্নীপতির ভাই-ঝি হয়! কাছেই আছে তাহলে। আমি এতদিন ওর একটা ঠিকানা পর্যন্ত পাই নি। তোমার সঙ্গে দেখাও ত' আজ প্রায় তিন বছর বাদে। প্রথম দেখা কবে হয়েছিল মনে আছে?"

—"আছে না? সেই চিতোরগড়ে, রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের ওপরে! কিন্তু নমিতাকে তুমি চিন্‌লে কি করে?"

—"সেই জয়স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকের অগণন পাহাড়ের দিকে চেয়ে তুমি কি বলেছিলে মনে আছে, অজয়? বলেছিলে তুমি অতীতে ছিলে জয়মল্ল, দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে: আকবরের হাতে প্রাণ দিয়েছ, পরে নতুন দেহ নিয়ে নতুন যুগে বাঙলা দেশে অজয় হয়ে জন্মিয়েছ। কথাটা ভাবুকতার চূড়ান্ত, কিন্তু সেই দিনই তোমার সঙ্গে বন্ধুতা না করে পারলুম না। তার পর দুই জনে ঝড় আর বিদ্যুতের মত সহযাত্রী হয়ে সমস্ত উত্তর-ভারতটা মথিত করে' এলুম। আজ এত দিন বাদে তুমি আমার ঠিকানা পেলে কি করে?"

অজয় হাসিয়া কহিল, "তার চেয়েও বড়ো জিজ্ঞাস্য, তুমি নমিতাকে চিনলে কি করে?"

প্রদীপ বলিল,—"নমিতার স্বামী সুধীন্দ্র আমার সাহিত্যিক বন্ধু ছিল। রাণীগঞ্জে ও যখন মরে, তখন আমিই ওর পাশে ছিলাম।"

—"তোমার ঠিকানা আমি পেলুম অত্যাশ্চর্য্যরূপে, প্রায় সতেরোটা মেস্ খুঁজে। অত্যাশ্চর্য বলছি, কারণ তুমি যে এখনো কলকাতায়ই। আছ, তা আমি ভেবে নিলুম কি করে? মনে হ'ল এর আগে রাস্তায় একদিন যেন তোমাকে আমি দেখেছিলুম চিনে-বাদাম খচ্ছি। দিন সাতেক আগে হয় ত'। এখনো তোমাকে চিনে-বাদাম খেতে হয় নাকি? ভাবলুম দিব্যি বিয়ে-থা করে' ব্যথার সমুদ্র পার হয়ে এসেছ বুঝি।"

অজয়ের মুখে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া প্রদীপ কহিল,—"আমার ইতিহাসটা এমন নয় যে তাকে আঁকজমক করে বর্ণনা করতে হবে। নমিতার সন্ধান পেলুম, ঐটা আমার একটা সম্পত্তি, অজয়। নমিতাকে আর হারাচ্ছি না।"

এইবার অজয় একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, "মেয়েমানুষ সব সাধনার বিঘ্ন, প্রদীপ—সে কবিতায়ই হোল্ক বা ধর্মাচরণেই হোক। আমার বিশ্বাস আর নেই। একাকী থাকবার মধ্যে সুখের চেয়ে সুবিধা বেশি। সে-বাড়িতে এতক্ষণে চিটি পড়েছে নমিতা সংসারের চোখে কুলটার কলঙ্ক নিয়ে বিরাজ করবে—তবু কুলপ্লাবিনী হয়ে বেরিয়ে পড়বে না!"

—"তুমি বল কি, অজয়?"

—"বলেছি না, ভাগ্য! নমিতার ভাগ্য। আমাকে খারাপ বলে' বর্জন করে সে তার শুদ্ধাচার সতীত্বের খাপে তার বিদ্রোহাচরণের তলোয়ার ঢেকে রাখছিল, এমন সময় শাসনকর্তার দণ্ড নিয়ে দিদির আবির্ভাব হ'ল। নমিতা পড়ল ধরা! আর যায় কোথা! নমিতা রাত করে' লুকিয়ে পরপুরুষের দুয়ারে পসারিণী হয়ে এসেছে! সমস্ত মুখে কালি মাখিয়ে নমিতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তবু কালীর মত জেগে উঠতে পারল না। আমি ওকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু এমন নমিতাকে শেষ পর্যন্ত আমি শ্রদ্ধাটুকু পর্যন্ত দিতে পারলুম না ভাই।"

এইবার প্রদীপ আর না-হাসিয়া থাকিতে পারিল না। অবোধ সন্তানকে মা যেমন সান্ত্বনা দেন, তেমনিভাবে কোলের উপর অজয়ের মাথাটাকে আস্তে আস্তে একটু একটু দোলা দিতে দিতে প্রদীপ কহিল,-"তুমি এত বেশি হঠকারী যে, ব্যগ্রতাকে সংযত করতে শেখনি। তোমার মত দ্রুত নিশ্বাস যে নিতে না পারে তাকে তুমি মৃত বলেই ত্যাগ কর—এটা তোমার বাড়াবাড়ি। প্রত্যেক পরিণতির পেছনে প্রচুর প্রতীক্ষা চাই। আমরা এই বলদৃপ্ত যৌবনের পূজায় কত অসংলগ্ন দিন-রাত্রির অঞ্জলি দিয়েছি, তার হিসেব রাখ? ঝড়ে আমি বিশ্বাস করি না, তার চেয়ে একটি স্থির-প্রশান্ত গভীর-নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের আমি উপাসক। নমিতা সংসারেই বিরাজ করুক, সেখানে থেকেই যদি তার গ্রন্থি ও শিথিল করতে পারে তবেই ভালো। তার জন্যে ও লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোসেটা তার আশীর্বাদ।"

নিশ্বাস ফেলিয়া অজয় কহিল,—"আমিও তাকে সেই কথাই বলে এসেছি।"

—"সেইটেই সব চেয়ে বড় প্রার্থনা। আমার সঙ্গে তার যে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, সেটা তোমাকে পরে বললেও চল্‌বে। এখন তোমাকে কিছু খাওয়াই।"

অজয় কহিল,—ক্ষিদে আমার সত্যিই পেয়েছে। কিন্তু তোমার আছে কি যে খাওয়াবে? এই ত' তোমার বিছানার চেহারা! সামান্য একটা বাক্সও তোমার আছে বলে মনে হচ্ছে না।" বলিয়া মাথা তুলিয়া অজয় ঘরের চারিদিকে একবার চাহিল।

প্রদীপ হাসিয়া বলিল,—“দুর্ভাগ্যবশত তোমার জ্বর হয়েছে বলে তোমাকে আজ খাওয়াতে পারব না বলে মনে হচ্ছে না। পকেটে দু’ আনা এখনো আছে বোধ হয়। তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি সাবু আর মিছরি কিনে নিয়ে আসছি।”

অজয়কে ঘুম পাড়াইয়া

অজয়কে ঘুম পাড়াইয়া প্রদীপ ছাতে চলিয়া আসিল। নিজের তক্তপোষটা বন্ধুকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে; তাহা ছাড়া ঘুমও যে আসিবে এমন মনে হইতেছে না। অস্থিরপদে সে ছাতের এক প্রান্ত। হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পাইচারি করিতে লাগিল। সে এ কয়দিন প্রচুর আলস্যভোগ করিয়াছে, এইবার আবার তাহার দুই ব্যাকুল পক্ষ প্রসারিত করিতে হইবে। কিন্তু একটা করিবার মত কিছু না করিতে পারিলে তাহার আর স্বস্তি নাই।

রেলিঙ্-হীন ছাতের এক ধারে পা ঝুলাইয়। প্রদীপ বসিয়া পড়িল। অন্ধকার আকাশে অগণন তারা কোটি-কোটি ব্যর্থস্বপ্নের মত উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে; রাস্তায় মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল একটি লোকও পথ চলিতেছে না। এই অবারিত স্তব্ধতার মধ্যে নিজেকে প্রদীপের কী যে নিঃসঙ্গ ও একাকী লাগিল! নিজের পেশীবহুল দৃঢ় বক্ষতটের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল, সে কি জন্য নিশ্বাস ফেলিতেছে—এই পৃথিবীতে সে আসিয়াছে কেন? কি সে করিতে চাহিতেছে? অজয়ের দুই চোখে উগ্র মৃত্যু-পিপাসা; সে বলে : আমরা পৃথিবীতে আসিয়া মরিব এই আমাদের জীবনধারণের পরম পরিপূর্ণতা-কর্ম্মসাধনায়। আমাদের মৃত্যুকে মহিমান্বিত করিয়া তোলাই আমাদের কাজ। আমি আয়ুর ভিখারী নহি। স্ফটিক হইয়া চুর্ণ হইব তাহাও ভালো, তবু সামান্য প্রস্তরখণ্ড হইয়া গৃহচুড়ে অবিনশ্বর আলস্যে বিরাজ করিব না।

জীবনের মর্যাদা কষিতে হইবে মানুষের মৃত্যুর মূল্যে। . অজয় তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সবলে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে—সে তাহা চায় না। তার বাবার সম্পত্তির আয় বৎসরে কম করিয়া পনেরো হাজার টাকা, সে দুই হাতে তাহা নিয়া পুতুল খেলিতে পারিত। সে বলে : "বাবা যদি আমার এই ত্যাগ দেখে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র না করেন ত' এই টাকা দিয়ে আমি মাসিক একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করব। সামান্য হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা উদার উদাহরণ ত' দেখানো যাবে। সুদুর দৃষ্টি আমাদের দেশে অনেকেরই আছে প্রদীপ, কিন্তু সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত নেই।"

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : "কি তোমার সেই উদাহরণ?"

—"মোটামুটি এই। জেল থেকে যে-সব কয়েদি বেরিয়ে এসে ফের চুরি ও ডাকাতি করা ছাড়া বেকার-যন্ত্রণা নিবারণ করবার আর পথ পায় না, তাদের জন্যে ছোটখাট করে একটা ভরণপোষণের সংস্থান করে দেব। যারা চুরি-ডাকাতি করে, তারা যত গর্হিত কাজই করুক না কেন, তাদের বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, দলবদ্ধ হ'বার কৌশল জানা আছে। শুধু তাই নয়, একত্র সবদ্ধ হয়ে কাজ করার মধ্যে যে-সব গুণ থাকে, তা থেকেও ওরা বঞ্চিত নয়।"

প্রদীপ ফের প্রশ্ন করিয়াছিল : "যেমন?"

—"যেমন ধরো কার্য সিদ্ধ করতে কেউ যদি আহত হয়, তবে তাকে তারা নিরাপদ স্থানে বহন করে রক্ষা করে—গোপনে-গোপনে সেবা-শুশ্রুষা করতে ত্রুটি করে না। এরাও মানুষ প্রদীপ, এদেররা মহত্ত্ব আছে। তোমাদের মত এরাও মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে চাঁদ দেখে, কোনো একখানি মুখের সাদৃশ্য খুঁজে নিতেও হয়ত দেরি করে না। সমাজ থেকে এদের বহিষ্করণের পথ আমি বন্ধ করে দেব।"

প্রদীপ হাসিয়া বলিয়াছিল। কিন্তু তোমার বাবা যদি তোমাকেই বহিষ্কার করেন?"

উত্তরে অজয়ও হাসিয়াছিল বৈ কি। বলিয়াছিল : "বছরে পনেরো হাজার টাকা? ফুঃ! কেড়ে নিতে কতক্ষণ!"

অদ্ভুত, অসাধারণ অজয়। তাহার সঙ্গে পা মিলাইয়া চলে প্রদীপের সাধ্য কি। সে তাহা চাহেও না। সে তাহার দেহের প্রতিটি স্নায়ু ভরিয়া তপ্ত রক্তস্রোত অনুভব করিতে চায়। এই ভাবে মরিয়া বাচিতে তাহার ইচ্ছা করে না। অজয় তাহাকে বিলাসী, ভাবুক, অলস আরো কত-কি বলিবে, তবু আজিকার এই নক্ষত্রপ্লাবিত আকাশের নীচে সে নিজেকে বিরহী মানুষ বলিয়াই অভিনন্দিত করিয়া সুখ পাইল।

একটা ছোটখাট চাকুরি পাইলে সে বাঁচে। এমন করিয়া ভূতের খাটিতে সে লাহোর হইতে কলিকাতা আর ঘুরিতে পারে না সে এখন একটু জিরাইয়া লইলে পৃথিবীর দুর্দশা কি এমন ভয়াবহ হইত, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। কত দিন পরে সে ছাতে উঠিয়া আকাশ দেখিল কে জানে! সে যে একদিন কল্পিত মানুষের সুখ-দুঃখ, মনদেওয়া-নেওয়া নিয়া গবেষণা করিয়াছে বা করিতে পারে এমন কথা সে নিজেই ভুলিতে বসিয়াছিল—কিন্তু আজ তাহার রাত জাগিয়া, ভারি মিষ্টি করিয়া একটি ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করিতেছে। একটি সাধারণ ঘরোয়া গল্প—দুইটি সংসারানভিজ্ঞ স্বামী-স্ত্রী লইয়া। গল্পের একটি ছত্রেও রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা থাকিবে না—পুষ্করিণীর মত নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জীবন।

সে গল্প লিখিতে লিখিতে তন্ময় হইয়া থাকিবে, ঘরের আরেকটি লোক সামনের নিবুনিবু দীপশিখাটি উস্কাইয়া দিলে তাহার সহসা জ্ঞান হইবে যে, অন্ধকার ঘরে মাটির বাতিটির চেয়েও উজ্জ্বল আরেকখানি মুখ আছে। প্রদীপ চক্ষু বুজিয়া সে-মুখ ভাবিতে গেল। স্তিমিতাভ বিমর্ষ মুখ। আশ্চর্য্য, কপালে সিন্দুর নাই। মুখোনি দেখিয়া মনে হয়, কত বৎসর আগে যেন তাহাকে একবার দেখিয়াছে। নাম ধরিয়া ডাকিলেই কথা কহিবে।

এই সব কথা শুনিলে অজয়ের দলের লোকেরা তাহাকে যে কি ভাবিবে, তাহা সে জানিত। কিন্তু এমন করিয়া ভণ্ডামি, করিবারই বা কি মানে আছে? অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখের জন্য সে নিজের সুখকে তুচ্ছ করিতে পারিলে হয় ত' কোনো দিন কলিকাতা শহরে

তাহারই নামে একটা রাস্তা হইয়া যাইত; কিন্তু নিজের সুখকে যদি সে জুতার সুখতলার মত চুড়িয়া ফেলিতে না পারে তবে কি তাহার ক্ষমা মিলিবে না? সুখ সে পাইবে কিনা কে জানে, হয় ত' যে-পথে সে পা বাড়াইবে ভাবিতেছে, সে-পথে দুঃখের রাজ-সমারোহ চলিয়াছে—তবু হয় ত' তা সমারোহই। কোথায়ই বা সমারোহ নয়? যে কিছু চাহে না বলিয়া ভগবানকেই চাহে, ঐশ্বর্য্য সে কম ভোগ করে না। মরিলে সে অমর হইবে, এমন একটা পরম প্রলোভনেই ত' অজয়—অজয় হইয়াছে।

সে এই মরণের মধ্যে নমিতাকে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছিল। ছি ছি! নমিতার মধ্যে সে বন্দী ভারতবর্ষের মৌনী মূর্তি দেখিয়া শিহরিত হইল, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে কত কালের স্থবির সমাজের কলুষিত সংস্কার রহিয়াছে, সে দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল না। নমিতার মর্য্যাদা উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহে নয়, সংযত আত্মপ্রতিষ্ঠায়। তাহার মুক্তি কৃপাণে নয়, কল্যাণে। প্রদীপ নমিতার পথ-নির্দেশ করিবে। সে আর স্থির হইয়া বসিতে পারিল না, হটিতে সুরু করিল।

তারাগুলি ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রদীপ ছাতের উপরই একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, বোধ করি কি-একটা শব্দ হইতেই তাহার ঘুম ভাঙিল। স্পষ্ট চোখে পড়িল, কে যেন তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া আছে। প্রথমটা ভালো করিয়া ঠাহর হইল না। লোকটাকে চিনিবার জন্য সে জামার পকেট হইতে টর্চ বাহির করিতে গেল। একা ছাতে আসিয়াছে অথচ টর্চ লইয়া আসে নাই। এই লোকটা যদি এখন অপ্রতিবাদে অস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া বসে! যে এত অসাবধান ও অমনোযোগী, তাহার পক্ষে ত' সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া দিব্য বিবাহ করাই প্রশস্ত। ঐ পক্ষ হইতে একটা কাণ্ড হইয়া গেলে কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকিবে না। বেচারা অজয় অসহায়!

ভীষণ ঘাবড়াইয়া গিয়া প্রদীপ কি করিয়া বসিবে, ভাবিতে ভাবিতেই লোকটা ভারি স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল : "আমাকে চিনতে পাচ্ছ না? আমি সুধী।"

—"সুধী?" আতঙ্কে ও বিস্ময়ে প্রদীপ লাফাইয়া উঠিল। নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রভাবে সে হঠাৎ পাগল হইয়া যায় নাই ত'? নাকের নীচে ডান-হাতের তালুটা পাতিয়া সে নিজের নিশ্বাস অনুভব করিল। মনে ত' হইল সে বাঁচিয়া আছে। তবে ছাত বাহিয়া এই লোকটা কোথা হইতে আসিয়া নিজেকে সুধী বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ধমক দিবার জন্য সে চেচাইতে চাহিল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না।

লোকটি কহিল : "আমি বলেছি বলে' ত' একটুও মনে হয় না। অনেক দূর দেশে বেড়াতে গিয়েছিলুম,—বায়ুকোণে ঐ যে তারাটা দেখছ সেখানে। সেখানে সাহিত্যিক বলে আমার খুব নাম হয়েছে। তোমাদের ভাষায় আমার বইগুলি অনূদিত হয় নি?"

যাহা হক্, লোকটা মারমুখো নয়, বেশ বিনাইয়া কথা কহিতে জানে। প্রদীপ এবার গলা খুলিয়া বলিতে পারিল : "দূরদেশ থেকে এতদিন বাদে কি মনে করে? বায়ুকোণের তারায়ও বেকার-সমস্যা চলেছে নাকি?"

সুধী উদাসীন হইয়া কহিল,—"অনেকদিন পরে নমিতা আমাকে স্মরণ করেছে, প্রদীপ। না এসে থাকতে পারলুম না। আমি এখুনি তার কাছ থেকে আসছি।"

—"নমিতার কাছ থেকে আসছ—তার মানে? ভূত হয়েও তুমি তার ওপর স্বামীত্ব ফলাবে? কে আর তোমার নমিতা? সূর্য অস্ত গেলেও তোমাদের দেশে আলো থাকে নাকি? নমিতার প্রতি তোমার এই রূঢ় আচরণ আর আমি সহ্য করবে না।" প্রদীপ হাত বাড়াইয়া সুধীকে ধরিতে যাইতেছিল, সে একটু সরিয়া বসিল।

সুধীর মুখে স্বল্প-ম্লান হাসি : "আমি সেই কথাই নমিতাকে বুঝিয়ে দিয়ে এলুম। তার ইহজীবনে আমি যে তার সত্যি করে কেউ ছিলুম না, মরে' তার পূজোপচার আমি কি করে' গ্রহণ করব? তার কাছে আমি তোমার নাম করে এসেছি।"

—"আমার নাম কেন করতে যাবে? আমি কে? তুমি বলছ কি সুধী?"

সুধী নিরুত্তর। তাহাকে নাড়া দিবার জন্য প্রদীপ সামনের দিকে তাহার দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল। কিন্তু কঠিন একটা ইটে হাতের মুঠা দুইটা আহত হইতেই সে দেখিল ভোরের ফিকে আলোতে সুধীকে আর দেখা যাইতেছে না। বার কতক চক্ষু কচলাইয়া নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া রাস্তায় তাকাইল—কতগুলি ময়লা-ফেলার গাড়ি জড়ো হইয়াছে। প্রদীপ কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, ছাতে ফের পাইচারি করিতে লাগিল। ভালো করিয়া তাহার ঘুম হয় নাই। এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে নাকি?

মেসের চাকর ছাতে কি-একটা কাজে আসিয়াছিল, তাহাকে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই রাতে একবার উপরে এসেছিলি?"

একটা পরিত্যক্ত কাপড় গুটাইতে গুটাইতে যদু কহিল,—"না ত'।"

—"আচ্ছা, আমার ঘরের সবাই উঠেছে?"

—"অনেকক্ষণ।"

—"আমার বিছানায় কাল যিনি শুয়েছিলেন তিনি উঠেছেন?"

—"কৈ, জানি না, বাবু।"

—"যা, দেখে আয়।"

যদু কাপড় গুছাইয়া নামিয়া গেল। বিনা-সমাধানে হঠাৎ এই ছাত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সে নাম করিতে পারিল না। খানিক বাদে যদু ফিরিয়া আসিল; কহিল,—"সে বাবু এখনো ওঠেন নি, শুনলাম তাঁর জ্বর। কিন্তু নীচে আপনাকে কে ডাকছেন।"

—"আমাকে?" প্রদীপের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল। অত্যন্ত ভীতস্বরে সে চুপি চুপি কহিল, —"কে ডাকছে রে?"

যদু হাসিয়া কহিল,—"একটি মেয়ে। চিনি না।"

—"মেয়ে? কে মেয়ে?" প্রদীপ দিবালোকেও রাতের স্বপ্নের জের টানিয়া চলিতেছে বোধ হয়।

হাত উল্টাইয়া যদু বলিল,—"তা ত' আমি জিজ্ঞাসা করিনি, বাবু।"

নিশ্চয়ই নমিতা আসিয়াছে। প্রদীপ আর সন্দেহ করিল না। স্থাণ্ডে দুইটার মধ্যে পা দুইটা ঢুকাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিল। সেই প্রত্যাশিত প্রভাত আজ আসিল বুঝি—নমিতাকে সে আজ কোন্ মূর্তিতে দেখিবে? বিদ্রোহিনী বিজয়িনীর বেশে, না সরমনমিতা স্পর্শভীরু কবিকল্পনার মত? ভগবান করুন, সে যেন এই নির্মল প্রভাতটির সঙ্গে একটি অম্লান সাদৃশ্য রাখিয়াই অবতীর্ণ হয়! সেই অল্প কয়টি মুহূর্তের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে যে কত কিছু ভাবিয়া নিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু নীচে আসিয়া যাহাকে সে দেখিল, তাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল বোধ করি।

দম নিয়া প্রদীপ কহিল,—"তুমি? এ সময়ে এখানে?"

উমা মিষ্টি করিয়া হাসিয়া বলিল,-"সকালবেলা যে আমি মাঠে বেড়াতে যাই। প্রত্যহ। শচীপ্রসাদকে কাল আসতে বারণ করে' দিয়েছি। একাই বেরোলুম আজ।"

হতাশার আবেশটা কাটিয়া যাইতেই প্রদীপ যেন সুস্থ ও সচেতন হইল। কহিল,—"হঠাৎ আমার কাছে? কোনো দরকার আছে?"

উমা দুইটি টলটলে ডাগর চক্ষু নাচাইয়া কহিল,—"ববার মত দরকার কিছুই নেই তেমন।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"না বলবার মত আছে ত'?"

—"তেমন একটা কিছু না থাকলে বিজ্ঞানই অচল হয়ে পড়ে শুনেছি। শুনতে চান? আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই, দেখা করতে এলুম। আমাদের বাড়ির মত আপনিও

আমাকে তাড়িয়ে দেবেন নাকি?”

প্রদীপ কহিল,—“দিলেই কিন্তু ভালো হত। কেননা এটা মেষজাতীয় পুরুষদের একটা মেস। এখানে তোমার পায়ের ধূলো পড়লে অনেকের ব্যঞ্জনই বিস্বাদ হয়ে উঠবে।”

কৌতূহলী হইয়া উমা কহিল, “কারণ?”

—“কারণ, আমাকে সুনজরে দেখে না এমন প্রতিবেশী আমার উঠতে বসতে। প্রকাশ্যে তুমি আমার আতিথ্য স্বীকার করলে, কালক্রমে তুমিই হয় ত' আমার ওপর অকরুণ হয়ে উঠবে; কারণ একদিকে তোমার সংসার, অন্য দিকে এই কুৎসিত জনতা।”

উমা একটুও বিচলিত না হইয়া বলিল,-“অত সব কথা আমার মুখস্ত নেই। আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার আমার আছে কি নেই, সে বিচার আমি আপনার সঙ্গে করব। অন্য লোকের যদি তাতে গাত্রদাহ বা পিত্তশূল হয়, হবে। তাদের বিনা-দামে আমরা চিকিৎসা করতে যাব কেন? চলুন, ওপরে আপনার ঘরে। বলবার মত। দরকার একটা পেয়েছি।”

প্রদীপ ঘামিয়া উঠিল। উমা উত্তেজিত হইয়া সিড়ির উপর পা বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহাকে বাধা দিতে গেলেই সে আরো অবাধ্য হইয়া উঠিবে। প্রদীপ তাড়াতাড়ি রাস্তার উপর নামিয়া আসিল। বলিল,-“চল পার্কে, তোমার দরকার অদরকারের সমাধান হবে।”

উমা নড়িল না, কহিল,—“সেখানেও প্রকাশ্য জনতার ভয় আছে। আমি আপনার এই অন্যায় ও মিথ্যা সমাজহিতৈষণার শাসন করব। কথাটা খুব জমকালো করে বল্লম, কেননা সোজা কথা ঘোরালো করে'

বলে আপনারা বোঝেন না। আপনার এই আতিথেয়তার প্রতিদান আমি দেব একদিন—আমাদের বাড়িতেই নিমন্ত্রণ করে।”

প্রদীপের তবু সাহস হইতেছিল না; না জানিয়া-শুনিয়া উমা এই বিপদের মুখে কেন পা বাড়াইতেছে? সে ধীরে কহিল,—“ব্যাপারটা

খুব শোভন হবে না, উমা! তা ছাড়া—”

উমা হাসিয়া বলিল,-“আপনার ‘তা ছাড়া’-টা বলুন। আগের যুক্তিটা বাতিল।” পরে মুখ নিদারুণ গম্ভীর করিয়া সে কহিল,—“এত সব অমানুষিক কাজের ভার নিয়েছেন, অথচ একটি মেয়ের সম্পর্কে সামান্য লোকনিন্দা বহন করতে পারবেন না? তার চেয়ে বেত হাতে স্কুল-মাষ্টার হওয়াই আপনার উচিত ছিল। চলুন।”

প্রদীপও গম্ভীর হইল : “তা ছাড়া আমার ঘরে একটি অসুস্থ বন্ধু আছেন। তাঁর জ্বর।”

—"বন্ধু?" ভুরু কুচকাইয়া উমা কি ভাবিতে চেষ্টা করিল : "তার নাম কি?।

—"বন্ধুদের নাম যাকে-তাকে বলতে হয় না।"

—"বেশ ত', তারই সঙ্গে আমার দরকার। কি করে আর আমার পথ আটকাবেন? এটা পঞ্চভূতের মেস, আপনার নিজের বাড়ি নয়। আপনার অসুস্থ বন্ধুর হার্টফেল থেকে তাকে শিগগির বাচা বলছি।" বলিয়াই উমা পাশের সিড়ি দিয়। উপরে উঠিতে লাগিল।

অগত্যা প্রদীপ আর পদানুসরণ না করিয়া করে কি। তাহাকেই ঘর দেখাইয়া দিতে হইল। অজয়ের ঘুম ভাঙিয়াছে; বালিশটাকে দেয়ালের গায়ে রাখিয়া তাহাতে পিঠ দিয়া সে অন্যমনস্কর মত বসিয়া ছিল। ঘরে হঠাৎ একটি অপরিচিতা কিশোরীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ হইতে চাপল্য যেন পিছলাইয়া পড়িতেছে; মুখোনিতে সাধারণ বাঙালি মেয়ের মুখের মত একটা নিরীহতা নাই, অন্তত নমিতার মুখে সে এই দীপ্তি ও ধী দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপও ঘরে ঢুকিল। অজয়ের একটু আশ্বস্ত হইবার আগেই প্রদীপ বলিয়া উঠিল,—"নমিতাকে ত' তুমি চিনতে, এ তারই ননদ। তোমার একটা সামাজিক পরিচয়ই দিলুম, উমা।"

উমা চক্ষু বড় করিয়া কহিল,—"আমার আরেকটা অসামাজিক পরিচয় আছে নাকি?"

প্রদীপ কহিল,—"নেই? বল্‌ব তবে?"

উমা বলিল,-"মিছিমিছি কেন অতিরঞ্জন করবেন?" আমিই বছি : "বাড়ির শাসন আমি মানি না, সকাল বেলা একা বেড়াতে বেরই, মে-এর দুয়ারে দাঁড়িয়ে কেউ বাধা দিলে তাকে টপকে উপরে উঠে আসি। এই ত'?"

দুই বন্ধু হাসিয়া উঠিল। অজয় বিছানার উপর একটু সরিয়া

বসিল : "বসুন এখানে।"

যে ব্যক্তি মোক্তারি পড়ে সে বাহিরে যাইবে বলিয়া কাছা আঁটিতেছিল, চক্ষু দুইটা তেছা করিয়া সে ফিক ফিক্ করিয়া হাসিল। বলিল,—"একটা চেয়ার এনে দেব?"

উমা কহিল,—"চেয়ারে বসে বক্তৃতা দিতে আমি আসিনি। (অজয়ের প্রতি) বয়েস আন্দাজে আমাকে আপনার খুব এঁচড়ে-পাকা মনে হচ্ছে, না? আমি তাই।"

কোটের উপর চাদর চড়াইয়া ভাবী মোক্তার অন্তর্হিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অজয় কহিয়া উঠিল : "লোকটা ভালো নয়, প্রদীপ। কাল রাতে লুকিয়ে ও আমার সুকেশ ঘেঁটেছে। লোকটা হয়

চোর, নয় তার চেয়েও জঘন্য। আমাকে কিছু পয়সা দাও। আমিও এক্ষুনি বেরব।”

প্রদীপ চকাইয়া উঠিল : “বল কি? এই অসুস্থ শরীরে তুমি কোথায় যাবে?”

অজয় এমন করিয়া অল্প একটু হাসিল যে, প্রদীপ অধোবদন হইল। তবু কহিল,—“পয়সা ত’ আমার কাছে একটিও নেই।”

–“না থাক্; লাগবে না। এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।” বলিয়া ক্লান্তপদে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। . কোন রকমে সার্টটা গায়ে দিল, পায়ে জুতা ছিল না—সুটকেসটা হাতে লইয়া বাঁ-হাতে চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিল,-“আমি চলুম। (উমার প্রতি) আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হ’ল না। আবার যদি কোনো দিন দেখা হয়, আপনাকে ঠিক চিনে নিতে পারুব। কিন্তু আবার কি দেখা হবে?”

উমা ও প্রদীপের মুখে কোনো কথা আসিল না, সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটা নিমেষে কেমন ভারি, থমথমে হইয়া উঠিয়াছে। অজয়কে সত্যসত্যই টলিতে টলিতে দরজার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রদীপ বাধা দিয়া বলিল,—“একটা গাড়ি ডেকে দেব?”

অজয় হাসিয়া কহিল,—“কিন্তু ভাড়া? গাড়ি লাগবে না।”

উমা এইবার কথা পাইল : “যদি কিছু মনে না করেন ত’ আমার কাছে সামান্য কিছু আছে।”

-“মনে কিছু নিশ্চয়ই কবুব। দিন শিগগির।” বলিয়া অজয় হাত পাতিল।

সেমিজের মধ্য হইতে ছোট একটি ব্যাগ খুলিয়া তিনটি টাকা অজয়ের হাতে দিতেই সে মুঠা করিয়া কপালে ঠেকাইল। কহিল, “আমার লোভ যে আরো বেড়ে যাচ্ছে। এবার আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত’ আপনার দু’-হাত থেকে একগাছি করে সোনার চুড়ি আমাকে উপহার দি। দু-হাত থেকে একগাছি করে’ চুড়ি আপনার খোয়া গেলে আপনাকে আরো সুন্দর দেখাবে। আমার একদম ট্রেন-ভাড়া নেই। (হাসিয়া) আমি আমার দেশের বাড়ি ফিরে যাচ্ছি কি না। আসচে সাতাশে তারিখে যে আমার বিয়ে হবে।”

মুহূর্তে যে কি হইয়া গেল, ভাবাবেশে উমা আদ্যোপান্ত কিছু বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে চুড়ি দুইগাছি সে খুলিয়া ফেলিল। তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার মত করিয়া তাড়াতাড়ি চুড়ি দুইগাছি টানিয়া নিয়া অজয় কহিল,—“তা হলে গাড়ি একটা ডেকে দাও, প্রদীপ। পরের পয়সায় বাবুগিরি যখন কপালে আছেই, একটুতেই তাছাড়ি কেন? যাও দেরি করো না।”

প্রদীপ তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, উমা কহিল,-"দাঁড়ান, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।"

—"আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি? একা বাড়ি ফিরতে পারবে না?"

হাসিয়া উমা জবাব দিল : "না, পথ কি আর চিনি? কিন্তু আপনার সঙ্গে দরকারী কথাটাই যে বাকি রইল।"

অজয় কহিল,—"চট্‌পট্ সেরে নি, বেশিক্ষণ আমি দাঁড়াতে পারছি না।"

উমা প্রদীপকে কহিল,—"আপনি একদিন বৌদি'র ঠিকানা খুজছিলেন না? তিনি এখন আমাদের ওখানেই এসেছেন।"

—"কে? নমিতা? তোমাদের ওখানকার ঠিকানাঠটা কি শুনি?" বলিয়া অজয় পকেট হাতড়াইয়া এক-টুকরা কাগজ বাহির করিল। সামনের কেরোসিন কাঠের টেবিলটার উপর কোথাও পেন্সিল একটা পাওয়া যায় কি না তাহারই সন্ধানে অন্যমনস্ক অজয় কহিতে লাগিল, "যতই দুর্ব্বল আর সন্দিগ্ধ হোক্ না কেন, সেবায় নমিতার হাত আছে। একটুও ঘেন্না না করে দু'হাতে আমার বমি কাচালে। ভেবেছিলুম এ-কথা স্মরণ করে' নমিতাকে ভবিষ্যতে একটি অবিনশ্বর মর্যাদা দেব। কিন্তু পরে যখন তার ভেতর থেকে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ভীরু নারীপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করল তখন তার সেই অধঃপতনকে ক্ষমা করতে পারলুম না।"

প্রদীপ বলিল,—"তাকে তোমার ক্ষমা না করলেও চলবে। স্বল্প পরিচয়ের অবসরে তুমি তাকে ছিনিয়ে নিতে চাইবে, আর আবেগে অন্ধ হয়ে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করল বলেই সে ভীরু? আমি তার বিচক্ষণতাকে প্রশংসা করি। উত্তেজনার কুয়াশায় বুদ্ধিকে সে আচ্ছন্ন করে নি।"

—"ঐ রকম অকর্মণ্য বুদ্ধি নিয়ে সে চিরকাল কৃত্রিম বৈধব্য-পালনই করুক। অকারণ সন্তান প্রসবের চেয়েও তা নিন্দনীয়।"

প্রদীপের ইহা সহিল না। কহিল,—"অত্মীয়ের নিন্দা আত্মীয়ের সামনে শোভন নয়। একটু সংযম শিক্ষা করলে ভালো করতে।"

অজয় উমার দিকে ফিরিয়া কহিল,—"ও! আপনি ব্যথিত হচ্ছেন? কিন্তু যেটা সত্যিই নিন্দনীয় সেটা গোপন করে রাখলেই পাপ। এমনি করে আমাদের সমাজে পাপের প্রসার হচ্ছে।"

উমা কহিল,—“এখন সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যটাও আপনাকে শুনতে হলে আপনার এমনি করে অসুস্থ শরীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার মতলবের কোনো মানে থাকবে না। যান দীপদা, গাড়ি নিয়ে আসুন।”

উমাকে নিজের পক্ষে পাইয়া প্রদীপ জোর পাইল। কহিল, “তুমি ভাবছ এমনি সর্বনেশে উচ্ছলতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াটাই জীবন—”

অজয় চেঁচাইয়া উঠিল : “হাঁ, এই সর্বনেশে উচ্ছৃঙ্খলতা! এই জীবনের যথার্থ প্রতিশব্দ! নইলে ঐ ব্যর্থতা আমার সহ্য হয় নি, আমি তাকে বলিষ্ঠ কর্মের মধ্যে আহ্বান করেছিলুম—যে-কর্মের পুরস্কার মহামহিমান্বিত পরাজয়! নমিতা একটা পায়রার চেয়েও ভীরু।”

উমা কহিল,—“দুর্ভাগ্যবশত আপনি হাততালি পেলেন না। আমি বৌদিকে আরেকবার বলে দেখব ‘খন।”

অজয় পেন্সিল পাইল না। কহিল,—“তার ঠিকানাটা দিন, দরকার হলে তার কাছে আবার আমার আবির্ভাব হবে। ইতিমধ্যে আকাশের ঝড়ের আকারে তার ওপরে সমাজের অভিশাপ বর্ষিত হ’তে থাকু। এবার এলে আমাকে যেন শূন্য হাতে আর ফিরতে না হয়, ভগবান।”

উমা হাসিয়া কহিল,—“আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন নাকি?”

—“নিশ্চয় করি।” প্র

দীপ ঠাট্টা করিয়া কহিল,—“উনি অবতার।”

—“সত্যি তাই। আমি আমার নিজের ভগবান। কিন্তু অযথা বাক্‌বিস্তার আর করবো না। ঠিকানাটা বলুন, মনে করেই রাখব ঠিক। নমিতাকে যদি না ভুলি ত’ তার ঠিকানাটাও ভুলব না।”

উমা কহিল,—“ঠিকানা জেনে লাভ নেই। আপনার আবির্ভাবের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।”

—“কেন? কেন?” অজয় উৎসুক হইয়া উঠিল : “আমার সম্পর্কে তার খুব নিন্দা হচ্ছে বুঝি? তার চরিত্রে দোষারোপ হয়েছে? তাই হোক। আমি শুনে খুব সুখী হলুম।”

প্রদীপ ঝাঝালো গলায় কহিল,—“সুখী হ’লে? তুমি দিন-কে-দিন ইতর হচ্ছ।”

অজয় চটিল না, কহিল,—“আমি নমিতার উপকার চাই। অপবাদ ওর যত উপকার করবে শত উপদেশেও তা হবে না। নমিতা যদি বাঁচে নিজেকে যেন ঘৃণ্য মনে করে’ই বাঁচে—তাতে যদি উদ্ধারের একটা উৎসাহ পায়। নিজের সতীত্ব নিজেই যেন লুণ্ঠন না করে।”

—“ঢের হয়েছে, এবার থাম। শালীনতা বলে’ জিনিস তোমার জানা নেই দেখছি। তুমি এখন গেলেই আমরা সুখী হ’ব।”

অজয় চকাইয়া উঠিল; কহিল,—“যাচ্ছি। বলুন ঠিকানাটা।”

—“বলো না, উমা খবরদার। তুমি একে চেন না।”

প্রদীপের মুখের এই কর্কশ কথা শুনিয়া অজয় মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। নমিতার প্রতি সে কঠিন হইতেছে বলিয়া প্রদীপের কেন যে আঘাত লাগিতেছে তাহা তলাইয়া দেখিবার সময় ছিল না; এবং সময় থাকিতেও জাতির দুর্দশার দিনে কোনো যুবক সামান্য নারী-প্রেমে মাতোয়ারা হইতে পারে এমন একটা জাজ্বল্যমান সত্যকে সে প্রাণপণে অস্বীকার করে। তবু কি ভাবিয়া সে কহিল,—“সত্যিই আমাকে আপনি চেনেন না; চেনেন না বলেই তবু দুয়েকটা কথা বলছেন—আমাকে না চিন্বার আগেই যদি ঠিকানাটা দেন ত’ পাই, নইলে—” অজয় জোর দিয়া কহিল,-“নইলে ঠিকানা একেবারে পাবই না ভেবেছ, প্রদীপ? আমাদের কোটি কোটি কামনার ফলে পৃথিবীর সৌভাগ্য-সম্পদ যেমন অনিবার্য, তেমনি নমিতার প্রতি আমার প্রয়োজনবোধ যদি কোনো দিন একান্ত হয়ে ওঠেই, তোমাদের শত-লক্ষ অবরোধ তাকে নিবারণ করতে পারবে না। এ-কথা তোমাকে আমি উঁচু গলায় বলে যাচ্ছি। কিন্তু ভগবান করুন, আমার প্রয়োজনে তাকে যেন মুক্ত না হতে হয়, সে যেন নিজের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।”

—“বলি তুমি যাবে, না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার কসরৎ করবে?” প্রদীপ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অজয় কহিল,—“যাব বৈ কি। একজায়গায় বেশিক্ষণ থাকবার জো কোথায়? (উমার প্রতি) কিন্তু ঠিকানা যখন পেলুমই না, তখন নমিতার সম্বন্ধে বাকি খবরটুকু জেনেই যাই না হয়। তার সঙ্গে দেখা হবার সমস্ত পথ ত’ আপনারাই বন্ধ করে দিলেন।”

প্রদীপ চঞ্চল হইয়া উঠিল : “বাকি খবরে তোমার দরকার নেই। সে আমাকে উমা আরেকদিন বলবে। তোমার গাড়ি লাগবে কি না, বল। আমার কাজ আছে।”

অজয় হাসিয়া কহিল,—“তার চেয়ে আমার কাজ আরো জরুরি। নমিতার খবর আমার চাই। বলুন। আমি নমিতাকে উদ্যত শাসনের ফণা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলুম, সে স্বেচ্ছায় দাসত্ব যেচে নিয়েছে—

প্রদীপ ফের প্রতিবাদ করিল : "তুমি তার আচরণের এমন কদর্য্য ব্যাখ্যা করোনা বছি।"

—"হ্যাঁ, সে দাসত্বের যুপকাষ্ঠে আবার গলা বাড়ালে। মেয়েদের আত্মকর্তৃত্ব হয় ত' প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ।"

-"তোমার সঙ্গে গেলে তুমি তার আচরণের যত মহান অর্থ-ই দিতে কেন আমরা তাকে স্বেচ্ছাচরিণী বলতাম। সেখানেও সে তোমার দাসত্ব করত।"

—"ভুল, প্রদীপ। সে দাসত্ব করত জাগ্রত ভাগ্য-বিধাতার। সে-দাসত্ব পূজা, নৈবেদ্য, জীবনোৎসর্গ!"

উমা এতক্ষণে কথা কহিল : "বৌদি ত' পূজোই করছেন। বাকি খবরটুকু তার তাই।"

—"পূজো করছে? কার?" প্রশ্নের উত্তর পাইবার আগেই অজয় আপন মনে বলিয়া চলিল : "তার ক্ষণিক দুর্বলতা দেখে সত্যিই আমি একেবারে আশা ছাড়িনি, প্রদীপ। বহু যুগের প্রথা ও সংস্কারের ভস্মে আচ্ছাদিত থেকেও তার মধ্যে আমি বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখেছিলুম। নিজের দৈন্য দেখে একদিন দেশকে সে বড়ো করে অনুভব করবেই।

সে পূজার লগ্ন তার জীবনে এল?"

উমা তরলকণ্ঠে কহিল,—"দেশ নয়, স্বামী।"

একটা বজ্র ভাঙিয়া পড়িলেও বোধ করি এতটা ঘাবড়াইবার হেতু ছিল না। অজয় যেন স্বপ্নে একটা পর্বতচূড়া হইতে নীচে নিক্ষিপ্ত হইল। রূঢ় রুক্ষস্বরে সে কহিল,—"দেশ নয়, স্বামী! স্বামীপূজো করছে সে? স্বামীর ফোটো-পূজো?"

উমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল,-"ঠিক তাই।"

এক মুহূর্তও দেরি হইল না। উমার বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই অজয় সমস্ত ঘর-বাড়ি ঝাপাইয়া তুমুল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। ঐ কয়খানা জীর্ণ-পঞ্জরের মধ্য হইতে এমন একটা বিদ্রুপোচ্ছাস উদ্ভূত হইতে পারে এ-কথা কোনো শারীরতত্ত্বশাস্ত্রে লেখা নাই। উমার কথা শুনিয়া প্রদীপও সামান্য স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এমন একটা কুৎসিত অপরিমেয় হাসি শুনিয়া তাহার স্নায়ুতে আর যেন বল রহিল না। উমাও দেয়ালের দিকে পিছাইয়া গিয়াছে। অজয় সুটকেশটার হাত বদল করিয়া বলিল,-"ঠিকানা আর আমার চাইনে। সে মরুক্!" বলিয়াই সে দুর্বল ক্লান্ত পায়ে নীচে নামিতে লাগিল। দুই-তিনটা সিড়ি নামিয়া সে কহিল, "আমি শরীরে এখন বেশ জোর পাচ্ছি, তোমার কষ্ট করে' আর গাড়ি ডাতে হবে না।"

প্রদীপ কটুকণ্ঠে কহিল,—“পরকে ত’ মরবার অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু দেখো, নিজের উদ্ধৃঙ্খলতাই না তোমার শাপের বিপরীত অর্থ করে বসে।”

অজয় প্রায় নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, এক ধাপ উঠিয়া কহিল, “আমি বহু পুণ্যাত্মার অভিসম্পাত কুড়িয়েই জীবনে যাত্রা করেছি,প্রদীপ। কোনো পরিণামই আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত হবে না। কিন্তু সবাই যদি সর্বান্তঃকরণে নমিতাকে শাপ’, তা হলেই তার কল্যাণ হবে। জান, আমি ক্ষণকালের জন্য তার চোখে বিদ্যুৎ দেখেছিলুম। অভি সম্পাতে সে-আগুন হয় ত’ আরেকবার জ্বলে উঠবে—আরেকবার।”

অজয়কে আর দেখা গেল না।

নমিতা এক-এক রাজ্যের লজ্জা লইয়া

নমিতা এক-এক রাজ্যের লজ্জা লইয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল। গত্যন্তর ছিল না। গিরিশ বাবু এ-হেন কুস্বভাবা মেয়ের দায়িত্ব লইবেন কোন সাহসে? তাই একদিন অবনী বাবুকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা উল্লেখ না করিয়া তিনি মোটামুটি বুঝাইয়া দিলেন যে মেয়েটার সত্যকার পুণ্য-সঞ্চয় হইবে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করিয়াই; তাহার সংসার শ্বশুরবাড়ির উঠোনটুকুতেই। শেষকালে এইটুকুও টীকা দিলেন: মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহার কার্যকলাপ শাসনের চক্ষে অনুধাবন করিতে হইবে। কথাগুলি নমিতার সামনেই বলা হইয়াছিল; কিন্তু এত লজ্জাকর উপদেশ শুনিয়াও কেন যে তাহার মরিতে ইচ্ছা করিল না সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই।

অবনী বাবু নমিতাকে লইয়া আসিলেন। একখানি ছোট ঘর ছাড়া তাহার জন্য সামান্য একটু বারান্দাও আর রহিল না। সেই ঘরেরই বাহিরে অপরিসর একটু জায়গায় একটা ভোলা-উনুনে তাহাকে রাঁধিতে হয়। সমস্ত সংসারযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন নির্বাসিত নমিতা আর কি করিবে? বড় ঘর হইতে স্বামীর বৃহদায়তন ফোটোটা পাড়িয়া আনিয়া দুই বেলা তাহারই ধ্যান করে। স্বামীর মুখ সে প্রায় ভুলিয়া গেছে; মনে করাইয়া দিবার জন্য একটা প্রতীকের আবশ্যক আছে বৈকি। এক-এক সময় তাহার মনে হয় এ মুখ যেন অন্য কারুর, তাহার স্বামী এই ছবির চেয়েও জীবন্ত ও সুন্দর ছিল। কিন্তু মনে-মনে স্বামী-ধ্যান করিলে তাহার খ্যাতি বাড়িবে না বলিয়াই এমন একটা সর্বজনগ্রাহ লৌকিক উদাহরণকে সে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

আর কোনো কাজে সে মন বসাইতে দেয় না। অজয়ের দেওয়া বইগুলি সে কোথায় ফেলিয়া আসিত? কিন্তু উহাদের একটিররা পৃষ্ঠা উলটাইলে তাহার স্বামী-পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া সে উহাদের স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। মালী দরজার গোড়ায় ফুল রাখিয়া যায়, তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সে সেই ফুল লইয়া খেলিতে বসে। পিঠের উপর ভিজা চুলগুলি বিপর্যস্ত হইয়া লুণ্ঠিত হয়, সিক্ত শীতল শরীর হইতে এমন একটি সুন্দর পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে যে নমিতার পর্যন্ত নিজের জন্য মায়া করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই নির্জীব অন্ধ ও বধির ছবির সম্মুখে নিজের এই পরিপূর্ণ দেহ-পাত্রখানি আত্ম-নিবেদনের অর্ঘ্যস্বরূপ তুলিয়া ধরে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে, দেবতা আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করে না, না বা সম্ভাষণ! কে সেই দেবতা? চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে ভুল হইয়া যায়, স্বামীর স্মৃত মুখকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাকায়, কিন্তু কৃত্রিম ছবি সাহায্য করিতে পারে না। কোথা হইতে আরেকখানি মুখ অন্ধকার অন্তরে আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করে। শত মনঃসংযোগ করিয়াও সে-মুখ নমিতা তাড়াইতে পারে না। তার দুই চোখে কি দুনিবার তেজ, ললাটে কি অহঙ্কার—কখনো কখনো ফুল নিবার জন্য সে এমন উৎসাহে হাত বাড়াইয়া দেয় যে ফুল তাহাকে দিতেই হয়। সেই দুরন্ত দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় কৈ? সেই দেবতা নমিতাকে ঘর ছাড়িবার জন্য একদিন শঙ্খ বাজাইয়াছিল।

দেবতাকে সে ফিরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার শঙ্খধ্বনি কবে হইতে আর শোনা যাইবে না?

মনের এই চাঞ্চল্য দমন করিতে হইবে। সংসার বলে, বিধবার পক্ষে এই চিত্তবিভ্রম পাপ—তথাস্তু, সংসারের আদেশ শিরোধার্য। নমিতা কৃচ্ছ্রসাধনায় মন দিল। একবেলা আহার করিত, এখন আহারের সংখ্যাগুলি এত কমাইয়া ফেলিল যে অরুণা পর্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্রবধুর এই স্বামীচর্যা তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি তাহার পছন্দ হইল না। তিনি বাধা দিতে চাহিলেন, কিন্তু নমিতা তাহাতে কান পাতিবে কোন লজ্জায়? সে নিরম্বু একাদশী করে, ব্রত-উপবাস তাহার লাগিয়াই আছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দিতে চাহিলে সে পরিষ্কার কণ্ঠে বলে : স্বামীর নামই আমার জপমন্ত্র। আপনারা যদি এক টুকুররা পাথরে ভগবান পান, একটা ছবিতে তাকে পাওয়ায় আমার হানি কি? আমি স্বামী বুঝি, নারায়ণ বুঝি না।

সমস্ত সংসার নমিতার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। সে তাহার কলঙ্কিত আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে! সমস্ত সাহসিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে এমনই একটি প্রতিক্রিয়া না পাইলে সংসার তাহার সামঞ্জস্য হারায়। সেই শান্তি ও সামঞ্জস্য রাখিতে নমিতা এমন করিয়া তাহার স্বভাবের প্রতিকূলতা করিতেছিল। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে এই কৃত্রিম পূজায় তাহার নেশা লাগিয়া গেল। খুনী সাধু ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া সাধু বনিয়াছিল, বহুলাচরিত অভ্যাসে নমিতাও যে তপশ্চারিণী হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্রতা কোথায়? কিন্তু স্বামীকে মূর্তি দিতে গেলেই তাহার সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, তখন নিজেকে বৈধব্যচারিণী বঞ্চিতা বলিতে তাহার মন উঠে না। সংসারে তাহার এই আচরণটাই শোভন ও বাঞ্ছনীয়—এই ভাবিয়াই সে রোজ স্নান করিয়া চন্দন ঘষে, ফুল দিয়া ফোটা সাজায়, ভুলিয়াও একবার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় না। সে এত করে, তবু তাহার মন ভরিয়া উঠে না কেন? না; মানুষের মন একটা ব্যাধি; পায়ের তলায় বিধিয়া-থাকা কাটার মত তাহাকে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। মনের টু টি টিপিয়া ধরিবার জন্য নমিতা গীতার একটা বাক্স-সংস্করণ খুলিয়া বসিল।

এত লোক-জন, তবু এ-বাড়িতে তাহার বড় একলা লাগে। মা কাছে থাকিলে তাহার এমন খারাপ লাগিত না। সে-দিন মা তাহাকে মরিবার জন্য এক বোতল কেরোসিন তেল সামনে ধরিয়াছিলেন; তবু সে মরিলে মা-ই বেশি কাঁদিবেন বলিয়া সে স্বচ্ছন্দে বোতলটা স্বস্থানে। রাখিয়া আসিয়াছিল। মাকে কাছে পাইলে তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া সে এই বলিয়াই কাদিত : মা গো, এত পূজা করিয়াও তৃপ্তি পাওয়া। যায় না। এমন একটা অকর্মণ্য আলস্যের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াই বা আমি করিব কি? রাত্রে তাহার একা শুইতে বড় ভয় করে, খালি মনে হয়, কে যেন তাহাকে বাহিরে টানিয়া নিবার জন্য তাহার দৃঢ় ব্যর্থ হাত প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। অরুণা প্রথম-প্রথম তাঁহার কাছে শুইবার জন্য অনুরোধ করিতেন বটে, কিন্তু পূজা-ঘর ছাড়িয়া সে দিনে-রাত্রে কোথাও বাহির হইবে না বলিয়া পণ করিয়াছে তাহাকে। টলায় কাহার সাধ্য। মেঝের উপর বিছানা করিয়া শুইয়া তাহার সহজে ঘুম

আসে না; খোলা জানালা দিয়া বহুদূরের তারাগুলি চোখে পড়ে। ঐ একটি তারার মধ্যেই হয় ত' তাহার স্বামীর সস্নেহ সঙ্কেত আছে—এমনি ভাবে সে এই প্রাকৃতিক আকর্ষণের একটা উদার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু খানিকক্ষণ চাহিতেই তারাগুলি একত্র হইয়া একজনের মুখের মত প্রতিভাত হয়। সেই মুখের প্রত্যেকটি অবয়ব স্পষ্ট হইতে থাকে। নমিতা এমন বিভোর হইয়া পড়ে যে, সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া তাহার স্বামীর ইঙ্গিতের একটি কণাও আর কোথাও অবশিষ্ট থাকে না। কখন আবার জ্ঞান হয়; পরপুরুষের দৃষ্টি হইতে নিজেকে সম্বরণ করিতেছে এমনি ভাবে জানালাটা বন্ধ করিয়া দেয়; আলো জ্বালাইয়া গীতা পড়িতে বসে। এইবার শুইবার সময় স্বামীর ফটোটা সে পাশে লইয়া শোয়।

উমা ঠাট্টা করিয়া বলে : "তোমার স্বামী-পূজার এত ঘটা দেখে সন্দেহ হয়, বৌদি।"

নমিতা প্রশ্ন করে : "কিসের সন্দেহ?"

—"মনে হয় যে-কামনাকে তুমি জয় করছ বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছ। সেটাতেই সপ্রমাণ হচ্ছে যে, কামনা তোমার অণুতে-অণুতে।"

নমিতা আঁৎকাইয়া উঠিল : "তার মানে?"

—"তার মানে স্বামী হারিয়েও তুমি স্বামী চাও। সে-যুগের সাবিত্রী এর চেয়েও কঠিন তপস্যা করেছিল কি না জানি না, কিন্তু যম সত্যবানকে ফিরিয়ে দিয়ে সাবিত্রীর মুখ রেখেছিল; নইলে স্বামী-বিহনে তার সেই কাঙালপনার লজ্জা সে সইতো কি করে? তোমার এই বাড়াবাড়ি দেখে মনে হয় পুরুষের সঙ্গ-কামনার উর্দ্ধে তুমি আজো ওঠনি।"

নমিতা প্রতিবাদ করিল : "পুরুষ কি বলছ, উমা? আমার স্বামী–দেবতা, ঈশ্বরের প্রতিভূ।"

উমা ঘাড় হেলাইয়া কহিল : "হোক। যে-দেবতার মূর্তি ভাঙে, সেই ভাঙা টুকরো পূজো না করে আরেকটা গোটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেই তার পূজোর অর্থ হয়। সে-মূর্তি তোমার দেশাত্মবোধে হোক, প্রেমে হোক্, রোগীসেবায় হো—প্রতিষ্ঠিত কর। মৃত স্বামী-আরাধনায় নয়। এটা একটা তুচ্ছ আচরণ।"

নমিতা রাগিবার ভাণ করিল : "অমন ঈশ্বরনিন্দা করো না, উমা। স্বামী-পূজা আমার একটা আচরণ মাত্র নয়, আমার ধর্ম। বিরহবোধ মনের একটা পবিত্র প্রসাধন।"

—"ভালো করে ভেবে দেখ সে-বিরহবোধ কি মনের একটা দুর্বলতা নয়?"

—"আমি ভালো করে ভেবে দেখেছি।"

—"আমি হলে কিন্তু ফোটো পাশে না শুইয়ে একটা আস্ত জ্যান্ত লোক পাশে শোয়াতাম। সতীত্বের এমন অপমান করতাম না।"

নমিতা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিল : "আমি হয় ত' এতদিন তাই করে আসছিলাম।"

দুপুর বেলাটাই তাহার কাছে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। তখন রাস্তায় একটা ফিরিওলার ডাক, একটা মোটরের শব্দ কিম্বা পথচারীদের ছোট ছোট কোলাহল শুনিবার আশায় সে কান পাতিয়া থাকে। কোনো কাজেই মন বসে না, কি কাজই বা সে করিবে? তখন অবাধ্য চিত্ত লঘু একটি প্রজাপতির মত নবীন কুণ্ডুর লেইনের বাড়িতে ঘুরিতে থাকে। নীচের তলা ছাড়িয়া উপরে আর উঠিতে চাহে না। সেই অযত্নবিন্যস্ত অপরিষ্কার ছোট ঘরখানিকে সে পরম মমতায় স্পর্শ করে—সেই ছেড়া বিছানা, নোংরা মেঝেটা, দেয়াল হইতে চুণ-বালি খসিয়া পড়িয়াছেকাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। জানালার ও-পিঠে শার্টটা মেলিয়া দিয়াছে, কেহ যদি হাত বাড়াইয়া টানিয়া নেয় তাহাতে ত' ভারি আসিয়া যাইবে! ছেড়া হাঁ-করা জুতা-জোড়া পর্যন্ত সেলাই করিয়া লইবার নাম। নাই। এমনি দুপুর বেলায় আসিয়া ভাত চাহিত। ঘরে যেন তাহার কে আছে, সযত্নে ভাত বাড়িয়া বসিয়া থাকিবে। পাছে স্নান করিতে আসিয়া জল না পায় এই জন্য নমিতা কত দিন চাকরটাকে চৌবাচ্চার জল ছাড়িয়া দিতে চুপি-চুপি বারণ করিয়াছে। তবু যদি তাহার হুস থাকিত!

এমনি এক দুপুর বেলায় অস্থির হইয়া নমিতা অবনী বাবুকে আর না বলিয়া পারিল না : "বাবা, আমাকে কোনো একটা ইস্কুলে ভর্তি করে দিন, আমার দিন আর কাটে না।"

অবনী বাবু মায়া করিয়া কহিলেন,—"ধর্মের মধ্যে এই ত' ভালো পথ পেয়েছ মা, এর চেয়েও ভালো স্কুল কি কিছু আছে?"

নমিতা মাথা হেঁট করিয়া রহিল; অনেক কথা বলিবার ছিল, কিছুই বলিতে পারিল না। আঁচল খুটিতে খুঁটিতে অনেক পরে কহিল, "অন্তঃপুরে লেখা পড়া : শেখবার কোনো বন্দোবস্ত করা যায় না? যেমন সংস্কৃত, ইংরিজি।"

অরুণা বাধা দিলেন : "না, ও-সবে কাজ নেই। দিন না কাটে ঘরের কাজ-কর্ম্মও ত' করতে পার। রাত-দিন ধর্ম্ম আবার চোখে ভাল দেখায় না।"

কতটুকু ধর্মাচরণ যে ভালো দেখায় তাহারই হিসাব করিতে করিতে নমিতা তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল। ঘরের কাজ-কর্ম সে আর কত করিবে? করিবার আছেই বা কি? তবু তাহার অবসরযাপনের ক্লান্তির আর সীমা নাই। এখন দুপুরেও সে স্বামী-পূজা শুরু করিয়াছে।

এতদিনে নির্বাক দেবতা বুঝি কথা কহিলেন। কাল রাতে সুধীকে নমিতা স্বপ্ন দেখিয়াছে—কি নিশ্রী স্বপ্ন! স্বামী তাহাকে বলিতেছেন। "এ-সব তুমি কি ছেলেখেলা করছ, নমিতা? আমাকে তুমি এমন করে বেঁধে না।"

যে দিন নমিতা কাকার বাড়ি ছাড়িয়া প্রথম এখানে আসে সেদিনও সুধী স্বপ্নে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু কাল রাতের স্বর যেন অনেক স্পষ্ট, দৃঢ়। নমিতা বলিল : "তবে আমি কি নিয়ে থাকব?"

উত্তর হইয়াছিল : "যে তোমাকে ভালবাসে তাকে নিয়ে।"

—"তুমি আমাকে ভালবাস না?"

—"না।"

কে তবে তাহাকে ভালবাসে এমন একটা প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানেই নমিতা আর উত্থাপন করে নাই। সে বুঝি মনে-মনে তাহার নাম জানিত। তবু গায়ে পড়িয়া সুধী কহিল, —"তোমার প্রদীপকে মনে পড়ে? সে।"

লজ্জায় অরুণবর্ণা উষার মত নমিতা কাঁপিয়া উঠিল। তখন পূর্বদিকে প্রভাত হইতেছে। জাগিয়া উঠিয়া নমিতার ইচ্ছা হইল স্বামীর ফটোটা ছুড়িয়া ভাঙিয়া ফেলে।

পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে

একেবারে নীচেই যে কেহ পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে প্রদীপ তাহা ভাবে নাই। তাই বসিবার ঘরে অবনী বাবুকে খবরের কাগজে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা পাশেই একটা চেয়ারে বসিয়া শচীপ্রসাদ ধীরে-ধীরে টেবিল বাজাইতেছে।

নিজের ঠোঁটের উপর তর্জনীটা চাপিয়া ধরিয়া সঙ্কেত করিলে শচীপ্রসাদ নিশ্চয়ই ক্ষান্ত হইবে না; বরং দুর্বিনীত ব্যবহার সন্দেহ করিয়া হয় ত' এমন ভাবে সম্বর্ধনা করিবে যে অবনী বাবু তাহার তন্ময়তা ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রদীপের জামার গলাটা চাপিয়া ধরিবেন। কিন্তু উপরে গিয়া নমিতার সঙ্গে তাহার দেখা না করিলেই নয়—দেখা তাহাকে করিতেই হইবে। চুরি করিয়া আসিতে তাহার লজ্জা ছিল না, কিন্তু গভীর রাত্রিতে আসিলে দরজা সে খোলা পাইত না নিশ্চয়ই–পাঁচিল ডিঙাইয়া সে তাহার সাহসকে দুর্ধর্ষ করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ করিতে চায় না। বেশ ত, অবনী বাবু জানুন, ক্ষতি নাই! নমিতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সে বোঝা-পড়া করিবেই। কোন বাধাই আজ আর যথেষ্ট নয়।

শচীপ্রসাদই আগে কথা কহিল,—"কি মনে করে?"

অবনী বাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিলেন। সামনেই প্রদীপকে দেখিয়া এক নিমেষে তাঁহার মুখ গম্ভীর ও কুটিল হইয়া উঠিল। চোখ দুইটা বাকাইয়া তিনি তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন—সমস্ত অবয়বে স্বাভাবিক ভদ্রতার লেশমাত্র লালিত্যও তাহার চোখে পড়িল। শীর্ণ কঠোর দেহটায় যেন একটা নিষ্ঠুর রুক্ষতা গাঢ় হইয়া আছে—কোথাও এতটুকু বিনয়নম্র কোমলতা নাই। চোখ দুইটা রাঙা, কপালের রেখায় কুটিল একটা ষড়যন্ত্র, সমস্ত মুখের ভাবে গূঢ় একটা ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা! চেহারাটা অবনী বাবুর একটুও ভাল লাগিল না। অমন একটা দৃঢ় স্থিরসঙ্কল্প মূর্তি দেখিয়া তিনি প্রথমে একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। কহিলেন,—"অনেক দিন পরে যে! এখানে?"

শেষের প্রশ্নটার হয় ত' এই-ই অর্থ ছিল যে, সেদিন অমন অপমানিত হইবার পর আবার কোন প্রয়োজনে মুখ দেখাইতেছে? প্রদীপ ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ধরিয়া একটু হাসিল, সে-হাসি তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। সে-সঙ্কেতকে স্পষ্ট করিবার জন্য কথা বলিতে হয় না।

প্রদীপ একটিও কথা না বলিয়া বাড়ির ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। অবনী বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"ও-দিকে কোথায় যাচ্ছ?"

প্রদীপ স্পষ্ট সংযত স্বরে কহিল,—"নমিতার সঙ্গে আমার দরকার আছে।"

ইলেকট্রিক শক পাইয়া অবনী বাবু চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন: "নমিতার সঙ্গে দরকার? তার মানে?"

প্রদীপ কহিল,—"মানে বলতে গিয়ে আমি অকারণে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার কাজ আছে। ভীষণ দরকার! আমাকে যেতেই হবে ওপরে।"

অবনী বাবু তাড়াতাড়ি আগাইয়া প্রদীপের পথরোধ করিলেন; শচীপ্রসাদও তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অবনী বাবু তাঁহার দুই বলিষ্ঠ হাতে প্রদীপের কাঁধ দুইটায় ঝাকানি দিয়া বলিলেন,—"জান, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি? তোমার এ-বেয়াদবিকে আমরা সহ্য করবো না, জান?"

এই সামান্য দৈহিক অত্যাচারে প্রদীপ ধৈর্য্য হারাইল না। এত অনায়াসে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে দিতে নাই। সে বিদ্রোহী বটে, কিন্তু কৌশলীও। তাই সে স্বচ্ছ অথচ উজ্জ্বল হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া কহিল,—"সব জানি। কিন্তু তবু আমার দেখা না করলেই নয়।"

শচীপ্রসাদ বর্বরের মত খেকাইয়া উঠিল : "এ তোমার কোন্ দেশী ভদ্রতা?"

প্রদীপের মুখে সেই হাসি : "আমরা যে-দেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, সেই দেশের। আপনি তা বুঝবেন না।"

পরে কাঁধের উপর অবনী বাবুর আঙুলগুলিতে একটু চাপ দিয়া সে কহিল,—"ছাড়ুন, আমার সত্যিই দেরি করবার সময় নেই।"

অবনী বাবু বজ্রের মত হাঁকিয়া উঠিলেন : "না।"

বলিয়া বাঘের থাবার মত দুই হাতে জোর করিয়া তাহাকে সামনের সোফাটার উপর বসাইয়া দিলেন। প্রদীপ নেহাৎই মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে বিনা প্রতিরোধে সোফার উপরে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

অবনী বাবু তীক্ষ্নস্বরে কহিলেন,—"নমিতার সঙ্গে তোমার কী দরকার?"

প্রদীপ কহিল,-"সে-কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আসিনি। সেটা গোপনীয়।"

—"গোপনীয়! তোমার এতদূর আস্পর্ধা? একজন অন্তঃপুরিকা হিন্দু-কুল-বধূর সঙ্গে তোমার কী দরকার হতে পারে?"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"অন্তঃপুরিকা হিন্দু-কুল-বধূ বলেই বেশি দরকার। সে ত' আর বাইরে বেরয় না যে, তাকে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ করুব। সে নেহাৎই বন্দিনী,

তাই দরকারী কথা সেরে নেবার জন্যে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। এখানে ছাড়া আর ত' তার দেখা পাওয়া যাবে না।"

অবনী বাবু বাহিবের দরজার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিলেন, "তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কি না বল।"

মাথার চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পরম উদাসীনের মত প্রদীপ বলিল,-"যেতে বলেই সহজে চলে যাওয়া যায় না। ওপরে যাবার যেমন বাধা আছে, তেমনি বাইরেও।"

অবনী বাবু আরো রুখিয়া উঠিলেন : "না। তুমি যাও বেরিয়ে। এক্ষুনি।"

তেমনি নির্বিকার শান্তস্বরে প্রদীপ বলিল,-"এক কথা কত বার করে' বলব! আরো স্পষ্ট উত্তর চা নাকি? আমি যাব না, অর্থাৎ নমিতার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে। যদি বাধা পাই, সে-বাধা স্বীকার করে' পরাস্ত হয়ে ফিরে গেলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। বেশ ত', তাকেই এখানে ডাকুন। কিম্বা যদি চান, তাকেও রাস্তায় বার করে দিতে পারেন। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।"

অবনী বাবু গর্জিয়া উঠিলেন : "জান, তোমাকে এক্ষুনি পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি?"

—"জানি বৈকি। কিন্তু দয়া করে' ওটি কবেন না। সামান্য নারী-হরণের অভিযোগে পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণের ইচ্ছে নেই। কিন্তু বৃথা বাকবিতণ্ডা করে লাভ কি? যদি বলেন, আমি-ই না-হয় এখানে নমিতাকে ডাকি।" বলিয়া প্রদীপ তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়া গলা চড়াইল : "নমিতা! নমিতা!"

অবনী বাবু কহিলেন,—"তুমি যাও ত', শচীপ্রসাদ। শিগগির। মোড়ের থেকে একটা পাহারাওয়ালা ডেকে নিয়ে এস ত'।"

শচীপ্রসাদ বুক ফুলাইয়া সেনাপতির ভঙ্গীতে তর্জনী হেলাইয়া কহিল,—"যা শিগগির এখান থেকে। নইলে আপনার মত দু'-দশটাকে আমি ঘুষি মেরে সমান করে দিতে পারি।"

একটা হাই তুলিয়া প্রদীপ কহিল,—"আর সমান করে কাজ নেই, ভাই। মোড়ের থেকে পাহারওয়ালা ধরে নিয়ে এস গে। (অবনী বাবুর প্রতি) আপনাদের বাড়িতে ত' ফোন আছে। থানায় একটা খবর পাঠিয়ে দিন্ না। লরি-বোঝাই সেপাই এসে যাবে'খন। আমার পালাবার আর পথ থাকবে না। ততক্ষণে নমিতার সঙ্গে দরকারী কথাটা ধীরে-সুস্থে সেরে নেওয়া যাবে।" আড়মোড়া ভাঙিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল, "কাল সারা রাত্রি আর ঘুম হয় নি। নমিতার অধঃপতনে সমস্ত আকাশ মাটিতে মূর্মিত হয়ে পড়েছে।"

অবনী বাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন : "কি, কি? নমিতার কি হয়েছে বল্লে?"

—"পাহারওয়ালা আগে ডাকুন। বলছি।"

শচীপ্রসাদ দিব্যি একটি ঘুসি পাকাইয়া প্রদীপের মুখের কাছে আগাইয়া আসিল। কহিল, —"আবার কথা কইবে ত' বত্রিশটা দাঁত। গুঁড়ো করে ফেলব।"

প্রদীপ ইচ্ছা করিলে অনেক কিছুই করিতে পারিত হয় ত'। কিন্তু শচীপ্রসাদের উদ্ধত ঘুসিকে স্বচ্ছন্দে এড়াইয়া আবার সোফাটায় আসিয়া নিলিপ্তের মত বসিয়া পড়িল। বলিল,-"বেশ, আপনাদের সঙ্গে কথা আমি না-ই বা কইলাম। অধিক বীরত্ব প্রকাশ করলে আমি যে গান্ধি হয়ে বসে থাকূব এটা আশা করবেন না। তার চেয়ে থানায় একটা খবর দি। দাঁত গুড়ো করে লাভ নেই, বাজারে কিনতে পাব, বুঝলেন?"

অবনী বাবু সেই হইতে দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি কহিলেন,—"তুমি ত' ভদ্রলোক, কিন্তু অপমানববধ বলে কিছুই তোমার নেই নাকি?"

—"আমরা আজো ততটা মহৎ হ'তে শিখিনি। অপমানিত হয়ে পিঠ দেখানোটাই অপমান, অপমানকে শাসন করাটাই আমাদের ধর্ম।"

অবনী বাবু কহিলেন,—"আচ্ছা, দাঁড়াও। তা হলে শচীপ্রসাদ, ডাক ত' চাকর দু'টোকে।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"কেন, পাহারওয়ালা কি হ'ল? দেরি হয়ে যাবে বুঝি? বাঃ, আমি ত' আর পালাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, ডাকুন। ক'টা চাকর? দুটো? এই ছোট সংসারে দু'টো চাকর লাগে?"

—"কিসের চাকর?" বলিয়া শচীপ্রসাদ বাঁ-হাতের মুঠিতে প্রদীপের চুলগুলি চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"তুমি উঠবে কি না বল; নইলে–"

আবার সে ঘুসি তুলিল।

এমন সময় ভেতরের দরজা দিয়া দ্রুতপদে উমা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। প্রদীপের কণ্ঠে নমিতার ডাক তাহার কানে গিয়াছিল বুঝি। কিন্তু ঘরে আসিয়া এমন একটা অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া সে নিমেষে কাঠ হইয়া গেল। শচীপ্রসাদ প্রদীপের চুলের ঝুটি ধরিয়া ঘুসি মারিতে উদ্যত, বাবা রাগে গম্ভীর, স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন—আর সোফায় বসিয়া উদাসীন প্রদীপ অলস-স্বরে বলিতেছে : "দাঁত ভাঙলে আবার দাঁত পাব, কিন্তু আপনার চশমার ওপর যদি একটা ঘুসি মারি, তবে সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও চোখ আর ফিরে পাবেন না। হ্যাঁ, দাঁতের চেয়ে চোখটাই বেশি প্রয়োজনীয়। বেশ, ভালো হয়ে বসছি। মারুন্।" বলিয়া সে দুই পাটি শক্ত পরিষ্কার দাঁত বাহির করিয়া ধরিল।

ব্যাপারটা উমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কি এমন হইতে পারে যে শচীপ্রসাদ পর্যন্ত প্রদীপের মুখের উপর ঘুসি বাগাইয়াছে, আর অবনী বাবু তাহারই প্রয়োগনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটি দোদুল্যমান মুহুর্ত্তমাত্র। উমা তাড়াতাড়ি প্রদীপের সামনে আসিয়া পড়িল। বলিল,-"এ কী!"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"শচীপ্রসাদকে বিয়ে করো না, উমা। দেখেছ, চুলের ঝুটি কেমন শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে! শিগগির ওর পেটে সুড়সুড়ি দাও। নইলে চুল ও কিছুতেই ছাড়বে না।"

উমা শচীপ্রসাদের হাত ছাড়াইয়া নিয়া কহিল,—"আপনার এ কী দুঃসাহস! দীপ-দা'র গায়ে হাত তোলেন।"

অবনীবাবু স্থান পরিবর্তন করিয়া কহিলেন,—"তুই সব তাতে সর্দারি করতে আসিস কেন? যা তেতরে। ঐ গোয়ার ইতরটাকে সায়েস্তা আমরা করবই।

বার-কতক ইতস্তত চাহিয়া উমা কহিল,—"কেন, কি হয়েছে?"

-"সে অনেক কথা।" প্রদীপ সোফাটার উপর একটু সরিয়া বসিয়া কহিল : "বোস আমার পাশে। এবার শচীপ্রসাদ পাহারওয়ালা ডাকৃতে যাবেন। পাহারওয়ালা আসুক। সব শুনতে পাবে।"

সত্য-সত্যই উমা প্রদীপের পাশে সোফায় বসিল। যেন ইহার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা করিবার ছিল না। এই সান্নিধ্যের মধ্যে কোথাও জড়তা নাই, না বা স্লানিমা—যেন পরিচয়-প্রকাশের সামান্য একটি প্রচলিত রীতি মাত্র। কিন্তু অবনীবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এইবার শাসনের অত্যাচারে উমাকেই নিজ্জিত হইতে হইল। প্রদীপ কয়েক মিনিটের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলুক।

অবনীবাবু কহিলেন,—"ওঠ এখান থেকে। এই বেহায়াটার পাশে বলি যে!"

শচীপ্রসাদ বলিল,-"ওর ছায়া মাড়ালেও অশুচি হতে হয়। ওঠ।"

উমা বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। বলিল,-"কেন, কি হয়েছে? সেদিনো ত' বাস্-এ পাশাপাশি বসে এলাম। অশুচি হ'ব? পরে গঙ্গাস্নান কব 'খন, শচীপ্রসাদবাবু।"

—"ফের মুখে-মুখে তর্ক? ওঠ বলছি। অবাধ্য কোথাকার!" বলিয়া অবনীবাবু আগাইয়া আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে কী যে হইয়া গেল কেহই স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারিল না।

—"আপনারা খানিকক্ষণ তর্ক করুন, আমি এই ফাঁকে নমিতার সঙ্গে কথাটা সেরে আসি।" বলিয়া পলক ফেলিতে না ফেলিতেই প্রদীপ ভিতরের খোলা অরক্ষিত দরজা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। সামনেই সিড়ি। সিড়িগুলি লাফাইয়া লাফাইয়া পার হইতে হইতে সে কহিল, —"তাড়াতাড়ি পাহারওয়ালা ডেকে নিয়ে আসুন, শচীপ্রসাদবাবু। আমি নমিতাকে লুট করে নিয়ে যেতে এসেছি।"—কথাটা এইবারে একেবারে উপর হইতে আসিল : "লুণ্ঠনের সময়ে একটা সম্বর্ষ না বাধলে কোনোই মাধুর্য থাকে না।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য সকলেই একেবারে হিম, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। সচেতন হইয়া শচীপ্রসাদ পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাইতেছিল, অবনী বাবু বাধা দিলেন : "ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে তুমি একা পারবে না। তা ছাড়া বাড়ির মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি হওয়াটা ঠিক নয়।"

শচীপ্রসাদ কহিল,—"কিন্তু ঐ স্কাউণ্ড্রেলটাকে unseathed ছেড়ে দেবেন নাকি?"

অবনীবাবু একটু পাইচারি করিয়া কহিলেন,—"দেখি। ও ভীষণ বোম্বেটে, শচী। নিজের প্রাণের 'পরেও ওর একবিন্দু মমতা নেই। ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না। তুমি যখন ওর চুল টেনে ধরেছিলে তখন ভয়ে জিভ আমার পেটের মধ্যে সেধিয়ে গেছল।"

উমা কহিল,—"আপনার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে দীপদা-র চুলের বিনিময়ে মুণ্ডুটা আপনাকে দিতে হয় নি।"

শচীপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া কহিল,—"তবে ঘরে-বাইরে আপনি মুখ বুজে এ-সব ডাকাত বোম্বেটের অত্যাচার সইবেন নাকি? কিছুই এর বিহিত করবেন না? আইন-আদালত নেই?"

——"আছে। তবে যে লোক সব অত্যাচার হাসিমুখে সইতে প্রস্তুত, তার সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। যত নষ্টের গোড়া ঐ বে-টা। তুই যা ত' উমা, বৌমার সঙ্গে ঐ হতচ্ছাড়াটার কি-না-কি দরকারী কথা আছে। ওকে পাশের বাড়ি নিয়ে যা ত', লক্ষ্মী। বুঝলি, আবার যেন কিছু মনে না করে। পরে আমি থানায় গিয়ে একটা ট্রেসপাসের রিপোর্ট লিখিয়ে আসব।"

উমা এইবার কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া দেখিল, প্রদীপ বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটা ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁকে উঁকি দিতেছে। উমা হাসিয়া কহিল,—"এটা নিরিমিষ্যি রান্নার ঘর। দুপুর বারোটার আগে এর উনুনে আগুন দেওয়া হয় না। দেখছেন না বাইরে থেকে তালা-বন্ধ আছে?"

প্রদীপ দেখিল। কহিল,—"নমিতা তা হলে কোন্ ঘরে?" * দক্ষিণের দিকে আঙুল দেখাইয়া উমা বলিল,-"ঐ যে। আসুন আমার সঙ্গে। বৌদি এখন পূজোয় বসেছেন। পূজোয় বসলে কারু সঙ্গে আবার কথা কন না। টু-টি পর্যন্ত না। প্রায় দু' ঘণ্টা।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"দু' ঘণ্টা! বল কি? আমি কি দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তার এই নির্লজ্জ মৌনব্রতের তারিফ করব নাকি? আমার দু' সেকেণ্ডও সইবে না। চল।"

উমা অবাক হইয়া প্রদীপের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের সেই সৌম্য উদারসিগ্ধতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, চক্ষু দুইটা অনিদ্রায় তপ্ত, শাণিত—সমস্ত দেহ ঘিরিয়া এমন একটা রুদ্র রুক্ষতা যে, উমার মনটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল। প্রদীপ কহিল,—"নীচে একবার যাবে, উমা? দেখ ত', ওরা সত্যি সত্যিই পাহারওয়ালা ডেকে আল কিনা।"

উমা বোধ হয় এই ইঙ্গিতটুকু বুঝিল। তাহার কথার সুরে সুগোপন একটি অভিমান : "যাচ্ছি। কিন্তু বৌদি যে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন। তার ধ্যান ভাঙানো চলবে না, দীপ-দা। একদিন সামান্য একখানা চিঠি দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম বলে আমার অপ্রস্তুতের আর শেষ রইলো না। বেদি সারাদিন খেলেন না, চান করলেন না—সমস্তক্ষণ কেঁদে-কেঁদে ঘর-দোর ভাসিয়ে দিতে লাগলেন। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। তার ওপর এখন আর উপদ্রব না-ই করলাম আমরা। চলুন আমার ঘরে, আমাকে রাসে পড়াবেন। খানিক বাদে আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব।"

নমিতার ঘরের সম্মুখে তখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। দরজাটা ভেতর থেকে তেজানো—নিঃশব্দ, নিশ্বাসহীন। প্রদীপ কহিল, "উপদ্রবই চাই, উমা। ভালবেসে নয়, উপদ্রব করেই জড় অচল প্রস্তরকে দ্রব করা চাই। তোমার সেদিনকার উপদ্রবে সে উপোস করেছে, আজকে না-হয় আত্মহত্যা করবে। তবু সে কিছু একটা করুক।"

বলিয়া উমার কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রদীপ হাত দিয়া ঠেলা মারিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ধ্যানাসীনা তন্ময়ী নমিতা একবার চমকিয়া উঠিল, কিন্তু চোখ মেলিল না—সুকুমার মুখের উপর কোথা হইতে একটা অসহিষ্ণু অথচ অটল দৃঢ়তার তেজ ফুটিয়া উঠিল! দরজা খুলিয়া ফেলিয়া প্রদীপ এ কী দেখিতেছে! কয়েক মুহূর্তের জন্য সে পাথর হইয়া রহিল। নমিতা সদ্য-স্নান করিয়া পূজায় বসিয়াছে, সামনের দেয়ালে তাহার স্বামীর ফোটোটা হেলানো—চন্দনলিপ্ত, মাল্যবিভূষিত। বাঁ-পাশে পিতলের পিলসুজে একটা প্রদীপ, ধূপতিতে ধূনা জ্বলিতেছে—সমস্ত ঘরটি আচ্ছন্ন করিয়া একটি সুগভীর বৈরাগ্যের শীতল পবিত্রতা। নমিতার মাথায় ঘোমটা নাই, ভিজা চুলগুলি পিঠের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়া মেঝেটা স্পর্শ করিয়াছে—গায়ে বাহুল্যবস্ত্র নাই, একখানি নরম গরদের থান্ শাড়ি অযত্নে ন্যস্ত হইয়াছে। সর্বাঙ্গে পদ্মাভা, অমৃতগন্ধ! বসিবার সহিষ্ণু ভঙ্গিটিতে কি কঠোর সুষমা, অগ্নিশিখার মত শীর্ণ ও ঋজু শরীরে ব্রাহ্মমুহূর্তের আকাশ-শ্রী! প্রদীপ যেন তাহার চর্মচক্ষুতে পুৰাণবর্ণিতা তপস্বিনী শকুন্তলাকে দেখিতেছে—আদিম কবিতায় যে বিরহিণীর

মুর্তিকল্পনা হইয়াছিল, সেই শরীরী কল্পনা! তপস্যা-পরীক্ষিত প্রেম! এই মূর্তিকে সে স্পর্শ করিবে।

প্রদীপ কি করিয়া বসে তাহারই প্রতীক্ষায় উমা ঘামিয়া উঠিল। কানে-কানে বৌদিকে সংবাদটা দিবে কি না তাহাই সে বিবেচনা করিতেছিল। ভাবিয়াছিল এমন একটা সমাহিত ধ্যানলীন আননাভাসের প্রভাবে সে তাহার সমস্ত বিদ্রোহভাব দমন করিয়া তাহারই ঘরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু, বৃথা। প্রদীপ নমিতার মাথায় একটা ঠেলা মারিয়া দীপ্তকণ্ঠে কহিল,—"এসব কী করছ, নমিতা?"

নমিতা জ্বালাময় চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখিল তাহাতে ভয়ে তাহার আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল। কিন্তু আজ আর সে এই অনধিকার অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। উদ্যত শাসনের ফণা তুলিয়া সে কহিল, "আমার পূজোর ঘরে না বলে কয়ে' জুতে-পায়ে হঠাৎ ঢুকে পড়লেন যে। কে কী বলে তুমি এখানে নিয়ে এলে, ঠাকুর ঝি! জান না, এটা আমার পূজোর সময়?"

ফোটোটার সামনে নমিতা আবার একটা ঘট রাখিয়াছে, তাহার উপর আম্রপল্লবটি পর্য্যন্ত অম্লান। কোনো আয়োজনেরই ক্রটি ঘটে নাই। প্রদীপ জুতা দিয়া সেই ঘটকে লাথি মারিয়া উলটাইয়া ফেলিল : "কিসের তোমার পূজো? এই ভণ্ডামি তোমাকে শেখালে কে?"

উমা ভয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল-জলে সমস্ত মেঝে ভাসিয়া গিয়াছে। নমিতা খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে প্রদীপের এই হিংস্র বীভৎস মুখের দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে-চোখে সৌজন্যের স্বাভাবিক সঙ্কোচ নাই, উগ্রতেজ তাপসীর নির্দয় নির্লজ্জতা। সহসা সে সমস্ত শূন্য বিদীর্ণ করিয়া চেচাইয়া উঠিল : "কেন আপনি আমার ঘট ভাঙলেন? আপনার কী আস্পর্ধা যে ভদ্রমহিলার অন্তঃপুরে ঢুকে এই দস্যুতা করবেন? যাও ত' ঠাকুর ঝি, বাবাকে শিগগির ডেকে নিয়ে এস।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"সে-পার্টের মহল। নীচে একবার দিয়ে এসেছি। পুনরভিনয় হবে, হোক। যাও উমা, ডেকে আন। কিন্তু তোমার এই জঘন্য অধঃপতনের কারণ কি?"

উমা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া এক পাশে ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। না পারিল বাহির হইয়া যাইতে, না বা আসিল একটি অস্পষ্ট প্রতিবাদ।

—"অধঃপতন?" নমিতা আসন ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সুদূর তিমিরাকাশে নীহারিকার দিগবর্তিকার মত; "সেকৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দিতে যাব কেন? কে আপনি?"

—"আমি? অশুদ্ধ ভাষায় তোমারই কথার পুনরুক্তি করি—আমি ছাকাত।"

—"কিন্তু আমার উপর এই উৎপাত করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?"

—"অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, নমিতা। তাও অধিকার করতে হয়।"

—"সে-অধিকার কেড়ে নেবার ক্ষমতা আপনার আজো হয় নি।" কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ করিয়া সে কহিল,—"আমি আমি-ই। তার থেকে একচুল আমি ভ্রষ্ট হ'ব না।"

প্রদীপ বিহ্বল হইয়া কহিল,—"তোমাকে ধন্যবাদ, নমিতা'। কিন্তু তুমি সত্যিই তুমি নও। তুমি সংস্কারশাসিতা, অন্ধ-প্রথার একটা প্রাণহীন স্তুপমাত্র। নইলে এই সব অপদার্থ উপচার নিয়ে দেবতার পূজো করতে বসেছ?" বলিয়া উল্টানো ঘটটাকে আবার একটা লাথি মারিয়া সে দূরে দেয়ালের গায়ে ছিটুকাইয়া মারিল।

নমিতা কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। অনুপায় মিনতিতে সে প্রার্থনা করিল,—"দয়া করে আপনি এ-ঘর থেকে চলে গেলে বাধিত হব। আমাকে অযথা পীড়ন করে লাভ নেই।"

—"আমি এ-ঘর থেকে চলে যাবার জন্যেই আসিনি পীড়ন করে' লাভ নেই বটে, কিন্তু পীড়িত হওয়াতে লাভ আছে।"

নমিতা আবার চেঁচাইয়া উঠিল : "তুমি বাবাকে ডেকে নিয়ে এলে না, ঠাকুর-ঝি? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অপমান সইবো নাকি?"

উমা তবু নড়িল না। নমিতা সাময়িক বিমূঢ়তা বিসর্জন দিয়া বলিয়া উঠিল : "তবে আমিই যাচ্ছি নীচে।"

নমিতা যখন দুয়ারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রদীপ তৎক্ষণাৎ তাহার দুই বাহু বিস্তার করিয়া গাঢ়স্বরে কহিল,—"তুমি এই ব্যূহে প্রবেশ করবারই পথ জানতে, বেরবার কৌশল এখনো শেখনি। দাঁড়াও।"

বিদ্যুৎবিকাশের মত একটি ক্ষীণ মুহূর্তে দুইজনের স্পর্শ ঘটিয়াছিল। নমিতা আহত হইয়া সরিয়া গেল। প্রদীপের মনে হইল সে যেন হাতের মুঠোয় ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুকে ছুঁইতে পাইয়াছে। তাহার অমৃতস্বাদে সে স্নান করিয়া উঠিল।

নমিতা একেবারে ছেলেমানুষের মত আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

অবনীবাবুকে আর ডাকিয়া আনিতে হইল না। পেছনে শচীপ্রসাদও হাজির। দুয়ারের কাছে তাহাদের দেখা পাইতেই নমিতা কাঁদিয়া ফেলিল: "দেখুন এসে, ইনি আমার পূজার ঘরে

ঢুকে কীসব উৎপাত শুরু করেছেন। আমার ঘট উলটে দিয়েছেন, আর মুখে যা আসে তাই বলে আমাকে অপমান করছেন। আমি যত না। বলছি।

-"নিশ্চয়, নমিতা। এ তোমার অপমান নয়, আশীর্বাণী! কিসের জন্য তোমার এই তুচ্ছ পূজা? এই মালা কার গলায় দিচ্ছ?" বলিয়া সুধী-র ফোটোর গলায় ঝুলানো মালাটা টানিয়া সে টুকরাটুকরা করিয়া দিল : "কিসের এই ধূপধূনো? দিনের বেলায় কেন আবার আলো জ্বেলেছ? আকাশে চেয়ে সূর্য দেখতে পাচ্ছ না?" বলিয়া প্রদীপ লাথি মারিয়া-মারিয়া পিসুজ ধূপতি সব উলটাইয়া দিতে লাগিল।

নমিতা রাগে অপমানে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার আর সহিল না; তাহার মুখ রক্তপ্রাচুর্যে একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি মেঝে হইতে ঘটটা কুড়াইয়া আনিয়া প্রদীপের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুড়িয়া মারিল। হয় ত' সতী বলিয়াই তাহার সে-লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল না। প্রদীপের ডান ভুরুর উপরে কপাল ফাটিয়া আনন্দাশ্রুর মত রক্ত ঝরিতে লাগিল।

প্রদীপ যেন এতক্ষণ ধরিয়া এই আঘাতটিকেই কামনা করিতেছিল। নমিতার পরিপূর্ণ পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরেও এমন মাদকতা নাই। সে অন্তরের গভীর সুরে কহিল,—"তোমাকে নমস্কার, নমিতা। কিন্তু তোমার এই তেজ এই বিদ্রোহ সমস্ত পুরুষজাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আত্মঘাতী প্রথার বিরুদ্ধে, অভিমানী সমাজের বিরুদ্ধে। তোমার তেজের এই বলিষ্ঠ উলঙ্গ উজ্জ্বলতা সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করুক। আর পাহারাওয়ালা ডেকে কাজ নেই, শচীপ্রসাদবাবু।"

অবনীবাবু কহিলেন, "তোমার শাসন এখনো যথেষ্ট হয় নি! ভাল চাও ত' এখনো বিদায় হও বলছি।"

—"যাচ্ছি, কিন্তু অভিনয়ের শেষ অঙ্ক এখনো বাকি আছে।"

—"না, নেই।" বলিয়া অবনীবাবু হঠাৎ তাহার ঘাড় ধরিয়া ফেলিলেন।

প্রদীপ সামান্য একটু হাসিল : "সামান্য ঘাড়-ধরা থেকে ছাড়া পাবার জন্য যুযুৎসুর সোজা পাঁচ আমার শেখা আছে। কিন্তু আপনি মাননীয় গুরুজন, আপনাকে ভূপতিত করে' অপদস্থ করলে আমার মন খুসি হবে না।"

ভয়ে ভয়ে অবনীবাবু হাতের মুষ্টি শিথিল করিয়া দিলেন। শচীপ্রসাদ বলিয়া গেল : "আমি দিচ্ছি ফোন করে।"

প্রদীপ শান্তস্বরে কহিল,—“পুলিশ আসবার আগেই শেষ অঙ্ক শেষ করে ফেলি নমিতা। তুমি প্রস্তুত হও। তেমন কিছু ভয়ের কারণ নেই। আঘাতের পরিবর্তে স্নেহ দিতে হবে এ-শিক্ষা আমরা নতুন লাভ করেছি এ-যুগে। তোমাকে আমি ভালবাসি। কথাটার যদি কিছু অর্থ থাকে, তবে তার উচ্চারণেই আছে, অলস অনুভূতিতে তার প্রমাণ। নেই। এ-ভালবাসা তোমাকে জ্যোৎস্নালোকে শোনাবার মত নয়, স্পষ্ট দিনের আলোয় সমস্ত সমাজের মুখের ওপর প্রখর ভাষায় বলবার মত। তুমি ভারতবর্ষের প্রতিমা কি না জানি না, কিন্তু আমার আত্মার সহোদরা।”

উমা দেয়ালের দিকে পিঠ করিয়া একেবারে পাংশু হইয়া গিয়াছে। নমিতা তখনো ভয়ে উদ্বেগে থমথম করিতেছে—গায়ের বসন তাহার সুসন্নিবেশিত নাই, শ্বশুরকে দেখিয়াও সে মাথায় ঘোম্‌টা তুলিয়া দিল না,—সে হতচেতন, বিমূঢ়, স্পন্দহীন। প্রদীপকে তাহারই সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। এমন অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তে অবনীবাবু পর্য্যন্ত তাহাকে বাধা দিতে পারিলেন না।

যে-রক্ত আমার গৌরবের চিহ্ন হ’ল তাই তোমার কলঙ্ক হোক, নমিতা।” বলিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য প্রদীপ দুই বাহুর মধ্যে হঠাৎ নমিতাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। ঠিক চুম্বন করিল কি না বোঝা গেল না, আলিঙ্গনচু হইয়া নমিতা সরিয়া গেলে দেখা গেল প্রদীপেরই কপালের রক্তে তাহার মুখ, বুক একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। অস্বাভাবিক উত্তেজনার প্রাবল্য নমিতা আর সহিতে পারিল না, মুহমান অবস্থায় মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

প্রদীপ দুয়ারের দিকে হটিয়া আসিয়া কহিল,—“হয় ত’ এ-জীবনে আর দেখা হবে না, নমিতা। কিন্তু সংসারে লক্ষ-কোটি কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকবার অবকাশে এটুকু শুধু মনে করে’ সুখ পেয়ো যে তোমারই কলঙ্কের মূল্যে আরেক জন মহান্ ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে।” বলিয়া আর এক মুহূর্তও দেরি না করিয়া সে ডান-হাতে কপালটা চাপিয়া ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সিড়িতে যখন নামিয়াছে তখন উপর হইতে উমার কণ্ঠের ডাক শোনা গেল : “দীপ-দা, দাঁড়াও, মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ করে দি।”

প্রদীপ একবার উপরে চাহিল, কিন্তু একটিও কথা কহিল না।

প্রদীপ বড় রাস্তায় পড়িয়া

প্রদীপ বড় রাস্তায় পড়িয়াই ট্যাক্সি লইয়া কাছাকাছি একটা ডিসপেনসারিতে আসিয়া উঠিল। ডাক্তারটি পরিচিত। ট্যাক্সিভাড়াটা তিনিই দিয়া দিলেন যা হোক। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন আঘাত গুরুতর হইয়াছে। যে পরিমাণে রক্তক্ষয় হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য আনুষঙ্গিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন,—"বাড়ি গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকুন গে। সঙ্গে এই ওষুধটাও নিয়ে যাবেন।

ঔষধটা পকেটে পুরিয়া প্রদীপ পায়ে হাঁটিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার জন্যই সে মাথা পাতিয়া আঘাত নিয়াছে আর কি! কিন্তু ঘা-টার সুতীব্র যন্ত্রণা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। অজয়ও এমন করিয়া নমিতারই জন্য আঘাত নিয়াছে, কিন্তু সেটা আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা মাত্র, নমিতার নিজের হাতের পরিবেষণ নয়। অজয়ের আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা চোরের নীচতা আছে, কিন্তু এমন একটা সুপ্রবল দস্যুতার প্রমত্ততা নাই। প্রতিযোগিতায় সে-ই বোধ হয় বেশি লাভ করিল।

কিন্তু কেন যে তাহার মধ্যে হঠাৎ এই দুর্দাম চঞ্চলতা আসিল সে ইহা বুঝিয়া পাইল না। নমিতা যে আর কাহারো অন্তরের অন্তঃপুরে কায়াহীন কল্পনার মতও বিরাজ করিবে তাহাতেও প্রদীপের ক্ষমা নাই। সে হয় ত' নির্জনলালিত ভাবমূর্তিতেই নমিতাকে আস্বাদ করিত—তাহার সমস্ত কর্ম্মমুখর ব্যস্ততায় নিশীথরাত্রির স্বপ্নরঞ্জিনীর মত; তাহার এই বিশ্বাসও ছিল যে, যাহাকে এমন করিয়া কামনা করা যায় সে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক রীতিতেই প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিবে। কিন্তু অজয়ের ব্যস্ত আচরণে সে-প্রতীক্ষার অবিচল তপস্যা যেন সহসা ভাঙিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। সত্যকে ঘিরিয়া ভাবের যে কুজ্ঝটিকা ছিল তাহা মিলাইয়া যাইতেই প্রদীপের চোখে পড়ল নমিতাকে না হইলে তাহার চলিবে না। যেমন তাহার বুকের নিশ্বাস, পকেটের পাথেয়। হয় ত' নমিতার পক্ষে কোনো লৌকিক উপমাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাহাকে লাভ করিতেই হইবে। প্রেমকে মহত্তর করিতে গিয়া যাহারা প্রণামের সাধনা করে, প্রদীপের তত প্রচুর ধৈর্য্য নাই। তাহাকে ছিনাইয়া, কাড়িয়া, মূলচ্যুত করিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। পাওয়াটাই বড় কথা, রীতিটা অনর্থক। অজয় যতই কেননা নারীনিন্দুক হোক, ক্ষণকালের জন্য তাহার চোখে প্রদীপ নেশার ঘোর দেখিয়াছে—সে-নেশার পিছনে নিশ্চয়ই বঞ্চিত উপবাসী যৌবনের তৃষ্ণা ছিল। ছিল না? তাই ত' সে যাইবার সময় নমিতার পাতিব্রত্যের প্রতি এমন নিদারুণ কশাঘাত করিতে দ্বিরুক্তি করিল না। নমিতা তাহার কাছে একটা প্রতীক মাত্র, কিন্তু প্রদীপের কাছে সে প্রতিমার অতিরিক্ত, —প্রাণবতী, দেহিনী। তাহাকে তাহার চাই—ভোগে, বিরহে, কর্ম্মপ্রেরণায়, প্রদোষ-আলস্যে।

মনে পড়ে সেই রাণীগঞ্জে শালবনের তলায় তাহাদের দুই জনকে ফেলিয়া সুধী যখন ইচ্ছা করিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল, তখন সেই ঘনায়িত তিমিরবন্যার উপরে সে যে-দুইটি স্থির আঁখিপদ্মকে দুলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল তাহা তাহার সমস্ত কর্ম্ম-জগতের পারে দুইটি ক্ষুদ্র

বাতায়ন হইয়া বিরাট অ-দেখা আকাশকে উদঘাটিত করিয়া ধরিয়াছে। সে-দুইটি চোখই তাহাকে উদভ্রান্ত করিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু সেদুইটি চোখকে তুলিয়া আনিতে গিয়া নমিতাকে সে অন্ধ করিয়া আসিল বুঝি। কাড়িতে গেলেও পাওয়া যায় না এমন কোন্ রত্নের লোভে সে দিশাহারা হইল! অজয়ের হঠকারিতা তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল কেন? কিন্তু ঐ জড়স্তূপে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে আঘাত না করিয়াই বা কী উপায় ছিল!

সমস্ত দুপুরটা টো-টো করিয়া প্রদীপ সন্ধ্যাকালে এক রেষ্টুর্যান্টে ঢুকিয়া যা-তা কতগুলি গলাধঃকরণ করিল। এখন সে কোথায়। যাইবে? কতগুলি লোক লইয়া রাত্রিকালে সে নমিতাকে চুরি করিলেই ত' পারিত। দলের লোকেরা নারী-হরণের এই নিদারুণ প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না নিশ্চয়। মূখ। মাটির ভারতবর্ষের চেয়ে ঐ মাটির দেহটির মূল্য অনেক বেশি। দেশ সম্বন্ধে প্রতির আধিক্য ভাবাকুলতার একটা দুর্বল নিদর্শন মাত্র, তাহা প্রত্যক্ষ ও প্রখর নয় বলিয়াই প্রদীপের কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইল। তাহার চেয়ে নমিতার প্রতি তাহার এই প্রতি-নিশ্বাসের প্রেমে ঢের বেশি সত্য আছে। সব সত্যই সার্থক নয়। না-ই হোক। তবু এ সত্যকে সে আকাশের রৌদ্রের মত সমস্ত পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

অগত্যা মেসেই সে ফিরিয়া আসিল। সমস্ত গা ব্যথা করিয়া জ্বর আসিয়া গেল—মাথাটা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। কিন্তু অজয়ের মত সে পলাইয়া বাচিবে না, এই ঘরে সে আত্মহত্যা করিবে। দেশ স্বাধীন না হোক, তাহাতে তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না—তাহার চেয়েও বড় ব্যর্থতা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। একেবারে অপ্রয়োজনে এমন করিয়া সে প্রাণ দিবে— তাহাকে যে যতই ব্যঙ্গ করুক, তাহারা হৃদয়হীন, অমানুষ। সে রক্তের মাঝে অশ্রু দেখে, হত্যার অন্তরালে বৈধব্য। নিস্ফল কর্ম্মের পেছনে সে অতৃপ্তির হাহাকার শুনিতে পায়, প্রচেষ্টার পেছনে অভাবনীয় ব্যর্থতা। সে রাত জাগিয়া তারা দেখিয়াছে, ধূসর অতীতের কুয়াসায় বর্তমানকে ছায়াময় করিয়া তুলিয়াছে, নমিতার দুইটি শুষ্ক-শীর্ণ ঠোঁটের প্রান্তে তাহারই একটি পিপাসা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। তাহার জীবন ত' ভাগ্য-বিধাতা তাহার হিসাবের খাতায় বাজে-খরচের ঘরেই রাখিয়া দিয়াছেন—তাহার জন্য আবার জবাবদিহি কি? ঘরের মধ্যেকার পুঞ্জিত অন্ধকার যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে—এই তিমির-রাত্রির অবসান কোথায়? এই মেসের ময়লা বিছানায় শুইয়াই সে আকাশের জ্যোৎস্নায় গা ঢালিয়া দিয়াছে— সে-আকাশ সহসা এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া গেল নাকি? কোথায় তাহার বাড়ি-ঘর, মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন! কেহ নাই। কোথায় নমিতা!

প্রদীপ ঝট্ করিয়া উঠিয়া বসিল। না, আলো জ্বালাইতে হইবে না। কাহারো এখনো ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কাজটা এখনই সারিতে হইবে। এমন অকর্মণ্যকে নিজ হাতে মারিয়া ফেলার মত গৌরব কোথায়? প্রদীপ পকেটে বাঁ-হাতটা ডুবাইয়া দিল।

অমনিই দরজা ঠেলিয়া যদুর প্রবেশ। সে এমন বোকা, জ্বরের ঘোরে তাড়াতাড়িতে দরজাটায় পর্যন্ত খিল লাগায় নাই। যদু কহিল,

—"আপনার একখানা চিঠি এসেছে।"

—"চিঠি!" প্রদীপ আকাশ থেকে পড়িল,—তাহার ঠিকানা লোকে কি করিয়া জানিতে পারিবে? অজয়ের চিঠি নয় ত'? নতুন কোনো বিপদে পড়িল নাকি? কিন্তু বিপদে পড়িলেও তাহার ত' চিঠি লিখিবার কথা নয়। তাহাদের মধ্যে এখন কোনো সম্বন্ধের সূত্র রাখাও ত' আর সমীচীন হইবে না। প্রদীপ হাত বাড়াইয়া চিঠিটা নিয়া কহিল, "আলোটা জ্বালা ত' শিগগির। কী আবার ফ্যাসাদে পড়লাম।"

লণ্ঠনটা জ্বালাইতেই প্রদীপ চিঠিটার ঠিকানা দেখিল,—এমন হস্তাক্ষর পৃথিবীতে আগে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। তাহার মা নয় ত'? তিনি কি আজো বাঁচিয়া আছেন?

মোড়কটা খুলিয়া ফেলিতেই নীচে নাম দেখিল : নমিতা।

প্রদীপ চীৎকার করিয়া উঠিল : "এই চিঠি তোকে কে দিল? ধাপ্পাবাজ! আমার অসুখের সময় আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছিস?"

যদু কহিল,—"না বাবু, ইয়ার্কি করতে যাব কেন? পিওন এসে দিয়ে গেছে। আপনি তখন বাড়ি ছিলেন না।"

—"পিওন দিয়ে গেছে? আমি বাড়ি ছিলাম না! তুই বলছিস কি, যদু?"

পোষ্টাফিসের ষ্ট্যাম্প, দেখিয়া বুঝিল, সত্যই,—চিঠিটা ডাকেই আসিয়াছে। দু'টার সময়কার প্রথম ছাপ, এখানে পৌঁছিয়াছে সন্ধ্যা সাতটায়। তবু যেন প্রদীপের বিশ্বাস হয় না : "পিওন দিয়ে গেছে? তুই ঠিক জানিস? কেউ চালাকি করেনি ত'?"

—"কে আবার খামের মধ্যে বসে' চালাকি করতে যাবে?"

—"সত্যিই, কে আবার চালাকি করবে! চালাকি করে' কার বা কী লাভ? কে বা জানে এ-সব? কিন্তু শচীপ্রসাদ যদি চালাকি করে? ও, তুই তাকে কি করে চিবি? সে আবার আমার চুলের ঝু টি টেনে ধরেছিল। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। তুই বডড সময়ে চিঠিটা দিয়ে গেছি, যদু। নইলে শচীপ্রসাদকে শাসন না করেই যে কি করে মরতে যাচ্ছিলাম! হ্যাঁ, তুই যা। বডড জ্বর এসে গেল রে যদু। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাস দিকি। আর, লণ্ঠনটা তক্তপোষের ওপর তুলে দে।"

লণ্ঠনটা তুলিয়া দিয়া যদু জল আনিতে গেল। কিন্তু এত কাছে আলো পাইয়াও চিঠিটা পড়িতে তাহার সাহস হইল না, চিঠিটা হাতে নিয়া মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। একবার চোখ বুলাইয়াই সে দেখিয়া নিয়াছে পত্রটি একটি কণা মাত্র, সামান্য কয়েক লাইন লিখিয়াই শেষ করিয়াছে। কিন্তু এমন নির্মম আঘাত করিয়া কিতাহার এমন প্রয়োজন ঘটিয়া গেল। অনুতাপ করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে বুঝি। কিম্বা হয় ত' আরো ভৎসনা করিয়া পাঠাইয়াছে। তাহার জন্য আবার চিঠি কেন?

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রদীপ চিঠিটা পড়িয়া গেল :

প্রদীপবাবু,

এ-সংসারে আমার আর স্থান নেই। আত্মহত্যা করতে পারতাম বটে, কিন্তু মরুতে আমার ভয় করে। আর, এক মা ছিলেন, তিনিও বিমুখ হয়েছেন। এখন আপনি মাত্র আমার সহায়। এ বাড়ির বৌ হয়ে অবধি কোনদিন পথে বেরইনি, একা বেরুতে আমার পা কাঁপছে। আপনি আজ রাত্রি ঠিক একটার সময় আমাদের গলির মোড়ে অপেক্ষা করবেন—আমি এক-কাপড়ে বেরিয়ে আসব। তারপর আপনি আমাকে যেখানে নেবেন সেখানে যেতে আমি আর দ্বিধা করব। না। ইতি।

–নমিতা

যদু জল লইয়া আসিয়াছে; এক ঢোঁকে সবটা গিলিয়া ফেলিয়াও সে ঠাণ্ডা হইল না। যদুর হাতটা চাপিয়া কহিল,—"ঠিক বলছি, পিওন দিয়ে গেছে? গায়ে খাকির জামা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে ফেটি বাধা। ঠিক বলছিস?"

যদু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—"মিথ্যে বলে আমার লাত কি বাবু?"

—"না না, তুই মিথ্যে বলবি কেন? তুই কি তেমন ছেলে? তুই লক্ষ্মী, আর-জন্মে তুই আমার ভাই ছিলি। তোকে আমি আমার সব দিয়ে দিলাম।"

হাত ছাড়াইয়া নিয়া যদু কহিল,—"কী বলছেন বাবু? সামান্য একটা চিঠি এনে দিয়েছি—তাতে—"

-"তুই তার কিছু বুঝবি নে। লেখাপড়া তো কোনোদিন কিছু শিখলিনে, পরের বাড়িতে খালি বাসনই মাজলি। তুই যে একটি রত্ন, এ-কথা তুই নিজেই ভুলে আছিস। হ্যাঁ, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? এই সব—সব তোর। আর, আমার এমন কিছুই নেই যে তোকে দেওয়ার মত দিতে পারি। ঠিক বলছিস? পায়ে ফেটি বাঁধা, মাথায় পাগড়ি, গায়ে খাকির জামা—

ঠিক? তুই যখন দেখেছি তখন ঠিক না হয়ে পারে? তুই কি আর আমার সঙ্গে চালাকি করবি?"

যদু 'ছি' বলিয়া জিভ কাটিল।

প্রদীপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে : "সব তোকে দিলাম। সব তোর। নিতে হবে। কিছুই আর আমার দরকার নেই। সে ভারি মজা,

এই বিছানা-বালিশ বাক্স-প্যারা জামা-কাপড়—সামান্য যা-কিছু মানুষের লাগে—এক-এক সময় একেবারে লাগে না। কিছু দিয়েই কিছু হয় না। হ্যাঁ, তুই বিশ্বাস করছিস না বুঝি? এ আর এমন কি রাজ্য তোকে দিচ্ছি যে প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে আছিস। বোকাটা!"

যদু আমতা আমতা করিয়া কহিল,—"আপনার তা হলে কি করে' চলবে?"

—"আমার চলবে না রে পাগলা, চলবে না। আমার আবার আর চলাচলি কিসের? হ্যাঁ, আরেকটা কাজ তোকে করে দিতে হবে ভাই।"

-"বলুন।"

—"মোড় থেকে একটা রিক্স নিয়ে আয় দিকি, একটু বেড়াতে বেরুব।"

—"আপনার যে জ্বর। পড়ে গিয়ে মাথা যে আপনার ফেটে গেছে।"

-"দেখছি না চেহারাটা ভালুকের মত, জ্বরও ভালুকের। কখন যে আসে, কখন যে নেমে যায় ঠাহর করা যায় না।"

প্রদীপের গলার উপরে যদু স্বচ্ছন্দে হাত রাখিল। ভীত হইয়া কহিল,—"গা যে পুড়ে যাচ্ছে।"

প্রদীপ ঠাট্টা করিয়া বলিল,-"ওটা তোর হাতের দোষ। যা, রিক্স্ আন একটা। জলদি।"

—"বাইরে যে হিম পড়ছে বাবু।"

—"দুত্তোর হিম। বেশ ত ঠাণ্ডায় আবার জ্বর জুড়িয়ে যাবে 'খন। কোনোদিন ত' আর লেখাপড়া শিখলিনে, কিসে করে যে কী হয় তোর চোদ্দপুরুষও বুঝে উঠতে পারবে না। যা। তোকে গালাগাল দিলাম না ওটা! কী মূখের পাল্লায়ই যে পড়েছি! বেশ জোয়ান দেখে রিক্স আনবি। হা হা—জোয়ান রিস্।"

যদু চলিয়া গেলে প্রদীপ আবার নতুন সমস্যায় পড়িল। টাকা কোথায়? পকেটের বাইরে ও ভেতরে দুই দিকেই সমান দুইটা শূন্য। তবে? অবিনাশের কাছে গিয়া সাহায্য চাহিবে? এখন সে কলিকাতায় না কালিঘাট-এ তাহারই বা ঠিকানা কি? হ্যাঁ, যখন সে সব ছাড়িয়াছে, তখন তাহার টাকাও লাগিবে না। পাগল! সে একা নয়, সঙ্গে নমিতা। সে-কথা সে ভুলিয়া গেল নাকি? না না, ভুলিতে সে মরিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন মরিলেও সে ভুলিতে পারিত না। কিন্তু টাকা চাই। টাকার জন্য কোথায় সে প্রার্থী হইবে আজ? নমিতা মধ্যরাত্রিতে গলির মোড়টা একেলা আসিয়াই ঘুরিয়া যাইবে নাকি? বিশ্বাসঘাতক, প্রদীপ, চরিত্রহীন পাপিষ্ঠ। কুলনারীকে বাড়ির বাহির করিয়া সে আরামে বিছানায় শুইয়া জ্বর ভোগ করিতেছে। ছি! কিন্তু নমিতা নিশ্চয়ই সেমিজের তলায় টাকা নিয়া আসিবে। আনুক, তবু তার কাছ থেকে খরচ চাহিলে তাহার পুরুষগর্ব্ব ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে যে। হোক, যে সহচারিণী বন্ধু, তার কাছ থেকে এটুকু সাহায্য নিলে লজ্জা কোথায়? নমিতা কোথায় টাকা পাইবে? গায়ে তাহার একখানা গয়না পর্যন্ত নাই। সে-সব অবনীবাবুর সিন্দুকে নির্বাপিত মৃৎপ্রদীপের মত ঘুমাইয়া আছে। নমিতা সে-সিন্দুকের শক্তি কি করিয়া পরীক্ষা করিবে? না, না, টাকা চাই। কোনো দ্বিধা নাই, টাকা তাহাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

কি ভাবিয়া প্রদীপ দরজায় খিল দিল। একটা লোহার শলা ঢুকাইয়া সজোরে একটা চাড় দিতেই প্রতিনিধানের ট্রাঙ্কের তলাটা ফাঁক হইয়া গেল। সে চুরি করিতেছে, হ্যাঁ, সে জানে। চুরিই করিতেছে সে। উদ্দেশ্যবিচারেই মহত্ত্ব প্রমাণিত হো, রীতিবিচারটা বর্বর প্রথা। ভগবান আছেন। যে চোর, যে নারীহর্তা তার জন্যও ভগবান আছেন। প্রতিনিধানের কাপড়ের তলায় কতগুলি নোট।

দরজায় কে টোকা দিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল : "কে?"

—"আমি, বাবু। রিস্ এসেছে।"

—"এসেছে? বেশ জোয়ান রিক্‌স ত' রে?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে দরজা খুলিয়া দিল।

আর এক মুহূর্ত দেরি করিল না : "চল্লাম রে যদু।"

যদু কহিল,—"আর আসবেন না?"

–"না।" বলিয়া অন্ধকার সিড়ি দিয়া হোঁচট খাইতে খাইতে সে নামিতে লাগিল। উপর হইতে যদুর প্রশ্ন শোনা গেল : "দড়িতে টাঙানো আপনার ঐ সিল্কের জামাটাও আমার।"

—"হ্যাঁ, তোর। সব। গরদ তসর সিল্ক মট্‌কা মসলিন আপাকা —সব।"

রিক্সয় চাপিয়া প্রদীপ কহিল –“চল কাশিপুর।”

রিক্স-ওয়ালা অবাক হইয়া কহিল,—“সে কি বাবু? সে ত’ বহুদূর।”

—“আচ্ছা, আচ্ছা, উল্টোমুখো করে’ নে গাড়িটা। ভবানীপুর চল।”

—“সে ও ত’ ঢের দূর বাবু।”

-“তবে কি সাবু খেয়ে গাড়ি টানিস? নে, হেদোয় যেতে পারবি?”

ডাণ্ডা তুলিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্স-ওয়ালা টানিতে লাগিল।

প্রদীপ কহিল,–“বেশি মেহনৎ হলে আরেকটাতে চাপিয়ে দিস মনে করে। বুঝলি?”

একটা বাজিবার বহু আগে

একটা বাজিবার বহু আগে হইতেই প্রদীপ গলির মোড়ে প্রতীক্ষা করিতেছে। চিঠি পাইবার পর অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু এখনো যেন সে ভালো করিয়া কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছে না। যে নির্মম ঘৃণায় আঘাত করিতে পারে, সেই আবার কালবিলম্ব না করিয়া সহযাত্রিণী হয় এমন একটা চেতনায় প্রদীপ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের মনে এমন কি পারস্পরিক বৃত্তিবৈষম্য ঘটিতে পারে, ভাবিয়া প্রদীপের বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। ভয়ও করিতেছিল না এমন নয়। যতক্ষণ নমিতা শ্বশুরালয়ে স্থাণুর মত অচল হইয়া বসিয়া ছিল ততক্ষণ তাহাকে সংস্কার ও বুদ্ধি দিয়া আয়ত্ত করা যাইত, কিন্তু যখন সে সেই পরিচিত ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া একেবারে কূলপ্লাবিনী নদীর মত নামিয়া আসিল তখন তাহাকে যেন আর সীমার মধ্যে খণ্ডিত ও লাঞ্ছিত করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কোথায় একটা অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্যের বেসুর বাজিতেছে, অথচ এমন একটা খবরুদ্র বিদ্রোহাচরণের মাঝেই ত' সে তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল! কিন্তু এমন আকস্মিকতার সঙ্গে হয় ত' নয়। এই নিদারুণ অসহিষ্ণুতার মাঝে সেন কুশ্রী নির্লজ্জতা আছে। যে-বিদ্রোহ আত্মোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাহাতে সুষমা কোথায়?

অজয় হইলে হয় ত' লাফাইয়া উঠিত,নমিতাকে সঙ্গে নিয়া হয় ত' তখনই গলবস্ত্র হইয়া সমাজের উদ্যত খড়ের নীচে মাথা পাতিত! কিন্তু প্রদীপ নমিতাকে পরিপূর্ণ ও প্রগলভ জীবননাৎসবের মাঝখানেই নিমন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছে। নমিতাকে নিয়া তাহার তৃপ্তির তপস্যা, সৃষ্টির সমারোহ। সে তাহাকে নিয়া মরণের হলি খেলিতে চাহে নাই। কিন্তু যে-প্রেম দীর্ঘ প্রতীক্ষার অশ্রুসিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইল না, সে-প্রেম শরীরের একটা স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র, তাহার কোথায় বা লাবণ্য, কী-বা তার ঐশ্বর্য্য! সাহসিকা অভিসারিকার চেয়ে একটি সাশ্রলেখাননা বাতায়নবর্তিনী বন্দিনী মেয়ের মাঝে হয় ত' বেশি মাধুরী। কিন্তু এখন ইহা নিয়া অনুতাপ করিবার কোন অর্থ নাই। কেন যে সে কী আঘাত পাইয়া হঠাৎ উজ্জ্বল ঝড়ের আকারে নমিতা গিয়াছিল, কেনই বা যে নমিতা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াও পুনরায় পরাভূত হইল—ইহার কারণ নির্ণয় করিবারও সময় ফুরাইয়াছে।

রিক্স ছাড়িয়া নানা অলি-গলিতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া প্রদীপ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নায়ুগুলি শিথিল হইয়া আসিতেই সে নমিতার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের মধ্যে আর মাদকতার স্বাদ পাইল না'। তবু এখন রাস্তার মাঝখানে নমিতাকে একলা ফেলিয়া সরিয়া পড়িবার মার্জনা নাই। যখন পথে একবার পা দিয়াছে তখন তাহার পার খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

রাস্তা ক্রমে-ক্রমে পাতলা হইয়া আসিল। রাত্রির কলিকাতার স্তব্ধতার মাঝে উন্মুক্ততাব একটা প্রাণান্তকর বিশালতা আছে—এত বড় মুক্তির কথা ভাবিয়া প্রদীপের হাঁপ ধরিল। গলির মোড় হইতে অবনী বাবুর বাড়ির একটা হলদে দেয়াল অস্পষ্টাকারে চোখে পড়ে,

তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া প্রদীপ চক্ষুকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে লাগিল। এ কী —নমিতাই ত', সমস্ত গায়ে চাদর মুড়িয়া এদিকে অগ্রসর হইতেছে। আশ্চর্য, তাহা হইলে চিঠিটার মধ্যে এতটুকু অসত্য ছিল না? নমিতা তাহা হইলে নিতান্তই কলঙ্কের ডালা মাথায় লইয়া কূল ডিঙাইল! সে প্রদীপকে এতখানি বিশ্বাস করে! সে একবারো কি এই কথা ভাবে নাই যে, যে অমিতচারী উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব প্রদীপ অন্তঃপুরে ঢুকিয়া নির্লজ্জ ও কদর্য্য অভিনয় করিয়া আসিতে পারে, তাহার বিশ্বাস ঘাতক হইতেও দেরি লাগে না? কে জানে হয় ত' সে এই কথাই ভাবিয়াছিল : তাহার উপর যাহার এমন দুর্দমনীয় লুব্ধতা, সে নিশ্চয়ই এমন সোনার সুযোগ সহজে ফসকাইতে দিবে না, দুই লোলুপ বাহু মেলিয়া গলির মোড়ে ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিবে। হয় ত' সে প্রদীপের আগ্রহকে এমনি একটা কদর্থ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। পরস্পাপহরণই কি তাহার ব্যবসা নাকি? নমিতা তাহাকে কেন সন্দেহ করিল না? কে জানে, নমিতার না আসিলেই বুঝি ভালো হইত। একটা চিঠি লিখিয়া তাহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলে হয় ত' তাহার স্বর্গচ্যুতি ঘটিত না।

নমিতা সরাসরি প্রদীপের সম্মুখে হাঁটিয়া আসিল; কহিল, "কোথায় নিয়ে যাবেন, চলুন। গাড়ি ঠিক রেখেছেন?"

প্রদীপ ভালো করিয়া নমিতার মুখেব দিকে চাহিতে পারিতেছিল, তবু ক্ষণিক দৃষ্টিপতে যেটুকু আভাস পাইল তাহাতে সে স্পষ্ট বুঝিল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে-মুখ নিদারুণ বলাইয়া গিয়াছে। দিনের বেলাকার সেই প্রশান্ত ও গাম্ভীর্য্যগদগদ মুখোনি এখন নিরানন্দ শুষ্কতায় কুটিল ও কৃশ হইয়া গিয়াছে। কথায় পর্যন্ত সেই কুণ্ঠিত মাধুর্যের কণা নাই। সে আমতা আমতা করিয়া কহিল,—"গাড়ি-টাড়ি ঠিক নেই।"

নমিতা সামান্য বিদ্রুপ করিয়া কহিল,—"ভাবছিলেন বুঝি চিঠিতে আপনাকে একটা ধোকা দিয়েছি। মিথ্যা কথা সহজে আমি বলি না। চলুন, গাড়ি একটা পাওয়া যাবে হয় ত'।"

ক্লান্তস্বরে প্রদীপ কহিল,—"কিন্তু কোথায়ই বা যাবে?"

—"বাঃ, সে ত' আপনি জানেন। আমাকে আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন তার আমি কী জানি?"

প্রদীপ ম্লান চক্ষু দুইটি নমিতার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "সত্যি, কোথায় যাব তার আমি কিছু জানি না।"

নমিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল : "কিছুই জানেন না? এখন এ-কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না? তখন ঘটা করে আমার ঘরে গিয়ে যাত্রা-দলের ভীমের পার্ট করে এসে এখন শকুনি সাজলে চলবে কেন? চলুন, এগোই। এখানে দাঁড়িয়ে গবেষণা করবার সময় নেই।

খানিক বাদেই বাড়িতে তুফান লেগে যাবে। তখন মরবাররা আর মুখ থাকবে না। চলুন।" বলিয়া নমিতাই বড় রাস্তা ধরিয়া আগাইতে লাগিল।

পিছে পিছে দুই পা চলিতে চলিতে প্রদীপ কহিল,—"আমাকে ক্ষমা কর, নমিতা। তুমি বাড়িতেই ফিরে যাও।"

নমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সামনেই গ্যাস্পোসটটা, তাহার আলোতে সে-মুখের সব ক'টা রেখা নিমেষে দৃঢ় ও দৃপ্ত হইয়া উঠিল : "আপনি এত বড় কাপুরুষ? বাড়ির বাইরে টেনে এনে আবার তাকে বাড়িমুখো হবার পরামর্শ দেন কোন লজ্জায়? আর, ফেরবার পথ অত সহজ নয়। কিন্তু ঐ দেখুন, একটা গাড়ি যাচ্ছে। বোধ হয় খালি—ডাকুন না, দেখা যাক্।"

গাড়িতে উঠিলে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাব?",

প্রদীপ নমিতাকে প্রশ্ন করিল,—"কোথায় যেতে বলব ওকে? তোমার বাপের বাড়ি?"

—"বাপের বাড়ি! আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত্রে ওখানে ফিরে গেলে বাপের বাড়ির এয়োরা সব বরণডালা নিয়ে আসবে না। কোথায় যেতে বলবেন আমি কি জানি?"

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া প্রদীপ বলিল,—"চল শেয়ালদা।"

দুই জনে মুখোমুখি বসিয়াছে। নমিতা জালা দিয়া রাস্তার উপরে চলমান গাড়ির ছায়াটাই বোধ করি লক্ষ্য করিতেছিল, প্রদীপ একেবারে মূঢ়, স্পন্দহীন। শেয়ালদা হইতেই যে কোথায় যাওয়া যাইতে পারে তাহার কোনো কিনারাই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এসময় অজয়ের দেখা পাইলে মন্দ হইত না। সে সমস্ত সমস্যাই খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করিতে পারে, হয় ত' ভোর হইলেই সে নমিতাকে নিয়া একটা প্রকাণ্ড শশাভাযাত্রার আয়োজন করিয়া ফেলিত। কিন্তু নমিতা যদি আসিলই, তবে রূঢ় কোলাহলে সে যেন নিজেকে ব্যয় না করে, আকাশের দর্পণে সে তার আত্মার প্রতিবিম্ব দেখুকু।

প্রদীপ অনেকক্ষণ পরে কথা কহিল,—"তুমি এমন করে হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে, এ ভাবতেও পারিনি, নমিতা।"

নমিতা জানলা হইতে মুখ ফিরাইল না, কহিল,—"তবে কি ভাবতে পেরেছিলেন শুনি?"

একটু দম নিয়া প্রদীপ কহিল,—"ভেবেছিলাম মেরুদণ্ডের অভাবে চিরকাল তোমাকে সমাজের অচলায়তনে কুকড়েই থাকতে হবে।"

নমিতা ভিতরে মুখ আনিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল,-"এখন আমার মেরুদণ্ডটা বুঝি আপনার কাছে প্রকাণ্ড দণ্ড হয়ে উঠেছে, তাই আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে বলছেন। কিন্তু আমার

জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।” বলিয়া আবার সে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিল।

প্রদীপ কহিল,—“সংসারে কার জন্য কা’র ভাবনা করতে হয় কিছু লেখা থাকে না, নমিতা। তুমি আমার সঙ্গেই ত’ চলেছ। এ-যাত্রায় পৃথক্ ফল যখন কোনদিক থেকেই নেই, তখন ভাবনার অংশটা আমাকেও ত’ খানিকটা নিতে হবে।”

নমিতা সোজা হইয়া বসিল। ঘোমটার তলা হইতে কতকগুলি রুক্ষ চূর্ণকুন্তল মুখের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। সে দুইটি ঠোঁট ঈষৎ চাপিয়া কি-একটা কঠিন কথা সংযত করিয়া নিল। পরে স্পষ্ট করিয়া কহিল,—“আপনার সঙ্গে চলছি বটে, কিন্তু আপনার জন্যেই বেরিয়ে আসিনি, দয়া করে তা মনে রাখবেন।”

ম্লান একটু হাসিয়া প্রদীপ কহিল,—“সে-কথা আমাকে মনে না করিয়ে দিলেও চলত, নমিতা। বেরিয়ে যে এসেছ এইটেই আজকের রাতের পক্ষে সত্য, কিসের জন্য এসেছ সেইটে অবান্তর। আমার জন্য বেরিয়ে আসবে এমন একটা অন্যায্য অভিলাষের কলুষে তোমার এ বিজয়গর্ব্বকে আমি ছোট করতে চাইনে। কিন্তু এ যখন তোমার একারই দায়িত্ব তখন আমাকে আর গাড়ি করে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছ?”

নমিতা চোখের সম্মুখে বিপদ দেখিল। প্রদীপকে এত সহজে মোহমুক্ত করাটা ঠিক হয় নাই। সে হাসিয়া কহিল,—“আমি টেনে নিয়ে চলেছি মানে? আজকে সকালবেলা আমার পূজোর ঘরে কে ঘটোৎকচবধের পালা শেষ করে এলো? বক্তৃতায় পটু, কাজে কপট—এমন লোক দেশের কল্যাণ সাধন করবার অহঙ্কার করে কোন হিসাবে? কোনো রমণীকে কুলের বার করে এনে মাঝপথে তাকে ফেলে চলে যাওয়াটা বীরধর্ম্ম নয়। আপনি যেখানে যাবেন আমাকেও সেখানেই যেতে হবে।”

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এক রাতে সেই নির্বাককুণ্ঠিতা নমিতা মুখরভাষিণী হইয়া উঠিয়াছে। চোখে চটুলতা, কথায় বিদ্রুপ, ব্যবহারে পরম সাহস। তাহার সেই ধ্যানময় প্রেমগরিমা কোথায় অন্তর্হিত হইল! সেই তেজোদীপ্ত দৃঢ়তার বদলে এ কিসের তরলচাপল্য! তাহার বিদ্রোহাচরণে এমন একটা অপরিচ্ছন্নতা থাকিবে ইহা প্রদীপ কোনদিন বিশ্বাস করে নাই।

প্রদীপ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—“আমি ত’ মৃত্যু-অভিসারিক।”

নমিতা হাসিয়া বলিল,—“কবির ভাষায় আমিও তা হলে মৃত্যু স্বয়ংবরা।”

প্রদীপ গম্ভীর হইয়া কহিল,—“সত্যিই আমি মৃত্যুকে জীবনের মূল্য-নির্ধারক বলে স্বীকার করি না। আমি বাঁচতে চাই, পরিপূর্ণ ও প্রচুর করে’ বাঁচা।”

নমিতা হাসিয়া কহিল,—"এ আপনারই যোগ্য বটে। বিসংবাদী মনোভাব নিয়েই আপনি কারবার করেন দেখছি। একবার বলেন : বেরোও; বেরুলে বলেন : ফের। মন খারাপ হ'লে বলেন : মরব; মরবার সময় এলে গল্পের কাঠুরের মত বলেন : বাঁচাও। আমার উপায় নেই, আপনার কথায় সায় আমাকে দিতেই হবে। আপনি যদি বাঁচান, ত বাচব বৈ কি। বাঁচতে চাই বলেই ত' বেরিয়ে এলুম। মরলুম আর কৈ!"

নমিতার এতগুলি কথার মধ্যে একটি কথামাত্র প্রদীপ কুড়াইয়া লইল : "আমার সঙ্গে সায় দিতে হবে তোমার এমন কোনো চুক্তি আছে নাকি, নমিতা?"

—"না থেকে আর উপায় কি? আপনার সঙ্গেই যখন যেতে হচ্ছে।"

—"আমার সঙ্গে যাবার জন্যে ত' তোমার দিক থেকে কোনো আয়োজনই হয় নি, নমিতা। আমি তোমার সঙ্গে আছি এ তোমার জীবনের আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তুমি ত' আর সত্যি আমার জন্যেই পথে নাম নি।"

নমিতা কহিল,—"তা ত' নয়ই। সে-কথা বার বার বললে মানে উলটে যাবে না কখনই। আমি একলাই বেরুতুম, কিন্তু পুরুষ একজন সঙ্গে থাকলে কিছুটা আমার সুবিধে হবে ভেবেই আপনাকে চিঠি লিখেছি। আপনি আমার পথের অবলম্বন মাত্র, বিশ্রামের আশ্রয় নয়। সত্যভাষণের দীপ্তি যদি সইতে না পারেন, তবে নেমে যান গাড়ি থেকে, আমার আপত্তি নেই। যে-দেবতা আমাকে ডাক দিলেন, রাখতে হয় তিনিই আমাকে রাখবেন। মিছিমিছি আপনাকে ব্যস্ত করলুম হয় ত'।"

নমিতা জানার উপরে বাহুর মাঝে মুখ লুকাইল।

প্রদীপ কহিল, "তোমার মাঝে আমি মুক্তির মহিমা দেখছি, নমিতা—"

নমিতা মুখ না তুলিয়াই কহিল,—"এটা কবিত্ব করবার সময় নয়।"

—"জানি। নানা রকম বিপদের সঙ্গে আমাদের বুঝতে হবে, নানারকম সমস্যা। সমাজ, আইন, হৃদয়। সে-সবের মীমাংসা অহিংসামূলকই করে তুলব আমরা। দাঁড়াও, কথা আমাকে শেষ করতে দাও। তোমার চিঠি পেয়ে এ-কথা যদি একবার ভেবে থাকি যে, বেরুলেই তুমি আমার হৃদয়ের নিকটবর্তী হবে সেটা নেহাৎই আমার অন্ধতা। দুটো দেহের স্থানিক সান্নিধ্যই মিলন নয়, নমিতা। সেলুব্ধতা আমার ছিল কি ছিল না তেমন বিচার আগে থেকে করতে গিয়ে তুমি আমোক লাঞ্ছিত হ'য়ো না। ধরে' নাও আমি তোমার বন্ধু। তবে এখন বলতে তোমার দ্বিধা করা উচিত নয়—কেন তুমি এমন বিস্ময়কর কাজ করে ফেললে?"

নমিতা মুখ তুলিল। অন্ধকারেও স্পষ্ট মনে হইল সে কাঁদিতেছে। চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া সে কহিল,—"বিস্মিত আমিও নিজে কম হইনি, প্রদীপবাবু। কিন্তু বেরিয়ে না এসে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বসে' থাকবার মত অমানুষিক সতীত্ব আমার সইলো না। কুরুসতায় দ্রৌপদীও এতদূর লাঞ্ছিত হয়েছিলেন কি না মহাভারত লেখে না। আমার এতদিনকার স্বামিধ্যান কৃচ্ছ্রপালন সমস্তই আমার বৈধব্যের মতই নিস্ফল হ'ল। ভাবলুম, আপনার সেই হৃদয়হীন দস্যুতাই যখন আমার সকল অত্যাচারের মূল, তখন দায়িত্বও আপনারই। তাই আপনাকে চিঠি লিখলুম। যত বড় অমানুষই হোন না কেন, একজন ভদ্রনারীর করুণ আবেদন হয় ত' অগ্রাহ্য না-ও করতে পারতেন। তবু যদি রাস্তায় এসে আপনাকে না পেতুম, আমাকে সামনেই চলতে হ'ত, এগোবার সময় ফেরবার সমস্ত গতি নিবৃত্ত করেই বেরিয়েছি।" বলিয়া নমিতা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রদীপ কহিল,—"হৃদয়হীন সত্যিই আমি ছিলাম না, নমিতা। তবু যদি সন্দেহ কর এই বিদ্রোহাচরণে কোনো কল্যাণ নেই, তবে বল, গাড়ি ফিরতে বলি।"

কান্নার মধ্যেই কর্কশ স্বরে নমিতা কহিল,–"না।"

প্রদীপ কহিল,—"দায়িত্ব আমারই। ভেবেছিলাম, যাকে চাওয়া যায় তাকে পাওয়া যায় না, এ নিয়ম ঈশ্বরের মতই অবধারিত। কিন্তু জোর করে' যদি তাকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় তবেও ত' তাকেই পাওয়া হ'ল। স্তরভেদের সূক্ষ্মতাবিচার ভুলে গিয়েছিলাম, নমিতা। ভুল হয় ত' আমার ভেঙেছে, কিন্তু সময় যদি একদিন আসে, বুঝবে, সত্যিই আমি হৃদয়হীন ছিলাম না। আমি তোমাকে পাই না পাই, সংসারব্যাপারে এ একটা অতি তুচ্ছ কথা। তুমি তোমাকে পাও এই খালি প্রার্থনা করি। কিন্তু যাক্, গাড়িটা ষ্টেশনে ঢুকছে। বাকি রাতটা প্ল্যাটফর্মেই কাটাতে হবে। ভোর বেলা ট্রেনে চাব।"

ট্রেনে চাপিয়া কোথায় যাইবে এমন একটা কৌতূহলী প্রশ্নও নমিতার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহার মুখ আবার সহসা রুক্ষ ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। মুখের প্রত্যেকটি রেখা একটা আত্মঘাতী প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রদীপের প্রতি বীভৎস ঘৃণায় প্রখর হইয়া উঠিল। সে কহিল,—"দায়িত্ব থেকে আপনাকে আমি মুক্তি দিলুম—স্বচ্ছন্দে, অতি সহজে। আপনি বাড়ি ফিরে যান। প্ল্যাটফর্মে বা কোথায়। রাত কাটাতে হবে সে-পরামর্শ আমার চাইনে।" বলিয়া নিজেই গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিল,-"তোমাকে কত দিতে হবে?"

আঁচলের গেরো হইতে পয়সা বাহির করিতে আর হাত উঠিল না, গাড়ির ভিতরে হঠাৎ প্রদীপের আত্তকণ্ঠ শুনিয়া সে জালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার মাথার ব্যাণ্ডেজটা মুখের উপর নামিয়া আসিয়াছে এবং কপালের যে-জায়গাটা কাটিয়া গিয়াছিল সেই ক্ষতস্থান হইতে নূতন করিয়া রক্ত ঝরিয়া প্রদীপের জামা-কাপড় ভাসাইয়া দিতেছে। উদ্বিগ্ন হইয়া

নমিতা কহিল,—“ঈস! কি করে খুলে গেল ব্যাণ্ডেজ? আসুন, আসুন, নেমে আসুন শিগগির।”

প্রদীপ নড়িল না। নমিত। আবার গাড়িতেই উঠিয়া বসিল। বলিল,-“ঈস! এতটা কেটে গিয়েছিল নাকি? দাঁড়ান, চুপ করে’ থাকুন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।”

-“এখানে হবে না। চল, নামি।” বলিয়া প্রদীপ নমিতার বাহুতে ভর দিয়া নামিয়া আসিল।

—“ভাড়াটা আমিই দিচ্ছি।” প্রদীপ ব্যাগ খুলিল।

গাড়োয়ান চলিয়া গেলে প্রদীপ বলিল,-“ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। ভাল করে বেঁধে দাও, নমিতা।”

নমিতা বলিল,-“শুয়ে পড়ুন। কেমন করে’ খুললেন?”

প্রদীপ কপালে নমিতার আঙুল ক’টির স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে বলিল,-“কেমন আপনা থেকে খুলে গেল, নমিতা।”

ভোর বেলা দুইজনে চিটাগং-মেইলে চাপিয়া বসিল।

তুচ্ছ দেশ, তুচ্ছ সমাজ-সংস্কার! এতদিন সে বৃথাই অজয়ের সঙ্গে পল্লীর পঙ্কোদ্ধার-ব্রতে মত্ত ছিল। মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া চাঁদা কুড়াইয়া গ্রামে স্কুল বসাইয়াছে, এবং সে-স্কুল উঠিয়া গেলে দুই বন্ধু স্বচ্ছন্দে সরিয়া পড়িয়াছে। একটা বঞ্চিত ব্যর্থ বিকৃত জীবনের বোঝ। কাঁধে লইয়া সে এতদিন দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া মরিতেছিল কেন? নমিতার স্পর্শে তাহার আজ মুক্তিমান হইল। পুরোনো দিনের সেই খোলস তাহার এক নিশ্বাসে খসিয়া পড়িয়াছে, সে আজ কবি, আনন্দ-উদধি! সে নিজেকে সুন্দর করিবে; পৃথিবীকে সমৃদ্ধ, স্বপ্নরঞ্জিত! আজ তাহার নূতন করিয়া জন্মলাভ হইল,-নমিতা সেই বিস্মৃত অতীতের তীর হইতে একটি শুত সঙ্কেত লইয়া তাহার জীবনে আবিভূত হইয়াছে—প্রেমে, মঙ্গলাচরণে, কায়িককল্পনায়।

গাড়িটা নির্জন ছিল—একই বার্থে দুই জানালায় দুই জন ষ্টেশনের দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু কিছু একটা কথা না বলিলে এই স্তব্ধতা অতিমাত্রায় কুৎসিত ও দুঃসহ হইয়া উঠিবে। কিন্তু কী-ই বা বলিবার ছিল! নমিতা মুখাবয়ব এমন দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে, দুই চোখে তার এমন কঠিন ঔদাসীন্য, বসিবার ভঙ্গিটিতে এমন একটা দৃপ্ততা যে, কোমল করিয়া তাহার নামোচ্চারণটি পর্যন্ত প্রদীপের মুখে আর মানাইবে না। অথচ এমন একটি স্নিগ্ধ-করোজ্জ্বল প্রভাতের জন্য তাহার প্রার্থনার আর অন্ত ছিল না। সেই দিনটি এমন মৃত্যু-মলিন রাত্রির মুখোদ পরিয়া দেখা দিল কেন?

গাড়ি ছাড়িবার দেরি ছিল। প্রদীপ কহিল,—“তোমাকে একটা বই কিম্বা পত্রিকা কিনে এনে দেব?”

নমিতা অনুদ্বিগ্ন স্পষ্টতায় উত্তর দিল : “ইংরেজি বর্ণমালার পরস্পর সন্নিবেশের কোন মাহাত্ম্যই আমার কাছে নেই। আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।”

শেষের কথাটুকুর প্রখরতা প্রদীপের কানে বাজিল : “কিন্তু সারা পথ। তুমি এমনি বোবা হয়ে বসে থাকবে?”

নমিতা চোখ ফিরাইল না, একাগ্র দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মের উপরকার জনপ্রবাহের দিকে চাহিয়া কহিল,—“কথা বলবার লোক থাকলেই চলে না, কথা চাই। কিন্তু আমার জীবনে আবার কথা কী! সব কথা ফুরিয়ে গেছে।”

—“কিন্তু আমার অনেক কথা ছিলো।” —“কিছু দরকার নেই।”

প্রদীপ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে কহিল,—“কোথায়। যাচ্ছ জানতে তোমার একটুও কৌতূহল হচ্ছে না, নমিতা?”

নমিতা এইবার প্রদীপের মুখের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া ধরিল। সেই চক্ষু দুইটি অপ্রত্যাশিতের আশঙ্কায় স্তিমিত নয়, ভাবাবেশে গভীর নয়, উলঙ্গ তরবারির মত প্রখর। তাহার ঠোঁটের প্রান্তে মুমূর্ষ শশিলেখার মত একটি বিবর্ণ হাসি ভাসিয়া উঠিল। কহিল, —“যাচ্ছি যে সেইটেই বড়ো কথা, কোথায় যাচ্ছি সেইটে নিতান্ত অবান্তর।”

গাড়ি এতক্ষণে ছাড়িল। রাশীকৃত কোলাহল ক্রমে ক্রমে টুকরাটুকরা হইয়া এখানে সেখানে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়ি এখন মাঠের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রদীপ কহিল, —“কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে ত’ ঠাই নিতে হবে।”

নমিতার স্বরে সেই অনুত্তেজিত ঔদাস্য : “কিন্তু পৃথিবীতে কোনো জায়গাই মানুষের পক্ষে শেষ আশ্রয় নয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গেসঙ্গে জায়গাও বদলে যায়। তাই জায়গা সম্বন্ধে আমার কৌতূহলও নেই, আশঙ্কাও নেই। আমি সকল আশা-আশঙ্কার বাইরে। সেই আমার ভরসা।”

প্রদীপ কাছে সরিয়া আসিল : “তুমি এ-সব কী বলছ, নমিতা?”

নমিতা একটুও ব্যস্ত হইল না : “বলছি, আপনি যে-জায়গায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে ফের সরে পড়তে আমার দ্বিধা থাকবে না। আসবার যাবার দু’দিকের পথই আমার জন্য খোলা আছে। বুঝেছেন?”

জিজ্ঞাসাটুকুর মধ্যে শ্লেষ আছে। প্রদীপও ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেই অবলম্বন করে আশ্রয় খুঁজতে বেরুলে; এটার মধ্যেও ত' দ্বিধা থাকা উচিত ছিল।"

—"উচিত অনেক কিছুই ত' ছিল। উচিত ছিল স্বামী না মরা, উচিত ছিল স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যৌবন উবে যাওয়া। তার জন্যে আমার ভাবনা নেই। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলে আমার আর অনুশোচনা হয় না। আপনার সঙ্গে কেন বেরুলুম সেটা আপনিই ভেবে দেখুন না একবার।"

প্রদীপ কহিল,—"আমার ভেবে দেখাতে ত' কিছু এসে যাবে না। কিন্তু পাঁচ জনের মুখের দিকে ঘোমটা তুলে চাইতে পারবে ত', নমিতা?"

—"আপনার সঙ্গে কেন বেরুলুম সেইটে আপনি ভাল করে ভেবে। দেখেন নি বলে'ই পাঁচজনকে টেনে এনে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। আমি ত' আর আপনার জন্যে বেরিয়ে আসিনি।"

ম্লান হাসিয়া প্রদীপ বলিল,-"সে-কথা মুখ ফুটে না বললেও আমি ঠিক বুঝেছিলাম, নমিতা। আমার জন্যেই যদি বেরিয়ে আসতে, তা হলে তোমার তপস্যার তাপে পাঁচ জনের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব ঘটতে। তখন তুমি আপন সত্যে স্থির, আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকতে। আমার জন্যেও বেরুলে না, অথচ আমারই সঙ্গ নিলে, তোমার বাড়ির অভিভাবকরা এর সূক্ষ্ম রসটা আবিষ্কার করতে পারবে কি?"

নমিতা চোখের দৃষ্টিকে কুটিল করিয়া কহিল,—"বাড়ির অভিভাবকের রসবোধের অপেক্ষা রেখে ঘর ছাড়িনি—একথা ভুলে গিয়ে আমার চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করবেন না। তারা বুঝুন না বুঝুন, আপনি বুঝলেই যথেষ্ট। রাত একটার সময় সদর দরজা খুলে গুটিসুটি বেরিয়ে এসে পথের মাঝখানে আপনারই হাত ধরলাম, সংবাদটার মধ্যে যথেষ্ট মাদকতা আছে। সে-মাদকতায় আপনিই যাতে আচ্ছন্ন না হন সেই বিষয়ে আপনাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। কোনো দুর্বল মুহূর্তেই যেন এ ভেবে গর্ব অনুভব না করেন যে, আমি আপনার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েই আপনার বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমি বেরিয়েছি নিজের প্রেরণায়, নিজের দায়িত্বে—আপনি আমার পক্ষে একটা উপকরণ মাত্র, লক্ষ্য নয়। দয়া করে এ কথা মনে রেখে চলবেন আশা করি।" বলিয়া নমিতা একটা ঢোঁক গিলিল। তাহার উত্তেজনা এখনো শান্ত হয় নাই। জিত, দিয়া ঠোঁট দুইটা ভিজাইয়া আবার সে কহিল,—"আমার স্বামীর ফোটোটা আপনি ভেঙে দিয়ে এসে। আমার বিপ্লবের সমস্ত মাহাত্ম্য নষ্ট করে দিয়েছেন। ভেবেছিলাম আমিই একদিন ওটাকে ভেঙে-চুরে ছিড়ে-ছিড়ে কুটি-কুটি করে' ফেব। মিথ্যাচারকে আর কত দিন প্রশ্রয় দেওয়া চলে?"

প্রদীপের মুখ দিয়া বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি বাহির হইবার আগেই নমিতা কহিল,—“হাঁ, মিথ্যাচারই ত। সত্যকে পাব ভেবে যে-নিষ্ঠাকে যত মহৎ করেই দেখি না কেন, তার মধ্যে নিত্যের দেখা না পেলেই দারুণ ঘৃণা ধরে যায়। সেই ঘৃণা প্রকাশ করবার দিনের নাগাল আজ পেয়েছি আমি।”

ঘোমটার তলা হইতে বিপর্যস্ত চুলগুলি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া নমিতা খোপা বাধিতে বসিল।

গাঢ়স্বরে প্রদীপ কহিল,—“তোমার সান্নিধ্যের মাদকতায় আমি অবিচল থাকবে, আমার ওপর তোমার এ-বিশ্বাস এলো কি করে? তুমি সাবধান করে দিলেই যে আমার স্নায়ুমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত নিস্তেজ হয়ে থাকবে আমার ভালবাসাকে তুমি এতটা হীন ও দুর্বল করে দেখবার সাহস কোথা থেকে পেলে, নমিতা?”

অথচ কথার সুরে মিনতি ঝরিতেছে। নমিতা স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রদীপের মুখের দিকে চাহিল। সে-মুখে সহসা উষাভাসের লাবণ্য আসিয়াছে, নমিতা চোখ ফিরাইতে পারিল না। প্রদীপ আবার কহিল,—“তার চেয়ে তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কিম্বা তোমার যদি আর কোনো আত্মীয়-স্বজন থাকে, ঠিকানা বল, তোমাকে সেখানে রেখে আসি। আমার সঙ্গে তুমি এসো না। আমি নিষ্ঠুর বলে’ বলছি না, আমি লোভী; আমার রক্ত খালি তপ্ত নয়, পিপাসিত। সমাজের কলঙ্কভাজন হতে আমার অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু তোমার কাছে আমি কালো হতে পারবো না। আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না, নমিতা।”

নমিতা স্থির শান্ত কণ্ঠে কহিল,—“আমি আপনাকে খুব বিশ্বাস করি।”

—“না, আমার ললাভের সীমা নেই, নমিতা। না না, সে তুমি বুঝবে না।”

—“আমি খুব বুঝি।”

—“বোঝ না। তোমাকে পাবার জন্যেই আমি দস্যু সেজেছিলাম। খালি প্রার্থনার মধ্যে পেতে হবে কেন, সংগ্রামের মধ্যেও লাভ করা যায়। তোমাকে আমি কেড়ে ছিনিয়ে নেব এই প্রতিজ্ঞায় আমার হাতের মুঠো দু’টো কঠিন হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে কোনোদিন পাব না জানলে এমন পিপাসাকে প্রশ্রয় দিতাম না।”

নমিতা ধীরে কহিল,—“আপনার এ-অস্থিরতা দেখে আমারই ভারি লজ্জা করছে। কোনো মেয়ের কাছে পুরুষের এই নাকি-কান্নার মত বীভৎসতা পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। আপনি যা বলেন বলুন, আমি আপনারই সঙ্গে যাব। যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে, অপ্রতিবাদে, যে কোনো সর্ব্বনাশে। নিন, ধরুন আমার হাত।” বলিয়া নমিতা তাহার আঁচলের তলা হইতে একটি শুভ্র শীর্ণ হাত বাড়াইয়া দিল।

প্রদীপ তাহা ছুইতেও পারিল না। যেন আগামী জন্মে চলিয়া আসিয়াছে এমনই একটা অভাবনীয়ের চেতনায় সে খানিকক্ষণ বিমূঢ় হইয়া রহিল। সেই অতটুকু নমিতা এত শীঘ্র এমন করিয়া বলাইল

কিসে? তাহার মেরুদণ্ড কয়েকদিনেই কঠিন দুর্নমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। হাত বাড়াইয়া দিবার ভঙ্গিটিতে কী তেজস্বিতা! এত নিভৃতে নিকটে রহিয়াও তাহার স্বাতন্ত্রের মর্যাদাটুকুকে সে সন্দেহে দুর্বল, আশঙ্কায় নিষ্প্রভ করিয়া তুলে নাই। হাসিয়া কহিল, —"আপনি ত' আমার বন্ধু, দেখি, আপনার হাত দিন।"

প্রদীপ একটিও কথা কহিতে পারিল না, আস্তে তাহার হাতখানি অসীম ভীরুতায় প্রসারিত করিয়া দিল। নমিতা তাহা স্পর্শ করিয়াই ছাড়িয়া দিল না; কহিল,—"এক দিনেই আমার জন্মদিন আবার ঘুরে এল, এবং এ-জন্ম মনে হচ্ছে পৃথিবীতে নয়, আকাশে। আপনার লোভকে আমি ভয় করব ভাবছেন? কেন, আমি জয় করতে পারি না?" একটুখানি হাসিয়া আবার কহিল,—"আপনার লোভ আছে, আমার দুর্গম দুর্গ নেই? আপনি আক্রমণ করতে পারেন আর আমি আত্মরক্ষা করতে পারি না?"

না, পার না—প্রদীপ ইচ্ছা করিলেই ত' ঐ তপঃশীর্ণা দেহলতাকে তাহার বুকের উপর দলিত করিয়া ফেলিতে পারে। ঐ ভুরু, নাক, ঠোঁট —আভরণহীন দু'খানি রিক্ত বাহু,— সমস্ত কিছু সে অজস্র অজস্র চুম্বনে সোনা করিয়া দিবে। কিন্তু নমিতার চারিদিকে এমন একটা অব্যাহত কাঠিন্য, এত কাছে বসিয়াও চতুর্দিকে সে একটা দুরতিক্রম্য দূরত্ব বিস্তার করিয়া আছে যে, প্রদীপ একটি আঙুলও নাড়িতে পারিল না। নমিতা কহিল,-"তা হলে আপনি যে ঘটা করে' অতসব বক্তৃতা দিয়ে এলেন তা শুধু আমাকেই লাভ করতে, আমাকে মুক্ত করতে নয়?"

প্রদীপ হাত সরাইয়া নিয়া কহিল,—"তার মানে?"

—"তার মানে, আপনার সঙ্গে আমার যদি আইনানুমোদনে বিধবাবিবাহ হত, তা হলে স্বচ্ছন্দে আবার আমাকে দাসী বানিয়ে ফেলতেন। অর্থাৎ, আমি যদি কোনোদিন কোনো ছুতোয় খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়তে পারি, বিশ্রামের জন্য আবার যেন আপনারই শাখায় এসে বসি—এই আপনার কামনা ছিল?"

প্রদীপ কহিল,—"ছিল, নমিতা। কিন্তু অমন রূঢ় উপমা প্রয়োগ করো না। একদিন এই সব নিষ্ফল পূজোপচার দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে তুমি ব্যক্তিত্ব-পূজায় বরণীয় হয়ে উঠবে এই কামনা করে তোমার জন্য আমি একটি প্রতীক্ষার বাতি জ্বেলে রেখেছিলাম। যে অসীম-

শূন্যচারী পাখী চলার বেগে খালি চলে, থামে না, তার বেগের মাঝে একটা ক্লান্তির কদর্যতা আছে।”

নমিতা হাসিয়া কহিল,—“এও আপনার রূঢ় উপমা। জানেনই ত’ বড় বড় কথা আমি বুঝি না। দুর্বোধ্য হবার জন্যেই যেসব কথা বড় বলে’ বড়াই করে সেগুলোকে আমার অত্যন্ত বাজে মনে হয়।”

দুই জনে আবার চুপ করিয়া গেল। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের শেষে অবনত আকাশের অজস্র প্রসারের পানে চাহিতে-চাহিতে নমিতার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার অসঙ্কোচে ভাবগগদ স্বরে কহিল, —“কী সঙ্কীর্ণ সংসার থেকে এই প্রচণ্ড পৃথিবীতে এসে উত্তীর্ণ হলাম, তার জন্যে আপনাকে আমার বহু ধন্যবাদ।

প্রদীপের বিস্ময়ের অবধি নাই : “আমাকে?”

–“এই উন্মুক্ততার স্বপ্ন আমাকে আরেকজন দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার বিদ্রোহ একটা ঝড়ের আকারে আমার ঘরে ঢুকে আমার আরাম ও আলস্য, স্থিরতা ও স্থবিরতা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিলে। আপনার আচরণে যতই কেন না একটা অপরিচ্ছন্নতা থাক্, সেঅসহিষ্ণুতার মাঝে শক্তি ছিল, তেজ ছিল। তাই আপনাকেই সঙ্গী করলাম।”

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আবার কহিল,—“আমি যে সমাজের প্রতি কী অমানুষিক বিদ্রোহাচরণ করলাম তা আপনিও বুঝবেন না।”

প্রদীপ অনিমেষ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নমিতা কহিল,-“ঐহিক বা পারত্রিক কোনো লোভের বশবর্তী হ’য়েই এই বিরুদ্ধাচরণ করিনি। লোকে যতই কলঙ্ক দিক্, আমার ভগবান তা শুনবেন না। আর, আমি তারই সঙ্গ নিলাম, যার দুর্ধর্ষ আচরণে সমস্ত সংসারের কাছে আমার মুখ অপমানে ও লজ্জায় কালো হয়ে উঠল।”

–“মানুষের মনোরাজ্যের এমন একটা অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা আমার কাছেও ভারি অদ্ভুত ঠেছে, নমিতা। যার প্রতি তোমার বিদ্বেষ ও রাগের অন্ত থাকা উচিত নয়, এবং এখনো যার প্রতি তুমি মৌখিক শিষ্টাচারের একটা কৃত্রিম আবরণ মাত্র মেনে চলুছ, তোমার এই দুর্দিনে তাকেই তুমি সাথী নিলে, এটার রহস্য সত্যিই রোমাঞ্চকর, নমিতা।”

নমিতা দৃঢ় হইয়া কহিল,—“না, এটার মাঝে অবাস্তব উপন্যাসের কোনো ইন্দ্রজালই নেই কিন্তু। আমার আচরণটা কোষমুক্ত অসির মতই স্পষ্ট। আপনাকে আগেই বলেছি বেরিয়ে আসাটাই আমার কীর্ত্তি, তার নিমিত্তটা অশরীরী। কিন্তু সংসারে আপনাকে নিয়েই আমার

দুর্নাম, আপনাকে দিয়েই আমার উৎপীড়ন,—ভাবলাম এমন কীর্তিসঞ্চয়ের দিনে আপনিই আমার উপযুক্ত সহচর। শুধু সমাজ নামে ঐ বধির শাসনস্তূপটা নিজের দাহে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যাক্, সেই আনন্দেই আপনার সাথী হলাম, আপনার কামনার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করবার জন্যে নয়।"

মুগ্ধ হইয়া প্রদীপ কহিল,—"এত কথা তুমি শিখলে কোথা থেকে?"

নমিতা হাসিয়া কহিল,—"এ সব ভাবলেশহীন অসার বক্তৃতা নয় যে, বই বা খবরের কাগজ থেকে মুখস্ত করে এসে চেচিয়ে লাফিয়ে সবাইকে চমকে দেব। এ আপন আত্মার কাছ থেকে গভীর করে জানা, আপন অন্তরের খনি খুঁড়ে এ-মণি আবিষ্কার করতে হয়। তাই এশিক্ষা পেতে দিন-ক্ষণ পাজি-পুথি লাগে না, একটি মুহূর্তস্থায়ী বিদ্যুৎ বিকাশে সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আপনাকে বাহন করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার সমাজকে শাসন করা। তদতিরিক্ত কোনো মূল্য আপনাকে আমি দিতে পারছি না।"

প্রদীপ তাহাকে বিরত করিয়া কহিল,—"মুক্তি তুমিই খালি লাভ করনি, নমিতা, আমিও। তুমি তোমার আচরণের মুক্তি, আমি আমার অন্তরের স্বাধীনতা। আপন আত্মার কাছ থেকে আমিও গভীর করে সত্য শিখে নিলাম, নমিতা, এক মুহূর্তে, চোখের একটি দ্রুত পলক-পতনের আগে। সঙ্কীর্ণ অচলায়তন ছেড়ে আজ আত্মোপলব্ধির পথ পেলাম।"

নমিতা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে কহিল,-"আপনার জীবনের এই সব উত্তেজিত মুহূর্তগুলিকে আমি ভয়ানক সন্দেহ করি। এই অন্ধ উত্তেজনাই হচ্ছে সত্যিকারের ম্রিয়মাণ।"

—"নয়, নয়, তা নয় নমিতা। আমি খালি সংগ্রাম করব এউত্তেজনা যেদিন লাভ করেছিলাম সেদিন আমার কবিত্বের, আমার আত্মবিকাশের সমস্ত বাতায়ন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা একটা উগ্র নেশা মাত্র ছিল, হোলি-খেলার উৎসব জমাতে গিয়ে হিন্দুস্থানিরা যেমন মদ খায়। সেটাতে সৃষ্টির উত্তেজনা ছিল না, স্নায়ুকে সে সহিষ্ণু করে না, সেতারের তারের মত সঙ্গীতময় করে তোলে না। কিন্তু আমিও যে একদিন রাত্রির আকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপিন অস্তিত্বের প্রসারতা বোধ করেছিলাম সৃষ্টির প্রেরণায়, সে-সত্য আজ আবার তোমাকে কাছে পেয়ে উদঘাটিত হ'লনমিতা। সমস্ত ভুল আমার ফুল হয়ে বিকশিত হ'ল। আর আমি সৈনিক নই, স্রষ্টা। বুঝলাম, জোর খাটালেই লাভ করা যায় না, তপস্যা চাই। যে-জিনিস সাধ করে হাতে আসে না নমিতা, তার মধ্যে স্বাদ কই?" বলিয়া প্রদীপ হঠাৎ নমিতার দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

নমিতা হাত সরাইয়া নিল না। তেমনি উদাসীন নির্লিপ্তের মত কহিল,—"আপনার এমন স্নায়ুদৌর্বল্যের খবর পেয়ে আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই আর আপনাকে ক্ষমা করবেন না।"

প্রদীপ ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল,-“কে? অজয়?”

নমিতা অস্ফুট স্বরে কহিল,-“হাঁ; তিনি আপনাকে ভাববিলাসী, অকর্মণ্য বলে’ ঘৃণা করবেন।”

তাড়াতাড়ি নমিতার হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রদীপ উত্তেজিত হইয়া কহিল,-“কেন, পদে পদে আমি ওর প্রতিবিম্ব হয়ে থাকূব আমাকে সৃষ্টি করবার সময় বিধাতা এমন চুক্তি করেছিলেন নাকি? মানুষের বিশ্বাসেরও সীমা থাকা উচিত। তার জন্যে সমস্ত বিশ্বকে সঙ্কীর্ণ করে’ রাখতে হবে আত্মার এমন খর্ব্বত। আমি সহ্য করবো না। নতুন সত্যের আলোকে পুরাননাকে পরিষ্কৃত করে নেব না, আমার এমন অন্ধ অনেদার্য নেই। বহু-বৈচিত্র্যের আস্বাদে যে বদলায় না, তাকে আমি জীবন্মত বলি, নমিতা। অজয়ের ক্ষমা না-ক্ষমায় আমার কিছু এসে যায় না। তার সত্য তার, আমার আমার। তার পথ থেকে আমি সরে এলাম। আমি একা, আমি নবীন।”

নমিতার ঠোঁটের কিনাবে সামান্য একটি ধারালো হাসি ফুটিয়া উঠিতেই প্রদীপ কথা থামাইল। নমিতা কহিল,—“বদলানোতে আপনার বাহাদুরি আছে। কিন্তু সে-কথা থাক্। আমাকে নিয়ে এখন কি করতে চান?”

প্রদীপ খুসি হইয়া উঠিল : “আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও বল?”

নমিতার মুখ গম্ভীর; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “দেখা যাক।”

একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামিল। প্রদীপ উঠিয়া পড়িয়া কহিল, “তখন থেকে খালি বাজে কথা বলে চলেছি। তোমার মুখ শুকিয়ে। গেছে একেবারে। দেখি ষ্টেশনে কিছু ফল-টল কিনতে পাই কি না।”

নমিতা বাধা দিয়া কহিল,—“আমার জন্যে অকারণে ব্যস্ত হবেন না। শরীরকে আমি স্বচ্ছন্দে শাসন করতে পারি।

কথায় এমন একটা তেজোদীপ্ত দৃঢ়তা যে প্রদীপের পা দুইটা অচল হইয়া রহিল।

গাড়ি আবার চলিয়াছে।

ম্লান মেঘনার তীরে

ম্লান মেঘনার তীরে অখ্যাত একটি পল্লীতে প্রদীপের একখানি নির্জন কুটির ছিল। চারিপাশে অজস্র শ্যামলতায় গ্রামবধূব প্রগল্ভ নির্লজ্জতা দেখিয়া নমিতা মনে মনে পরম তৃপ্তি পাইল। এমন একটি উন্মুক্ত অবারিত শান্তির জন্যই তাহার তৃষ্ণার অবধি ছিল না। মাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইলে আকাশের দর্পণে আত্মার ছায়া পড়ে নিজের বিরাট সত্তার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে। এমন একটা মহান মুক্তির স্বাদ হইতে সে এতদিন বঞ্চিত ছিল। মানুষের ভবিষ্যৎ যে কত সুদুরবিস্তৃত, কত বিচিত্রপরিণামময়—নমিতার চারিদিকে যেন এই সুস্পষ্ট সঙ্কেতটি সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ কহিল,—"নদীর এ ধারটা একেবারে ফাঁকা; ওধারে কতকগুলো বাগদিপাড়া আছে। তুমি স্বচ্ছন্দে স্নান করে' এস, আমি পাহারা দিচ্ছি।"

নমিতা হাসিয়া কহিল,—"যদি জলে ভেসে যাই, তবে আপনার পাহারায় কি আর সুফল হবে? তার চেয়ে চলুন, দু'জনে বাগদিপাড়াটা ঘুরে আসি না-হয়।"

প্রদীপ কহিল,—"যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে; কাল সকালে যাওয়া যাবে'খন।"

কথার সুরে যেন শাসনের আভাস আছে। নমিতা একটু। হাসিল মাত্র।

গ্রামেই মথুর দাস প্রদীপের একসঙ্গে ভাই ও ভৃত্য। সে আসিয়া বিছানা-পত্র হাঁড়ি-কুড়ি লোক-জন সমস্ত নিমেষে জোগাড় করিয়া দিল। রাত্রে নমিতার যদি ব্যাধিতে কষ্ট হয়, তবে একটি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকেও সে ডাকিয়া আনিতে পারিবে। প্রদীপ মথুরের বাড়িতেই পাত ফেলিবে যা হোক।

প্রদীপ কথাটা পাড়িল। নমিতা রুখিয়া উঠিল,—"বিধবারা আবার রাত্রে গেলে নাকি? এটা কোন দেশের বিধান?"

প্রদীপ কহিল,—"কিন্তু আজ সারা দিন তুমি এক ফোটা জলও মুখে তোলনি, রাত্রে খেলে তোমার অধর্ম্ম হবে না।"

নমিতা স্পষ্ট করিয়া কহিল,—"কিসে আমার ধর্মাধর্ম হবে সে-পাঠ আপনার কাছ থেকে না নিলেও আমার চলবে। মনে রাখবেন, আমি বিধবা, ব্রহ্মচারিণী।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"এই তেজটা এতদুর না এসে শ্বশুরালয়ে দেখালেই ভালো মানাত। ফের নিয়ে যাব সেখানে?"

শেষের কথাটার মধ্যে এমন একটা কদর্য্য ঝাঁজ ছিল যে নমিতার সহিল না। সে কহিল,—"কোথায় যেতে হবে না হবে সে-পরামর্শ আপনার না দিলেও চলবে। পারে এসে নৌকো আমি পায়ে ঠেলে জলে তলিয়ে দিতে পারি যে কোনো মুহূর্তে।"

প্রদীপ ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—"আর নৌকো যদি ঝড়ের সময় তোমাকে না ডুবিয়ে বরং নিরাপদে পারেই পৌঁছে দেয় তবে তাকে ধন্যবাদ দিয়ো। দয়া করে মনে রেখো তুমি আমার অধীনে, এখানে তোমার এতসব বৈধব্যের আস্ফালন চলবে না।"

নমিতার অধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল; কহিল,—"আপনিও দয়া করে মনে রাখবেন আপনার অধীনে আসবার জন্যেই আমি এত আড়ম্বর করি নি। আপনার অধীনতায় বিশেষ মাধুর্য কোথাও নেই। এখন যান, যেখানে আপনার কাজ আছে। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

প্রদীপ কহিল,—"যথেষ্ট ব্রহ্মচর্য দেখিয়েছ, নমিতা। একজন পুরুষকে ধাওয়া করে এতদূর নিয়ে এসে তারপর তার স্পর্শ থেকে সঙ্কুচিত হয়ে থেকে নিজের সতীত্ব ফলাচ্ছো, এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই।"

নমিতা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"যা, যান, শিগগির এ-ঘর ছেড়ে চলে যান। যা শিগগির।"

ঋজু শীর্ণ দেহ যেন অগ্নিশিখা, বাহুটি বিদ্যুৎবর্তিকার মত প্রসারিত, মুখমণ্ডলে রক্তচ্ছটা। প্রদীপের বলিতে সাহস হইল না : এ ঘর-বাড়ির মালিক আমি, আমাকে ঠেলিয়া ফেলিলেই দূর করা যায় না। এ ঘরে আমার অপ্রতিহত অধিকার, তুমি আমার বন্দিনী; আমাকে ছাড়িয়া যাইবার তোমার পথ কোথায়?

সে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই যে নমিতা দুয়ার দিল—পরদিন ভোর না হইলে, আর সে বাহির হইল না। মাঝরাতে প্রদীপ একবার উঠিয়া আসিল সত্য, কিন্তু দুয়ারে করাঘাত করিয়াও কোনো সাড়া মিলে নাই। সমস্ত রাত্রি সে নিদারুণ অনুতাপে বিদ্ধ হইয়াছে। নমিতার মাঝে ত' সে বিদ্রোহিনী দাহিকা-শক্তিরই উদ্বোধন দেখিতে চাহিয়াছিল, অথচ সে তাহার বশবর্তিনী হইতেছে না বলিয়া তাহার এই আক্ষেপ কেন? কেন যে এই আক্ষেপ সারা রাত্রি না ঘুমাইয়াও সে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

ভোরবেলা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেই প্রদীপ দেখিল নদীর পারে ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া নমিতা বসিয়া আছে। মাথায় ঘোমটা নাই, খোলা চুলগুলি হাওয়ায় উড়িতেছে। এত তন্ময়

যে প্রদীপের পায়ের শব্দ পর্যন্ত সে শুনিতে পারিল না। প্রদীপ কাছে আসিয়া কহিল, —"কালকের দুর্ব্যবহারের জন্যে আমাকে ক্ষমা কর, নমিতা।"

নমিতা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। সে-মুখের ও কণ্ঠস্বরের নির্মলতা তাহাকে স্পর্শ করিল। সে হাসিয়া কহিল,—"ও-সব ভণিতা ছেড়ে এখানে একটু বসুন। এমন সুন্দর নদী আমি আর কোথাও দেখিনি।"

প্রদীপ একটু দুরে সরিয়া বসিল : "তোমায় চোখ দিয়ে আমিও এই সৃষ্টিকে নতুন করে দেখতে শিখেছি, নমিতা। এই নদী, তার এই অনর্গল স্রোত, ওপরে অবারিত আকাশ, পারে ছোট একটি নীড় আর দু'টি আত্মা ঘিরে অপরিমেয় নিস্তব্ধতা—মনে হয়, নমিতা, সৃষ্টির আদিম যুগে চলে এসেছি আমরা। তোমার মুখ ও এই অবারিত শান্তি ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কী কামনা থাকতে পারে? সত্যিই

এর বেশি আমি আর কোনদিন কিছুই চাই নি।"

কী-কথায় যে কোন কথা মনে পড়িয়া যায় বলা কঠিন। নমিতা জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, আপনার বন্ধুর ঠিকানা জানেন?"

প্রদীপ কথাটার সোজাসুজি উত্তর দিল না : "আমার বন্ধু ত' একটি দু'টি নয়, কার কথা বলছ?"

—"যার কথা বলছি তাকে আপনি খুব ভাল করেই চিনতে পেরেছেন। আমার মুখে নামটা তার শুনতে চান?—অজয়।"

ঢোঁক গিলিয়া প্রদীপ কহিল,—"তার ঠিকানা জানবার কোনো সুবিধেই সে কাউকে দেয় না কোনোদিন।"

—"কিন্তু আপনি-আমি এখানে এসেছি জানলে নিশ্চয়ই একবার আসতেন। তিনি এ-বাড়িতে কোনোদিন আসেন নি বুঝি?"

—"বহুবার। এটা আমাদের একটা ওয়েটিং-রুম্ ছিল। জিবরাবার হ'লে আপনিই একদিন চলে আসবে। তাকে কি তোমার খুব দরকার?"

ম্লান হাসিয়া নমিতা কহিল,—"না, দরকার আবার কী! তিনি ত' এমন মানুষ নন্ যে দরকারে লাগবেন কারুর। নিজের খেয়ালে নিজে ভেসে চলেছেন। কিন্তু এবার উঠি আসুন, বাগদি-পাড়াটা ঘুরে আসি। তারপর গিয়ে রান্না-বান্নার জোগাড় করা যাবে। এখানকার হাওয়ার এই গুণ যে বেশিক্ষণ রাগ করা যায় না—ভীষণ ক্ষিদে পায়। আমি বেঁধে দিলে খাবেন তত? দেখুন।"

দুই দিন কাটিল। এত শ্রান্তি প্রদীপ কোথায় রাখিবে? আবার। ঘন ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকাইয়া রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে এই নিস্ফল সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া আর কত শক্তি সে ক্ষয় করিবে?

এত কাছে আসিয়া রহিল, অথচ এমন কঠোর নির্লিপ্ততা—ইহার গভীরতা তলাইয়া বোঝে প্রদীপের সাধ্য কি? সংসারকে শাসন করিবার জন্য সে এমন একটা নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া রহিল, এই দুর্বলতার কদর্য্যতা প্রদীপকে দিবারাত্রি পীড়া দিতেছে। দুই বেলা বাঁধিয়া দেয়, সান্নিধ্যে সাহচর্যে মুহূর্তের পাত্রগুলি মাধুর্যের রসে ভরিয়া তোলে, অথচ কী সুদুর একটি ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেকে কেন যে নমিতা এমন নিঃস্পৃহ, নিরাকুল করিয়া রাখিল কে ইহার অর্থ বুঝাইবে? যদি শুশ্রুময়ী কল্যাণী নদীলেখাটির মতই একটি স্বেহসেবপূর্ণ মমতা লইয়া নমিতা না বহিবে, তবে সে এই ঝড়ের পথিককে নীড়ে লইয়া আসিল কেন? প্রদীপের এক এক সময় ইচ্ছা হয় গৃঢ় অপরিচয়ের ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবলশক্তিতে নমিতাকে সে সম্পূর্ণ উদঘাটিত করিয়া উদ্ধার করিয়া লয়, কিন্তু কী যে রহস্য তাহাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার না মিলে সন্ধান, না বা সমাধান। প্রদীপ হাঁপাইয়া উঠিল।

সকালে দুইজনে তাহারা বেড়াইতে বাহির হয়, নদীর পার ধরিয়া অনেকটা ঘুরিয়া আসে। পল্লীগৃহগুলি যেখানে স্তপীকৃত হইয়া আছে, সেটা দুইদিন নমিতার কাছে তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় সে সেখানে একা গিয়া একটি অর্ধবৃদ্ধা নারীর মুখে তাহার কলঙ্কসূচক তিরস্কার শুনিয়া আর ঐ মুখে পা বাড়াইতে চাহে না। বিধবা হইয়া পুরুষমানুষের এই সান্নিধ্য-সম্ভোগ—ইহার একটা স্কুল ব্যাখ্যা করিয়া সেই মেয়েটা নমিতাকে একেবারে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। নমিতার নাকালের আর অবধি রহিল না, সে না পারিল প্রতিবাদ করিতে, না বা পারিল বুঝাইয়া দিতে যে তাহারা পল্লী-সংস্কার করিতে আসিয়াছে, তাহারা সহকর্মী। গ্রামের লোকের অত-শত বুঝিবার ধৈর্য্য নাই, আগুনের আগে কলঙ্ক চলে। আজ সকালে নমিতাকে দেখিবার জন্য নদীর পারে লোক জড়ো হইয়াছিল।

প্রদীপ এই কথাটিকেই অবলম্বন করিয়া এমন একটা সঙ্কেত করে যেন তাহাদের পরিচয় ঘনতর হইলেই এই কলঙ্ক চাপা পড়িবে, কিন্তু নমিতা অল্প একটু হাসিয়া সকল সন্দেহের কুয়াসা উড়াইয়া দিয়া বলে : "মানুষের ভুয়ো কথায়ই যদি কান পাতব তবে বাইরে বেরবার আর মর্য্যাদা কী ছিল! লোকে যা বলে বলুক। একদিন আমিই হব এদের লোকলক্ষ্মী।" বলিয়াই সে নানারূপ গভীর আলোচনায় মত্ত হইয়া উঠে। হাওয়ায় শাড়ি ও আঁচল উড়িতে থাকে, চোখে মহাভবিষ্যতের স্বপ্ন দীপ্ত হইয়া উঠে—মনে হয় নমিতাই যেন সেদিনের আকারময়ী সম্ভাবনা।

প্রদীপ বলে: "ঘরে-বাইরে এ অপমান তুমি বেশি দিন সইতে পারবে না।"

—“খুব পারব। প্রথমত আমার পক্ষে ঘর নেই, সমস্তটাই বাহির। এবং সে-বাহির যে কত প্রকাণ্ড তা আমি ধারণাই করতে পারি না। তাই ত' আত্মায় এত বিস্তৃতি অনুভব করি। আর যাকে অপমান বলছেন, সত্যিই তা অপমান নয়, প্রমাণ।”

—“কিসের?”

—“আমি যে প্রস্তুত হতে পারছি তার।”

–“কিন্তু তোমার জন্যে শুধু-শুধু এই অপমান আমি সইতে যাবো কেন?”

নমিতা চুপ করিয়া থাকে। পরে মুখ তুলিয়া বলে: “বেশ, স্বচ্ছন্দে আমাকে বর্জন করুন।”

—“তোমাকে বর্জন করবার জন্যেই এতটা পথ আসা হয় নি।”

—“তা হলে অপমানসওয়াটা শুধু-শুধু হ'ল কি করে?”

আবার চুপ করিতে হয়। প্রদীপ প্রশ্ন করে : “আর কত দিন থাকবে এখানে?”

নমিতা গম্ভীর হইয়া বলে: “দেখি।”

এই ছোট কথাটির মধ্যে যেন বহু দিনরাত্রির প্রতীক্ষার স্বপ্ন রহিয়াছে। প্রদীপের কাছে নমিতার এই কঠোর ধ্যানময়তা সহসা বাত্ময় হইয়া উঠিল। কাহার জন্য তাহার এই অবিচল প্রতীক্ষা এতক্ষণে সে বোধ হয় বুঝিতে পারিল। কিন্তু নামটা জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহসে কুলাইল না।

সাহসে কুলাইল না বটে, কিন্তু অধিকারবোধের অহঙ্কারে সে নমিতার পরধ্যানলীন মূর্তির এই নিঃস্পৃহতাও সহ্য করিতে পারিল না। প্রদীপ এমন ধরণের লোক নয় যে, সমস্যার সমাধান একমাত্র সময়ের বিবর্তনের উপর ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে; সোজাসুজি গোটা কয় তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও তাহাদের স্পষ্ট প্রখর উত্তরের উপরই তার অসীম নির্ভর। সেই প্রশ্নোত্তরের পেছনে অনুচ্চারিত কোনো গভীর অর্থ থাকিতে পারে কি না সে-বিষয়ের সন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি নাই। তাহার ব্যবহারে যে একটা অপরিচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতা আছে তাহাই তাহাকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে।

তাই রাত্রে শুইবার ঘরের দরজায় খিল দিবার আগেই প্রদীপ ঢুকিয়া পড়িল। কম্পমান দীপশিখায় প্রদীপের এই রূঢ় আবির্ভাবে নমিতা চমকিয়া উঠিল। স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,-“এ অসময়ে, হঠাৎ?”

মাথার চুলগুলিতে আঙুল চালাইতে চালাইতে প্রদীপ কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।"

গম্ভীর হইয়া নমিতা কহিল,—"বলুন।"

নমিতার কথাগুলি এমন সংযত ও স্থির যে প্রদীপের সমস্ত ভাবোদ্বেগ কেমন ঘুলাইয়া উঠিল। তবু দৃঢ় করিয়াই কহিল, "আমাদের এমনি করে আর থাকা চলবে না।"

—"কোথায় যেতে হবে?"

—"যেখানেই যাই আমাদের সম্পর্কের একটা স্পষ্ট মীমাংসা দরকার।

নমিতা বিরক্ত হইয়া বলিল,-"যারা সমাজবিধানকে হেয়জ্ঞান করে' বাইরে চলে এসেছে তাদেব পক্ষে আবার সমাজানুমোদিত সম্পর্কের সার্থকতা কি? অপরাধ যদি সইতে না পারি, সেইটেই আমাদের প্রকাণ্ড অপরাধ।" কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া নমিতা জিজ্ঞাসা করিল : "তারপর বলুন।"

প্রদীপ কহিল,—"সোজা স্পষ্ট করেই বলি নমিতা, আমি তোমাকে চাই।"

শান্ত স্বরে নমিতা বলিল,-"কথাটা আমি আগেই শুনেছি। পুনরুক্তির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অর্থের রূপান্তর দরকার। বেশ ত, আমাকে আপনাদের যোগ্য করে নি, কর্ম্মে, সহনশক্তিতে, আত্মোৎসর্গে। এর চেয়ে আমাকে আর বড়ো করে পাওয়ার কিছু মানে আছে কি?"

বলিয়া নমিতা জানালার কাছে সরিয়া আসিল। জানালার বাহিরে নদীর উপরে অন্ধকার তরঙ্গ তুলিয়া পুঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে—তাহারই পটভূমিতে নমিতাকে সর্ববন্ধচ্যুতা একটি শরীরী শিখার মত মনে হইল। প্রদীপ তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া নমিতার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল; কহিল,-"তোমাকে চাওয়ার একটা কায়িক অর্থ আছে, নমিতা। সে শুধু বিরহে নয়, বিহারে। তোমাকে আমি চাই।"

নমিতা হাত সরাইয়া নিয়া কহিল,—"হাত পেতে চাওয়ার দীনতা আপনাকে লজ্জা দেয় না? পাওয়ার জন্য যদি মূল্য না দেন তবে সে-পাওয়ায় স্বাদ থেকে কৈ?"

প্রদীপ কহিল,—"আমি সবই বুঝি, নমিতা। তবু আজকের এই ক্ষণটিতে মনে হচ্ছে সবার চেয়ে বড় হচ্ছে প্রেম,—দশের চেয়ে বড় হচ্ছে এক। কোনো মূল্যই তোমার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর।" বলিয়া মূঢ়চেতন প্রদীপ নমিতাকে একেবারে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

ইহার মধ্যে কোথায় একটু অন্যায় ছিল বলিয়াই হোক্, বা প্রদীপের ব্যবহারে বর্বর বন্যতা ছিল না বলিয়াই হোক্, নমিতার আকস্মিক আঘাতে প্রদীপ একেবারে ছিটকাইয়া পড়িল। নমিতা কহিল, "সমাজদ্রোহীদের এমন সামাজিক ব্যবহার ক্ষমার যোগ্য নয়। আপনি যে এত স্বার্থপর ও নীচ তা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনোদিন। জানেন না। আমি বিধবা?"

মাথার সেই ক্ষতস্থানেই বোধ হয় লাগিয়াছিল; তাই প্রদীপ রুখিয়া উঠিল : "আর যাকে মানা, তোমাকে এই সতীত্বের আস্ফালন শোভা পায় না। তুমি যা তুমি তাই। সমাজের হাটে তোমার নারীত্ব। একটা পণ্য মাত্র। কিন্তু কাল সকালে তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি। চলে যেয়ো, তোমার ওপর আমার দায়িত্ব নেই।"

নমিতা খালি একটু হাসিল।

সকালে যাইবার জন্য নমিতা প্রস্তুত হইতেছিল কি না কে জানে, কিন্তু যাওয়া আর হইল না। শেষরাত্রি থাকিতেই পুলিশে আসিয়া বাড়ি ঘিরিয়াছে।

অবনীবাবু সহজে পরাস্ত হইবার লোক নহেন

অবনীবাবু সহজে পরাস্ত হইবার লোক নহেন। বুঝিতে তাহার আর বাকি ছিল না যে নমিতার এই উদ্ধত আচরণের আড়ালে কাহার অঙ্গুলিনির্দেশ ছিল! সেইদিন দুপুর বেলায়ই প্রদীপ চলিয়া গেলে অবনীবাবু যখন বকিয়া-ঝকিয়া নমিতাকে একেবারে নাকাল করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, যখন এমন পর্যন্ত বলিতে দ্বিধা করেন নাই : ঘরের বার হয়ে যেতে পার না ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে, এখানে বসে' ঢলাঢলি করে' আমাদের মুখে আর চুণ-কালি মাখাও কেন? তখন নমিতা নিজেকে আর দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া বসিয়াছিল; যাবই ত' বেরিয়ে। কার সাধ্য আমাকে আটকায়! তাই তোর হইলে অবনীবাবুর মনে আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, ঐ প্রদীপের সঙ্গেই ষড়যন্ত্র করিয়া চরিত্রহীন মেয়েটা কুল ডিঙাইয়াছে। এত সহজে প্রদীপকে ছাড়িয়া দিবার পাত্র তিনি নন। ফল যাহাই হোক, ঐ গুণ্ডাটাকে একবার দেখিয়া লইতে হইবে। তিনি পুলিশে খবর দিলেন।

গাড়ি আবার কলিকাতার দিকে গড়াইল। রাত্রিকাল। একই গাড়িতে সকলে উঠিয়াছে—দু-পাশের বেঞ্চি দুইটাতে নমিতা আর প্রদীপ; মাঝেরটাতে পুলিশের কয়েকজন লোক। অপরিমেয় স্তব্ধতা— কাহারো চোখে ঘুম নাই। অনেক পরে প্রদীপ ইনস্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিল,—“জবানবন্দি ত' টোকা হয়েছে, ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?”

ইনস্পেক্টার নমিতার অনুমতি চাহিলেন—সে কিন্তু অতি সহজেই রাজি হইয়া গেল। হাসিয়া কহিল,—“আসুন।”

প্রদীপ ধীরে উঠিয়া আসিল। দূরে বেঞ্চির এক পাশে সরিয়া বসিয়া কহিল,—“জবানবন্দিতে কি বল্লে?”

পুলিশকে শুনাইয়া স্পষ্ট করিয়া নমিতা কহিল,—“সত্য কথাই বলেছি। আপনি আমাকে ছল করে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন আর নিতান্ত নির্লজ্জের মতো দৈহিক বলপ্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বলেছি বৈ কি।”

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া রহিল। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, “জানতাম তুমি তা বলবে। এর চেয়ে সত্য করে কোনো নারী কোনো গুরুষকে দেখতে শেখেনি। কিন্তু কথাটাকে আরো একটু মার্জিত করে বল্লে না কেন?”

প্রদীপের মুখের দিকে অপলক চোখে চাহিয়া থাকিয়া নমিতা বলিল,-“অমন একটা নিদারুণ কথার আরেকটা মার্জিত সংস্করণ আছে নাকি?”

—“আছে বৈ কি।” কণ্ঠস্বর হঠাৎ গাঢ় ও আর্দ্র করিয়া প্রদীপ কহিল,—“বল্লেই পারতে আমার ভালোবাসার আকর্ষণে তোমাকে সমস্ত প্রাচীন প্রথা ও শাসনের প্রাচীর থেকে মুক্ত করে’ উদার আকাশের নীচে নিয়ে এসেছি—যেখানে বিস্তৃত জীবন, বিচিত্র তার উৎসব। বল্লেই পারতে, সহজ অধিকারের দাবিতে তোমাকে কামনা করেছিলাম, নমিতা।”

অন্ধকারের মধ্যে নমিতা হাসিয়া উঠিল। কহিল,—“অত কথা পুলিশ বুঝত না যে—”

প্রদীপের মুখে আর কথা আসিল না। চুপ করিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে নমিতা একেবারে ছেলেমানুষের মত তরল সুরে বলিয়া উঠিল : “কেমন মজা! শেষকালে কি না ফুলিয়ে ঘরের বউকে বার করার জন্যে জেল খাটবেন। অদৃষ্টে দুর্গতি থাকলে এমনিই হয়— হাতীও শেষে কাঁটা ফুটে মারা পড়ে।” হঠাৎ কথার মাঝখানে প্রদীপের অত্যন্ত কাছে সরিয়া আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ক্ষীণ। অনুচ্চকণ্ঠে নমিতা কহিল,—“আরো এমনি মজা যে আপনার হাতে এমন কোনো সম্বলও আজ নেই যে আত্মহত্যা করে’ এ কলঙ্ক থেকে ত্রাণ পেতে পারেন। আপনার বন্ধু এ কথা শুনলে কী ভাববেন বলুন দিকি?”

কথা কয়টা কর্ণকুহরে নিক্ষেপ করিয়াই নমিতা আবার দূরে সরিয়া বসিল। প্রদীপ বলিল,-“বন্ধু কী ভাববেন তা তিনিই ভাবুন। জেলে যদি আমি যাই-ও, তবু মনে এমন কোনো গ্লানি থাকবে না যে, আত্মহত্যার উপকরণ হাতে নেই বলে অনুতাপ করতে হবে। ব্যাখ্যা একটা মনের মধ্যে কখন থেকেই গড়ে উঠেছে—তোমার জন্যেই জেলে গেলাম।”

—“আমার জন্যেই বৈ কি।” নমিতা ইনস্পেক্টারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,-“একজন অসহায় বিধবা-মেয়েকে কৌশল করে’ ঘরের বাইরে এনে তার ওপর পশুর মত উৎপীড়ন করতে চান আপনাকে লোকে জেলে না পাঠিয়ে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করবে, আপনার ফোটো সামনে রেখে নিশান উড়িয়ে মিছিল করবে, না?”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রদীপ কহিল,—“যা খুসি বল। কিন্তু তুমি মনে-মনে ত’ জান আমি পশুও নই, দেবতাও হ’তে চাই না। তোমাকে আমি কামনা করেছিলাম বৈ কি, সে-কামনা কবিতার মতই সুন্দর। তোমাকে পাইনি, পাওয়ার পেছনে যে প্রচুর তপস্যার প্রয়োজন হয় সে শিক্ষাই না-হয় জেলে বসে’ লাভ করা যাবে।”

—“যা যা, আর বক্তৃতা করতে হবে না, এখন ঘুমুন গে।” বলিয়া নমিতা বেঞ্চির কিনারে কাঠের দেয়ালে হেলান্ দিয়া পা দুইটা সামনে একটু প্রসারিত করিয়া শুইবার ভঙ্গি করিল, এবং তাহারই ইঙ্গিতে ইনস্পেক্টর আসামীর হাত ধরিয়া অন্য বেঞ্চিটাতে সরাইয়া আনিলেন।

কলিকাতা পৌঁছিয়া পুলিশ প্রদীপকে থানায় লইয়া গেল এবং নমিতাকে অবনীবাবুর জিম্মায় রাখিয়া বলিয়া দিল যেন ঠিক এগোরোটার সময় তাহাকে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করানো হয়।

ভোর বেলা—উমা ছাড়া সবাইরই ঘুম ভাঙিয়াছে। আত্মীয়-পরিজনের শাসন-প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে নমিতার মুখ একটুও ম্লান হইল না, তার দৃষ্টিতে না একটু কুণ্ঠা, পদক্ষেপে না একটু জড়তা। চাদরটা গায়ের উপর ভালো করিয়া টানিয়া সে সিড়ি দিয়া সোজা তাহার দোতলার পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। নির্ভীক বীরাঙ্গনা, অটল ঋজু মেরুদণ্ড, আকাশের অরুণ-রশ্মির মত তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে যেন একটা দুঃসহ তেজ বিকীর্ণ হইতেছে। আত্মীয়-পরিজনরা মূঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কেহ একটা কথা কহিতে পারিল না, না বা পারিল উহাকে বাধা দিয়া উহার মুখ হইতে এই জঘন্য আচরণের একটা অর্থ বাহির করিতে। অবনী বাবু উৎফুল্ল হইয়া ফোনে শচীপ্রসাদকে প্রদীপের গ্রেপ্তারের সংবাদ দিতে ব্যস্ত হইলেন, আর অরুণা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া উমাকে জাগাইয়া কহিলেন,—"ওই শিগগির, দেখবি আয়-পোড়ারমুখি ফিরে এসেছে—"

একলা বিছানায় পশ্চিমের বিধুর দিগন্তলেখাটির মত উমা ঘুমাইয়া ছিল। সুরের মাঝে অনুচ্চারিত বাণীর যে সুষমা, ঘুমন্ত উমার দেহে তেমনি একটি অনির্বচনীয় কান্তি। মায়ের হাতের ঠেলা খাইয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল : "কে ফিরে এসেছে মা? বৌদি? আর, দীপ-দা?"

অরুণা মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—"আর দীপ-দা! সে পাজিটা পুলিশের হাতে-হাতে তার হাতকড়া। এবার ঘানি ঘোরাবেন আর কি।"

উমার ঠোঁট দুইটি সহসা পার হইয়া উঠিল : "ঘানি ঘোরাবেন মানে? উনি কি করলেন? যদি কেউ পথ ভুল করে বাইরে বেরিয়ে আসে তবে তাকে আশ্রয় দেওয়া পাপ না মহত্ত্ব? ওঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে আমাদেরই বরং উচিত মা, ওঁকে একদিন নেমন্তন্ন করে' খাইয়ে দেওয়া?"

কোথায় উমা জাগিয়া উঠিয়া মা'র সঙ্গে নিভৃতে একটুখানি। নমিতার চরিত্রালোচনা করিবে, না, একেবারে মোড় ফিরিয়া প্রদীপের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। অরুণা ধমক দিয়া কহিলেন,—"এক ফোটা মেয়ে, তুই তার কী বুঝবি? যা, ওঠ, এখন। খালি পড়ে। পড়ে ঘুমুনো। মুখ ধুয়ে পড়তে বোস এসে।"

উঠিতে হইল। ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত তলাইয়া বুঝিতে তাহার আর বাকি নাই। নমিতা নিতান্ত নমিতা বলিয়াই তাহার জীবনে এমন একটা আচরণের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ-সঙ্কুল প্রশ্ন উঠে, উমার জীবনে এমন একটা সমস্যার আবির্ভাব হইতে পারে এমন কথা সে নিজে ভাবিতেই পারে না। ঘর সে ছাড়িবে কি না, এবং ছাড়িলে কোথায় বা কাহার

সঙ্গে সে আবার ঘর বাঁধিবে—এই সব প্রশ্ন তাহার ব্যক্তিগত নির্ধারণের বিষয়। ইহার জন্য পাড়ার পাঁচজনের মুখ চাহিতে হইবে নাকি? উমা হইলে কখনই ফিরিয়া আসিত না, এমন ভাবে হয় ত' নিজেকে বন্দিনী করিয়া ফেলিত যে দীপ-দাকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া নেয় কাহার সাধ্য!!

নমিতার ঘরের গোড়ায় আসিয়া দেখিল সেখানে ছোটখাটো একটি ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। শচীপ্রসাদ পর্যন্ত হাজির। সবাইরই মুখ প্রসন্ন, নমিতার প্রতি কাহারো ভাষায় স্বাভাবিক রূঢ়তা নাই। ব্যাপারটা উমা চট করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিল না।

শচীপ্রসাদ হাসিয়া কহিতেছে : "যাক্, ও ছোটলোক গুণ্ডাটা যে গ্রেপ্তার হয়েছে তাই ঢের। একেবারে সেসাস কেস,—ছ'টি বচ্ছর শ্রীঘরে। খবর শুনে ফুর্তিতে আমার চা-ও খাওয়া হ'ল না।' এই যে উমা, চা করে দাও দিকিন একটু।"

অবনীবাবু ঘরের মধ্যে নমিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পুলিশের কাছে যে সত্য কথা বলেছ বৌমা, তাতেই তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি। ঐ পাজির পা-ঝাড়া স্কাউণ্ডে লটাকে এবার আমি দেখাবো—"

—"নিশ্চয়।" শচীপ্রসাদ সায় দিল : "মেয়েছেলে যতই কেন না বেয়াড়া হোত্, বাড়ির বাইরে যেতে হলে পুরুষমানুষের হেলপ্ তাদের চাইই। তার ওপর উনি হিন্দু-বিধবা, পুরস্ত্রী। তা ছাড়া, কলকাতায় নয়—একেবারে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পিটটান। ও স্কাউণ্ড্রেলটাকে যদি বলেও যে বৌদি ইচ্ছে করে বেরিয়ে এসেছেন, ম্যাজিস্ট্রেট তা কখনো বিশ্বাস করবেন না।"

অবনীবাবু বলিলেন,—"ও বল্লেই হ'ল? বৌমা ত' জবানবন্দিতে স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন যে প্রদীপই ওকে ছলে-বলে ফুসলিয়ে বাড়ির বা'র করেছে। কোর্টেও তোমাকে সে-কথাই বলতে হবে বৌমা, বুঝেছ?"

নমিতা অল্প একটু হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

—"বাস, তা হলে আর আডিউ ইনফ্লুয়েন্স-এর কথাও উঠতে পাবে না। পুলিশের কাছে ওটুকু না বলে' এলেই মুস্কিল হ'ত।"

শচীপ্রসাদ কহিল,—"বৌদি আমাদের অত বোকা নন্। মেয়েমানুষদের অমন এক-আধটু ভুল হয়েই থাকে, কিন্তু যারা সেই সব ভুল খুঁচিয়ে তাদের বিপথে চালিয়ে নেয় তাদেরকে ছেড়ে দিতে নেই। ফঁদ পেতে ডাকাতটাকে ধরতে পেরেছেন, তাতে আপনাকে বাহবা দিচ্ছি, বৌদি।"

নমিতা আবার একটু হাসিল; চোখ তুলিল না, কথা কহিল না।

কথা কহিল উমা: “ফাঁদে যদি ডাকাত আজ ধরা না পড়ত তবে যাদুকরীকে আপনারা আর আস্ত রাখতেন না। ইদুর আজ সিংহকে ধরে’ দিতে পেরেছে বলেই ছুটি পেলো—নইলে সে একা ফিরে এলে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন।”

অবনীবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন: “যা যা, তোকে আর ফর্-ফর্ করতে হবে না। বৌমাকে শিগগির দুটো বেঁধে দে দিকি, এগারোটায় কোর্টে হাজিরা দিতে হবে।”

শচীপ্রসাদ কহিল,-“আর আমার চা।”

ঘর খালি হইয়া গেলে উমা রুক্ষ হইয়া প্রশ্ন করিল,—“বৌদি, এ তোমার কী নির্লজ্জতা?”

নমিতা চকাইয়া উঠিল। উমার মুখের উপর দুইটি জিজ্ঞাসু চক্ষু তুলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

—“ফিরে এসেছ তার জন্যে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু নিজের ঠুনকো খ্যাতি বাঁচাবার জন্যে এ তুমি কী করে বসলে?”

—“কী করে’ বস্লাম?” নমিতা দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

—“ঢের ন্যাকামি করেছ। কেই বা তোমাকে ঘটা করে বাড়ির বা’র হতে বলেছিলো, আর কেনই বা তুমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করলে? ও-মুখ লুকোবার জন্যে এ-বাড়ির বাইরে কি আর তোমার জায়গা ছিল না?”

নমিতা ধীরে কহিল,—লুকোবার কথা বোল না, ঠাকুর-ঝি। এ-মুখ দেখাবো বলেই ত’ এ-বাড়িতে ফের ফিরে এসেছি।”

উমা তবুও শান্ত হইল না : “কেন ফিরে এলে? যখন বেরুলে ত’ হার স্বীকার করলে কেন? আবার এসে তুমি হবিষি আর ফোটো-পূজা শুরু করবে? তবে এই অভিনয় করবার কি দরকার ছিল?”

নমিতা হাসিয়া কহিল,—“পুলিশে ধরলে আর কি করা যায় বল।”

—“কি করা যায়? স্পষ্ট কণ্ঠে বলা যায় : আমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এসেছি, যাকে তোমরা নারীহর্তা বলে’ ধরতে এসেছ, সে আমার নবজীবনের প্রভু, তাকে আমি ভালোবাসি। বলে না কেন, বৌদি?”

মুখ গম্ভীর করিয়া নমিতা কহিল,—"মিথ্যা কথা বলব কি করে?"

—"ভারি তুমি সত্যবাদী মেয়ে এসেছ। তাই কিনা দীপ-দার সর্বাঙ্গে কালি ছিটোতে তুমি দ্বিধা করলে না। যে-ভদ্রলোক স্নেহ করে' এক নিরাশ্রয় মেয়েকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এলেন, তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে সত্যের গৌরব করতে তোমার লজ্জা করলো না, বৌদি? এই জঘন্য আত্মরক্ষার চেয়ে আত্মহত্যাও ভালো ছিল।"

নমিতা ক্ষীণ একটু হাসিল; কহিল,—"কা'র সত্য কোন পথে এসে দেখা দেয় তুমি সহসা তা বুঝবে না, উমা। বরং শচীপ্রসাদের জন্যে চা কর গে। সুসংবাদ পেয়ে উত্তেজনায় বেচারার দারুণ তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়।"

উমা রুখিয়া উঠিল : "কার জন্যে চা করতে হবে সে-পরামর্শ তোমার কাছ থেকে নিতে চাই না। নিজের খেলে মান বাঁচাতে গিয়ে ভীরু অপদার্থের মত তুমি যে আরেকজনকে সমাজের চোখে লাঞ্ছিত করবেএ অত্যাচার আমরা সইবো না। মনে রেখো।"

নমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"কী আর করবে বল। আইনের কাছে আবদার খাটে কৈ।"

—"খাটেই না ত'। সত্য বলে যা নিয়ে তুমি আস্ফালন করছ সেই তোমার অসতীত্ব। স্থান তোমার সংসারের সেই বাইরেই। তবু তুমি এত স্বার্থপর হবে যে—ছি!"

দারুণ ঘৃণায় উমার চোখমুখ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না; উমা যখন চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, নমিতা তাহাকে বাধা দিল : "শোন। সংসারের প্রাচীরের বাইরে চলে এসে আমারো এ দুটি দিনে কম শিক্ষা হয়নি, উমা। আমি বুঝেছি, তোমাদের ঐ সতীত্ব-বোধটা মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বাধা। সে-বাধা আমি খণ্ডন করব—আপন শক্তিতে, আপন স্বাতন্ত্রে।"

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইল : "তাই যদি হয় তবে নিজের সতীত্বের ওপর মুখোস্ টানবার জন্যে আরেকজনের মুখে কালি ছিটোতে তোমার বিবেক সায় দেয়?"

উমার মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া নমিতা হাসিয়া কহিল,—"আরেকজনের জন্যে যে তোমার ভারি দরদ।"

উমা গাঢ়কণ্ঠে কহিল,—"সে-দরদের এক কণা তোমার থাকলে এমন নির্লজ্জের মত নির্দোষ সেজে সমাজের চোখে সস্তা বাহবা নিতে চাইতে না। কে তোমাকে দীপ-দার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে বলেছিলো?"

—"ভাগ্য, উমাযে-ভাগ্য মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে হিজিবিজি ছবি আঁকে। আমার সঙ্গে আর বেশি তর্ক করো না, লক্ষ্মী—আমি ভারি শ্রান্ত হয়েছি। কাল সারা রাত ঘুমুতে পারি নি।"

হঠাৎ উমা নমিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—“কিন্তু দীপ-দাকে তুমি জেল থেকে বাঁচাবে—আমাকে কথা দাও, বৌদি! তিনি ত’ তোমাকে জোর করে বাবা-মা’র কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন নি, তুমিই বরং পথে বেরিয়ে তাকে কুড়িয়ে পেলে। তুমিই বরং তাকে জখম করলে, তিনি তোমার কোনো ক্ষতিই করেন নি। কপালের সেই ঘা-টা তার কেমন আছে, বৌদি?”

নমিতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কখন তাহার পায়ের উপর উমার হাত দুইটি নামিয়া আসিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে ভুলিল না। ধীরে কহিল,—“তিনি আমার কোনো ক্ষতিই করেন নি, এ তুমি কী করে বুঝলে, উমা?”

—“ক্ষতি করেছেন! কী তিনি করতে পারেন শুনি?”

—“যদি বলি উমা, তিনি প্রমত্ত পুরুষত্বের লালসায় আমাকে অধিকার করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে শাসন করা দরকার—”

উমা দাঁড়াইয়া পড়িল : “মিথ্যা কথা।”

নমিতা বলিল,—“মিথ্যা কথা নয়, উমা।”

—“তবু নারীর কাছে তার ক্ষমা আছে;-যে-নারী তাঁকে সঙ্গী হ’তে আহ্বান করে, সে-আহ্বান তিনি যদি নিমন্ত্রণ বলে মনে করেন তার মধ্যে কপটতা কৈ, বৌদি। বেশ, তাঁকে তুমি বর্জন কর, কিন্তু মুক্তির যে-দায়িত্ব তুমি অর্জন করলে সে তোমারই থাক্।”

কথা শুনিয়া নমিতা হাসিয়া ফেলিল। ঠাট্টা করিয়া কহিল, “তাকে ত্যাগ করলেই যে তুমি তার নাগাল পাবে এমন কথা বিশ্বাস হয় না, উমা।”

উমার চক্ষু ভিজিয়া উঠিয়াছিল, প্রাণপণে সে চোখের দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া রাখিল, কহিল —“আমি কেন, কোন মেয়েই তার নাগাল পাবে না, বৌদি। এই বিশ্বাসই যদি তোমার হয়ে থাকে, তবে কেনই বা তাকে ত্যাগ করতে যাবে?”

উমা আর দাঁড়াইতে পারিল না; মা’র কথা শুনিয়া মুখ ধুইতে নীচে নামিয়া গেল।

যথাসময়ে মালা উঠিল

যথাসময়ে মালা উঠিল।

উমা অবনীবাবুকে বলিল,—“আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, বাবা।” অবনীবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন : “তুই! তুই আবার কোথায় যাবি?”

“কেন, কোর্টে। যেখানে তোমরা সবাই যাচ্ছ।”

শচীপ্রসাদ আগাইয়া আসিল : “তুমি যাবে মানে? তোমার একটা প্রেসটিজ নেই?”

—“নিশ্চয় আছে। বৌদিও ত’ তাঁর প্রেসটিজ বাঁচাতেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চলেছেন। আমি যাব বা, দীপ-দাকে তার জেলে যাবার আগে একটিবার দেখবো।”

নির্ভীক দুরন্ত মেয়ে। মুখে কিছু বাধে না।

শচীপ্রসাদের সহিল না : “দীপ-দাকে দেখবে? ঐ রাগামাফি, স্কাউণ্ডেটাকে? ওকে দেখলেও ত’ অশুচি হতে হয়।”

—“না হয় অশুচি একটু হ’ব। তারপর আপনাদের মুখের দিকে চেয়েই ত’ আমার সে-পাপ কেটে যাবে। দাঁড়াও ভাই বৌদি একটু, আমি কাপড়টা বদলে আসছি। দু’ মিনিটও লাগবে না—এই হ’ল বলে।”

উমা দ্রুতপদে অন্তর্ধান করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিল নীচে তাহার জন্য কেহই আর বসিয়া নাই। হয় ত’ কাপড় বদলাইয়া আসিতে তাহার দু মিনিটের চেয়ে বেশি সময় লাগিয়াছে—ইহার মধ্যে ঘটা করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সেফটিপিন আঁটিয়া জুতা পরিয়া তাহার বাবু না সাজিলে গোটা মহাভারতটা অশুদ্ধ হইয়া যাইত না।

কিন্তু এই বেশে বিছানায় লুটাইয়া অভিমানে ও দুঃখে সে গোঙাইবে —উমা ততটা নির্লজ্জ নয়। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত আছেন— তাহাকে এড়াইতে হইবে। একটিও শব্দ না করিয়া উমা অতি সন্তপণে খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটা ট্যাক্সি লইয়া চীফপ্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাইতে কতক্ষণ! .

আদালত লোকে লোকারণ্য, কোন প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া উমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখনো এজলাসে আসেন নাই, সমস্ত ঘরময় একটা চাপা গুঞ্জন চলিতেছে। আসামীর ডকৃটাও শূন্য; ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেই হয় ত’ প্রদীপকে হাজির করানো হইবে।

অবনীবাবুদের লক্ষ্যের বাহিরে উমা একটা বেঞ্চিতে একটু জায়গা করিয়া বসিল।

পাশের ছোরা উকিলটি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না : "ঐ মহিলাটি বুঝি আপনার কেউ হন্?"

উমা তাহার মুখের দিকে পর্যন্ত চাহিল না; খালি কহিল,-"না।"

—"কিম্বা আসামী?"

—"তাও না।"

উকিলটি বিস্মিত হইলেন : "তবু এসেছেন?"

—"আপনি এসেছেন কেন? আইন শিখতে না কৌতূহল নিবৃত্ত করতে? আমাদের কৌতূহল হয়, মশাই। মেয়েমানুষ নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শত্রুতা করে একজন নির্দোষ ভদ্রলোককে যদি জেলে। পাঠায়, সে একটা উপন্যাসের মতই থিলি। তাই দেখতে এসেছি।"

উকিলটি কহিলেন,—"আপনার কথায় কৌতূহল যে আরো বেড়ে গেল। কী ব্যাপার, খুলে বলুন। যদি পারি উপকার করব, বিশ্বাস করুন।"

উমা কহিল,—"কতদিন প্রাকৃটিস করছেন?"

-"কেন বলুন ত'?"

—"বলুন, দরকার আছে।"

—"প্রায় দু' বছর।"

—"মোটে!" উমার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন,—"কেন, আপনার কোনো কাজ আছে? বেশ ত' বত্রিশ বছরের প্র্যাকটিস্করা এক বুড়ো-হাবড়া ধরে নিয়ে আসছি না-হয়।"

—"না, না, কি দেব কোত্থেকে? আপনি ঠিক উপকার করবেন?"

উমার ভাবাকুল দুইটি চোখের দিকে তাকাইয়া ভদ্রলোকটি স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,—“যদি পারি, নিশ্চয় করব। কেন করবো না?”

-“কেন করবেন না, তার কারণ অনেক থাকতে পারে। ফি পাবেন।

যে, কিন্তু সত্যি যদি দীপ-দাকে খালাস করে দিতে পারেন, একদিন নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াব আপনাকে।” বলিয়া উমা নিজেই। হাসিয়া ফেলিল।

ভদ্রলোক ব্যবসার খাতিরে গম্ভীর হইয়া উঠিলেন : “কে দীপ-দা?”

—“এই মোকদ্দমার আসামী।”

—“আসামী? কেন, তার পক্ষে উকিল নেই?”

—“বোধ হয় না। দীপ-দা আমার এমন লোক নন যে কুৎসিত মিথ্যার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নিজেকে কলঙ্কিত করে’ তুলবেন! আমি তাকে চিনি না? বরং তিনি হাসিমুখে মিথ্যার অত্যাচার সইবেন, একটিও সামান্য প্রতিবাদ করবেন না।”

ভদ্রলোকটি ভীষণ অস্থির হইয়া উঠিলেন : “কী হয়েছে আমাকে সব খুলে বলুন দিকি শিগগির, দেখি আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি। একটা জামিন পর্যন্ত চাওয়া হয় নি?”

উমা কহিল,—“শত্রুতা করে আবার বাবা আর শচীপ্রসাদ বলে। একটা ছেড়া—”

উকিল বাধা দিলেন : “আপনার বাবা! ঐ মহিলাটি আপনার কে হয?”

—“বল্‌ছি। মহিলাটি আমার বৌদি। সংসারের অত্যাচারে হোল্ক বা যার জন্যেই হোক্, পথে বেরোন, আর পথের মোড় থেকে আমার দীপ-দাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এক ঘোড়ার গাড়ি করে’ ইত্যাদি ইত্যাদি। সব বুঝে নিন্ শিগগির। তারপর বাবার নালিশে পুলিশ গিয়ে ধরে—পুলিশের কাছে মোমের পুতুল আপনার ঐ মহিলাটিই এখন বলছেন যে দীপ-দা তাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার ছল করে ইত্যাদি ইত্যাদি।”

—“কিন্তু এসবের প্রমাণ?”

উমা কহিল,—“যদি ভগবানে বিশ্বাস করেন ত’ তিনি।”

—“আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার বৌদির বয়স কত?”

উমা বোধকরি চটিয়া উঠিল : “ঐ চেয়ে দেখুন না। বয়েস দিয়ে আপনার কী হবে?”

কোনো কথা বলিবার আগেই ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া কোর্টে প্রবেশ করিলেন। সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল—উদ্বেল জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া। গেল।

এই দীপ-দার চেহারা হইয়াছে। পরনের কাপড়টা ময়লা, চুলগুলি শুক্‌না জট-পাকানো, পায়ে জুতা নাই—কোমরে দড়ি বাধা। কতদিন যেন ঘুমাইতে পারেন নাই, দাড়ি কামান নাই, গায়ের জামাটা পর্যন্ত ছিঁড়িয়া গেছে। এ দিকে একবার তাকাইতেছেন না কেন? তাহার কিসের লজ্জা যে গভীর অনুশোচনায় তাহাকে হেঁট হইয়া দাঁড়াইতে হইবে?

উমা সহসা নিতান্ত অবোধের মত উকিলটির দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল,—"যে করে পারুন, আমার দীপ-দাকে এই কলঙ্ক থেকে বাঁচান্। ফি আপনাকে আমি পরে যেখান থেকে পারি জোগাড় করে দেব। যেখান থেকে পারি—আমার গয়না আছে। বৌদিকে দুটো জেরা করলেই সত্য কথা বেরিয়ে পড়বে। আপনি যদি না পারেন, অন্য কাউকে ডাকুন্। বৌদি সতী সেজে কাঠের ফ্রেমে-আঁটা ছবি পূজো করুন্ ক্ষতি নেই, কিন্তু দীপ-দাকে এমন করে' মরতে দেবেন না কখনো।"

—"আপনার কিচ্ছু ভয় নেই।" বলিয়া ভদ্রলোক সস্মিত মুখে বেঞ্চি ছাড়িয়া একপাশে সোজা হইয়া পঁড়াইলেন। তাঁহার মুখের ঐ বন্ধুতাপূর্ণ হাসি ও দাঁড়াইবার এই দৃপ্ত ঋজু ভঙ্গিটি উমাকে যে কী আশ্বাস দিল বলা যায় না।

সরকারের পক্ষের কালো গাউন-পরা উকিল খাড়া হইলেন। নমিতা ধীরে ধীরে কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া উমার দুই চক্ষু ঠিক্রাইয়া পড়িতে লাগিল—নির্লজ্জ, স্বেচ্ছাচারী! নমিতা দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গে দুনমনীয় কাঠিন্য, মুখে নিষ্ঠুর সাহস,ঘোমটার ফাঁক দিয়া বিস্রস্ত বেণীটা নামিয়া আসিয়াছে—যেন সর্ববন্ধনহীনতার সঙ্কেত। উমা প্রদীপের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহারে মুগ্ধ দৃষ্টি সেই নিরাভরণা দেহাগ্নিশিখাকে বন্দনা করিতেছে।

সমস্ত ঘর মৃত হৃৎপিণ্ডেব মত স্তব্ধ।

সরকারের পক্ষের উকিল কথা পাড়িলেন—নমিতার নাম ধাম বংশপরিচয় সম্বন্ধে অবান্তর প্রশ্ন। তার পর :

—"তুমি ঐ আসামীকে চেন?"

—"চিনি।"

—"বেশ। ঐ লোক ১৭ই কার্তিক রাত্রি একটার সময় তোমার ঘরে এসেছিলো?"

—"না।"

-"না? তোমাকে এসে বলেনি যে তোমার মা'র মরণাপন্ন অসুখ, তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে?"

—"না। মিথ্যা কথা।"

—"এই বলে তোমাকে ভুলিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে ট্রেনে করে ফুলহাটি গ্রামে নিয়ে যায় নি?"

—"কখনো না।"

অবনীবাবুর মুখে কে কালি মাখিয়া দিল; শচীপ্রসাদ সামনের টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারিয়া বলিয়া বসিল : সুপিড। সরকারের পক্ষের উকিল কহিলেন,—"তবে, কী হয়েছিলো খুলে বল।"

নমিতার গলার স্বর একটু কাঁপিল না পর্যন্ত। ধীরে সংযত, গভীর কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল : "কিছুই বিশেষ হয় নি। আমি স্বেচ্ছায় আপন দায়িত্বে ঘর ছেড়েছি—মুক্তি আমার নিজের সৃষ্টি। প্রদীপবাবু আমার বন্ধু, বিপদের সহায়। তাকে সঙ্গে করে আমার নিজের প্ররোচনায় আমি ফুলহাটি বেড়াতে যাই। এর মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ ছিল না, এতটুকু কলুষ নেই। আমি সাবালিকা, আমার বয়স গত আশ্বিনে কুড়ি পূর্ণ হয়েছে। জীবনের কোথায় আমার গন্তব্য, কে আমার সঙ্গী, কেন আমার যাত্রা—এ সবের বিচার করবার আমার বুদ্ধি হয়েছে। যদি ভুল হয়ে থাকে তার পরিণামও আমিই বিচার করব। প্রদীপবাবু নির্দোষ, নিষ্কলুষ—আমার মুক্তি আমার নিজের রচনা।"

সবাই একসঙ্গে একেবারে থ হইয়া গেল। ঘরের ছাতটা ভাঙিয়া পড়িলেও বোধ করি শচীপ্রসাদের কাছে এত অস্বস্তিকর লাগিত না। সরকারী উকিল কর্কশ হইয়া কহিলেন, —"তবে পুলিশের কাছে এত সব উল্টো কথা বলেছ কেন?"

—"পুলিশের কাছে কি বলেছি আমার কিছু মনে নেই। উল্টো কথা কিছু যদি বলে থাকি, তবে এই জন্যেই হয় ত' বলেছিলাম যে, এমনি একটা উন্মুক্ত সভায় সর্বসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুক্তি ঘোষণা করতে পাব। যা আমি নিজে সৃষ্টি করলাম, তা পরের সাহায্যে যে মোটেই লাভ করিনি, সেইটে উঁচু গলায় বলবার জন্যে আমি একটা সুযোগ চেয়েছিলাম মাত্র। এর চেয়ে সোনার সুযোগ কী হতে পাত? নেপথ্যে বা স্বপ্নে বা পুলিশের কাছে আমি যা বলেছি তার মূল্য নেই, স্পষ্ট দিবালোকে সজ্ঞানে ধর্মাধিকরণের সামনে যা বলছি তাই আমার সত্য। উল্টো কিছু বলা বা প্রলাপ বকার জন্য যদি শাস্তির বিধান থাকে, তা আমি নেব; কিন্তু আহ্বান যদি কেউ কাউকে করে থাকে, তবে আমিই প্রদীপবাবুকে

করেছি, উনি আমাকে নয়। উনি আমার বন্ধু, আশ্রয়দাতা। যদি এও শুনতে চান, আমি বলব, ঐ আসামীকে আমি ভালোবাসি।”

স্তব্ধ ঘর নিশ্বাস ফেলিল; দেয়ালগুলি পর্যন্ত কাপিয়া উঠিয়াছে। অবনীবাবু কহিলেন,—“চলে’ এস শচীপ্রসাদ। এর পর ঘাড়ের ওপর মাথা নিয়ে আর লোকসমাজে ফিরতে পাবে না। ছি ছি ছি।”

উমা ভিড়ের মধ্যে কোনরকমে আত্মগোপন করিয়া রহিল। উকিল বাবুটি কাছে আসিয়া স্নিগ্ধ-স্বরে কহিলেন,—“আমাকে কিছু বলতেও হ’ল না। মেয়েদের বয়েসই হচ্ছে বাঁচোয়া, বুঝলেন? কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।”

মুখ বিবর্ণ করিয়া উমা কহিল,—“আপনাকে আমি ভুলবো না। আপনি আমাকে খুব সাহস দিয়েছিলেন কিন্তু।”

কিন্তু উমার চেহারায় সাহসের এক কণাও ভদ্রলোকের চোখে পড়িল না। মুখ ছাইয়ের মত শাদা, দুই চোখে কেমন একটা নিরীহ, অসহায় ভাব। কপালের উপর বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। ভদ্রলোকটির কেন-জানি মনে হইল সর্বান্তঃকরণে মেয়েটি হয় ত’ ইহা চাহে নাই। কোথায় যেন একটু আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ রহিয়াছে।

প্রদীপ ও নমিতাকে ঘিরিয়া তখনো ভিড় লাগিয়া আছে। দুইজনেই নির্বাক, সবাইর প্রতি সমান উপেক্ষা। শচীপ্রসাদেরই আফশোষ ঘুচিতেছে না; সে সক্রোধে দুইহাতে ভিড় ঠেলিয়া নমিতার সামনে আসিয়া কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল : “কেন এই কেলেঙ্কারি করে’ বসলেন বলুন ত’? আমাদের মুখ ঢাকবার আর জায়গা রইল না যে।”

অবনীবাবু দূর হইতে চেঁচাইয়া উঠিলেন : “ঐ হতভাগীর সঙ্গে কথা বলে না, শচীপ্রসাদ। যাক্ ও জাহান্নমে,—চলে এস, শচী।”

যাইতে যাইতে শচীপ্রসাদ কহিল,-“এর চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরলেও যে ভালো ছিল!”

দুই জনে ধীরে ধীরে জনস্রোত সরাইয়া রাস্তার বাহিরে আসিয়া পঁড়াইল। প্রদীপ কহিল, —“এখন কোথায় যাবে, নমিতা?”

নমিতার মুখে অটল গাম্ভীর্য—যেন পরপার হইতে কথা কহিতেছে : “আমি কি জানি?”

—“সম্প্রতি একটা গাড়ি নেওয়া যাক্, নইলে এভিড় এড়ানো সহজ হবে না। দু’ দিন কিছু খেতে পাই নি নমিতা, পেট চো চেষ্টা করছে। কিছু না খেলে চলবে না যে।”

নমিতা উদাসীনের মত কহিল,-"বেশ, তবে গাড়ি করুন।"

—"গাড়ি ত' করবে কিন্তু কে এখন আমার জন্যে আর ভাত বেড়ে রেখেছে বল?"

—"কেন, হোটেল। কলকাতা শহরে হোটেল নেই?"

—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে হোটেলে?"

—"আপনার সঙ্গে যেতে আমার আর বাধা কোথায়?"

ড্যালহৌসি স্কোয়ারের পাশে আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছে—প্রায় ছুটিতে ছুটিতে উমা আসিয়া হাজির : "আমাকে চিনতে পারে, দীপ-দা?"

—"তুমি এখানে উমা?" প্রদীপের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না : "উঠে এস, উঠে এস শিগগির—"

নমিতা এক পাশে সরিয়া গিয়া উমাকে তাহাদের মধ্যখানে বসিতে দিল।

তবুও গাড়িটা তখনই ছাড়িতে পারিল না। কে একজন ডান হাতে ছাতা তুলিয়া গাড়িটাকে লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিতেছে। নমিতা তাহার গভীর হৃদয়ের মধ্যে যেন কাহার ডাক শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। ইহাকেই সে যেন বিনিদ্র ব্যাকুল চোখে এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। কিসের বা তাহার মুক্তি, কী বা তাহার সত্য!

কোর্টে আসিতে গিরিশবাবুর দেরি হইয়া গিয়াছিল; দুর হইতে দেখিতে পাইলেন একটা ট্যাক্সিতে করিয়া নমিতা কাহাদের সঙ্গে চলিয়াছে। সামনে আসিয়া চোখে তাহার ধাঁধা লাগিল। চোখ কচলাইয়া নমিতাও চাহিয়া দেখিল—তাহার কাকা ছাড়া পিছনে আর কেহ নাই। গিরিশবাবু ট্যাক্সির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "কী হ'ল?"

কথা কহিল উমা : "কী আবার হবে? বৌদি জিতেছেন।"

—"জিতেছে?" গিরিশবাবু লাফাইয়া উঠিলেন : "কয় বচ্ছর জেল হ'ল গুণ্ডাটার?"

উমা তীক্ষ্নস্বরে কহিল,—"গুণ্ডা আবার আপনি কাকে দেখলেন?"

—"গুণ্ডা নয়, একশো বার গুণ্ডা! ছোঁড়াটার মাথায় যেমন একরাশ চুল, চোখ দুটো ভাটার মত, হাতের মুঠো যেন বাঘের থাবা

ওটাকে আমি বরাবরই রাখতে চাইনি বাড়িতে। নেহাৎ ওর দিদির আবদারেই ছিলো, তা দিদিকে কি আর কম জ্বালিয়েছেন সোনার চাদ! ক' বছর হ'ল?"

—"কা'র কথা বলছেন আপনি?"

—"কেন, অজয়ের। সে ইতিমধ্যে এসেছিলো একদিন আমার বাড়িতে; এসে বল্লে : নমিতা কোথায় আছে জানেন? শ্বশুরবাড়িতে তাকে খুঁজে পেলাম না। কী ভীষণ চটে উঠলাম যে কি বলব? বল্লাম : শিগগির আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বলছি, নমিতা তোমার কে শুনি যে আদিখ্যেতা করবার আর জায়গা পাওনি?"

মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া প্রদীপ হাসিয়া কহিল,-"দয়া করে একটু সরু, গাড়িটা যেতে পারছে না।"

নমিতা ধীরে প্রশ্ন করিল : "কতদিন আগে এসেছিলেন?"

-"এই ত', দিন তিন-চার হবে। ও হরি! তখন কে জান্‌তো ছোঁড়াটা এত বড় হতচ্ছাড়া, এত বড় জানোয়ার। নমিতাকে নিজে সরিয়ে দিব্যি ন্যাকা সেজে কি না বলে গেল : নমিতার ঠিকানা কি। বলতে পারেন? ব্যাটা পাজিক বচ্ছর হ'ল ওর শুনি?"

উমা বিরক্ত হইয়া কহিল,—"ওঁর জেল হতে যাবে কেন? কী বলছেন আপনি?"

গিরিশবাবু হতভম্ব হইয়া কহিলেন,—"বা, এই যে বল্লে নমিতা মামলা জিতেছে?"

—"জিতেছেনই ত'? সমস্ত পৃথিবীর সামনে সোজা সত্য কথা স্পষ্ট করে বলে' আসতে পেরেছেন। মানুষের এর চেয়ে আর বড় জয় কিছু আছে নাকি? কেউ বউদিকে ছিনিয়ে নিতে পারে নি, তিনি নিজের আত্মার শক্তিতে নিজের স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছেন। যান, জেল-ফেল হয়নি কারুর কোনোদিন।"

গিরিশবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন আর কি : "বল কি উমা? নমিতা নিজের ইচ্ছায় বাড়ির বার হয়েছে? তবে কার বিরুদ্ধে এই মালা? এ! কোথায় যাচ্ছ তবে তোমরা?"

নিতান্ত জ্ঞানীর মত মুখ করিয়া উমা কহিল,—" কে কবে বলতে পারে বলুন, কোথায় কে যাচ্ছে?"

গাড়িটা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, গিরিশবাবু, ধমক দিয়া উঠিলেন : "শোন নমিতা, কেন তবে ঘর ছেড়েছিলি শুনি? কার জন্যে?"

উমা বলিয়া উঠিল : “কার জন্যে আবার লোকে ঘর ছাড়ে? নিজের জন্যে।—চালাও জলদি।”

গিরিশবাবুকে আর একটি কথাও বলিতে না দিয়া ট্যাক্সিটা বাহির হইয়া গেল। ছাতা হাতে করিয়া গিরিশবাবু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নমিতা মুগ্ধচোখে উমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। খানিকপরে তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর টানিয়া আনিয়া কহিল, “এত কথা তুমি কোথেকে শিখলে, উমা?”

উমা হাসিয়া কহিল,—“তোমারই কাছ থেকে, বৌদি।”

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ট্যাক্সিটা যে কোথায় চলিয়াছে, যেন কাহারো কোনো দিশা নাই। প্রদীপ সহসা সচেতন হইয়া কহিল, “তুমি আমাদের সঙ্গে কোথায় যাবে, উমা?”

মানুষের মন, না পদ্মপাতায় জলবিন্দু। নিমেষে উমার সমস্ত উৎসাহ উবিয়া গেল; মুখোনি ম্লান করিয়া সে কহিল,—“না, কোথায় আবার যাব? আমার আর কাজ কি আছে? এই, রোখো।”

গাড়ির গতিটা একটু কমিতেই দরজা খুলিয়া উমা নামিবার জন্য পা-দানিতে পা রাখিল।

প্রদীপ ব্যস্ত হইয়া কহিল,-“এখানে নামূবে কি? এখান থেকে তোমাদের বাড়ি যে ঢের দূর।”

—“হোক। আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আমার আর কী হবে?” বলিয়া উমা সোজা ফুটপাতে নামিয়া আসিল।

প্রদীপ গাড়িটাকে চলিতে বলিতে পারিল না। বরং হাত তুলিয়া অভিমানিনী উমাকে ডাকিতে সুরু করিল।

নমিতা বাধা দিল : “ওকে ডেকে কোথায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে? ও বাড়ি যাক্। চলল।”

গাড়িটা গড়াইয়াছে, অমনি ছুটিয়া উমা ফের হাজির হইল। কহিল,—“তোমাকে প্রণাম করা হয় নি, বৌদি। মনে যদি কোনোদিন দুঃখ দিয়ে থাকি, ভুলে যেয়ো। আর কোনোদিন দেখা হয় কি না কে জানে।” বলিয়া দরজা খুলিয়া সে নমিতার পদধূলি নিল।

নমিতার দুই চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল; চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, উমা পাশের কোন গলি দিয়া সহসা কখন অদৃশ্য হইয়া গেছে।

পর দিন কি ভাবিয়া ভোর বেলা

কিন্তু পর দিন কি ভাবিয়া ভোর বেলাতেই যে উমা একটা টিফিকেরিয়ার লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইল তাহা সে-ই জানে। কাল সারা রাত ধরিয়া প্রতি মুহূর্তে মনে যাহা ডাক দিয়া ফিরিয়াছে তাহা কি পূর্ণ না হইয়া পারে? তাই দূরে প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি প্রদীপ ও নমিতাকে ট্রেনের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে আর কোনো রোমাঞ্চকর বিস্ময়বোধ করিল না, আজিকার সূর্যোদয়ের মতই যেন তাহা অতি সাধারণ। দূর হইতেই প্রদীপ কহিয়া উঠিল : "তুমি আবার কোত্থেকে হাজির হ'লে, উমা? বাঃ।"

দুইজনে যতক্ষণ না একেবারে কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, উমা শব্দ করিল না। কাছে আসিতেই সে বুঝি প্রদীপের হাত ধরিতে গিয়া নমিতার হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল,—"তোমাকে আরেকবার ভারি দেখতে ইচ্ছা করছিলো, বৌদি। এই জন্যে কাল বারে বারে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। খালি মনে হচ্ছিল তোমার কাছ থেকে ভালো করে বিদায় নেওয়া হয় নি।"

নমিতা যেন উমার মনের বেদনা দেখিয়া ফেলিয়াছে। তাই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে কহিল,—"তুমিও আমাদের সঙ্গে চল, উমা।"

দুইটি আনন্দপুর্ণ চক্ষু তুলিয়া উমা কহিল,—"আমারো তাই ভারি সাধ হয়, বৌদি। কোথায় যেন চলে যেতে ইচ্ছা করে।"

প্রদীপ কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছিল। হাসিয়া কহিল,—"তুমি গেলে। এবার আমার জেল আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। শচীপ্রসাদ নিশ্চয়ই তা হ'লে দাঁত বত্রিশটা গুড়ো করে দেবে। কাজ নেই উমা, ফুলহাটিতে ফলস্ দাঁত কিনতে পাব না।"

দুইজনে ট্রেনের কামরায় গিয়া উঠিল। নমিতা কহিল,—"ভেতরে একটু বসবে, উমা?"

—"কাজ নেই বৌদি। গাড়ি এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। শেষে যদি নামতে না পারি?"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা কহিল,—"হাতে তোমার ওটা কী?"

সচেতন হইয়া উমা কহিল,-"তোমার জন্যে কিছু খাবার তৈরি করেছিলাম, বৌদি। নাও, ধর।"

—"খাবার? কী আছে ওতে?"

—"কিছু কাটলেট—"

হাসিয়া ফেলিয়া নমিতা কহিল,—"কাটলেট! আমি যে বিধবা সে-কথা তুমি রাতারাতি ভুলে গেলে নাকি উমা?"

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া উমা কহিল,—"না না কচুরি আছে, গজা আছে-লুচি, তরকারি, চাটনি-কাল সন্ধ্যাবেলা সব তৈরি করেছি। বসে বসে। মা জিগগেস করলে বল্লাম : এক বন্ধুর আজকে নেমন্তন্ন আছে, মা। তা, বন্ধু যদি সারা রাতে না আসে, তবে আমার আর কী দোষ বল? তুমি খেয়ো, বৌদি। খুব পরিষ্কার আছে সব—"

হাসিয়া প্রদীপ কহিল,—"বৌদির জন্যে তোমার এত মায়া, উমা! খাওয়াবার জন্যে মা'র কাছে পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলে।"

—"মিথ্যা কথা বৈ কি।" নমিতা রুক্ষস্বরে কহিল,—"আত্মতৃপ্তির জন্যে কে কবে না মিথ্যা বলেছে? আমি বলিনি? কাল কোর্টে সমস্ত লোকের সামনে?"

বিমূঢ় হইয়া প্রদীপ কহিল,—"তুমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এসেছ—এ তোমার মিথ্যা কথা?"

নমিতা উদাসীনের মত কহিল,—"কেন হ'তে যাবে। দাও তোমার খাবার উমা, কাটলেটগুলো প্রদীপবাবুকে খেতে বল।"

উৎফুল্ল হইবার ভাণ করিয়া প্রদীপ কহিল,—"তা আর বলতে হবে

। কিন্তু মা যখন জিগগেস করবেন খাবারগুলো কী হ'ল তখন কি বলবে, উমা?"

নমিতা উত্তর দিল : "বলবে রাত্রে বন্ধু না-আসাতে সকালবেলায় সেগুলো আঁস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। দাও, উমা, গাড়ি এবার ছাড়বে।"

জালা দিয়া টিফিন্-কেরিয়ারটা তুলিয়া দিয়া উমা গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল,—"আবার কবে দেখা হবে, বৌদি?"

—"দেখা বোধহয় আর হবে না, উমা। নিরুদ্দেশ যাত্রার কি আর কোথাও পার আছে?"

ফ্ল্যাগ নড়িল, বাঁশি বাজিল, আর একটিও কথা বলিবার আগে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। উমা নড়িল না; চিত্রার্পিতের মত মূক নিষ্পন্দ হইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। জালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নমিতা দেখিল, উমার দৃষ্টি ধাবমান ট্রেন্টাকে অনুসরণ করিতেছে না, মাটির উপর নিবদ্ধ হইয়া আছে।

ক্রমে এই দৃশ্যটুকুও অপসৃত হইয়া গেল।

বেঞ্চির এক ধারে উঠিয়া আসিয়া প্রদীপ কহিল,—"কী আর মিথ্যা কথা বলে' এসেছ, নমিতা?"

নমিতা কঠিন হইয়া কহিল,-"কোটা মিথ্যা কোটা সত্য তা আপনি আজো অনুভব করতে শেখেন নি?"

—"খুব শিখেছি। তাই তোমার আচরণের কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পেলাম না। গলার মালার বদলে পায়ের শৃঙ্খল হয়ে যদি আমাকে আটকে রাখতে চাও, সে-বাধা আমি সইবো না, নমিতা।"

—"সইতে কে আপনাকে বলছে? আপনি যা না যেখানে খুসি,-কপালের নীচে আমারো দুটো চোখ আছে।"

—"তবে শুধু-শুধু কেন আমাকে জেল থেকে টেনে রাখলে? আমি না হয় অমনি করে'ই মতাম।"

হাসিয়া নমিতা কহিল,—"মরবার আরো অনেক পথ ছিলো, প্রদীপবাবু।"

কিন্তু সেই ফুলহাটিতেই ফিরিয়া আসিতে হইল। প্রদীপ কহিল, "আমারই সঙ্গে এলে যে বড়?"

নমিতার মুখে সেই হাসি : "আপনি ছাড়া কে আর আমার সঙ্গী আছে বলুন। আমার জীবনে আপনার মূল্য কি একটুখানি? আপনি আমাকে কলঙ্ক দিলেন, আপন অধিকারের গর্ব করতে শেখালেন আমি অত বড় অকৃতজ্ঞ নই যে এই বনে-জঙ্গলে আপনাকে একা ফেলে পালিয়ে যাবে।"

—"কিন্তু বনে-জঙ্গলে তুমি ত' আর কোনোদিন ঘর বাঁধবে না।"

—"ঘর বাঁধবার জন্যেই ত' আর পথ নিই নি।"

নমিতা ঘর বাঁধিবে না বটে, কিন্তু ফুলহাটির এই শ্রীহীন শূন্য পুরীতে পা দিতে না-দিতেই সে দুইটি কল্যাণময় ক্ষিপ্রহাতে তাহার সংস্কারসাধনে তৎপর হইয়া উঠিল। তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া সেন গৃহলক্ষ্মীর মঙ্গলমাধুর্য্য! এইবার আর মথুরকেও ডাকিতে হইল না। যে বিছানা দুইটা দুই কোণে ধূলিলিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল তাহাদের ঝাড়িয়া-পুছিয়া রোদে দিয়া সে খটখটে করিয়া তুলিল, ঘর নিকাইল, কাপড় কাচিল এবং সন্ধ্যা হইতে না হইতেই রান্নার

জোগাড়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রদীপ যখন হাসিয়া কহিল : "আকাশে দিব্যি মেঘ করেছে, নমিতা, একবার নদীর ধারটায় বেড়াতে যাবে না?" নমিতা কথাটাকে উপেক্ষা করিয়া কহিল : "আমার এখনো কত কাজ বাকি।"

হঠাৎ একটা মেঘ ডাকিয়া উঠিতেই নমিতা সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল ঘন নিবিড় মেঘে সমস্ত আকাশ বেদনার্ত মুখমণ্ডলের মত থমথম্ করিতেছে। জীবনে সে এত বড় আকাশ দেখে নাই, পুঞ্জিত নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গর্জ্জমানা নদীর ডাক যেন তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিল। কিসের তাহার গৃহ, কিসের বা তাহার গৃহকর্ম্ম! নমিতা মাঠের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল—দিঙ্মণ্ডল ছাপাইয়া অন্ধকারের অজস্র বন্যা নামিয়া আসিয়াছে। আকাশে মুক্তবেণী ঝটিকা, নীচে নমিতা যেন শরীরিনী বিদ্রোহবহ্নি!

সঙ্গে সঙ্গেই জল আসিয়া গেল বলিয়া সে আর বেশিক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইতে পারিল না। নিজের ঘরে আসিয়া বিছানার উপর চুপ করিয়া বৃসিয়া পড়িল। ঘরের সবগুলি দরজা-জানলা খোলা, জোরে জলের হাটু আসিতেছে, তবু তাহার খেয়াল নাই। চরাচরপ্লাবী অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল সেই জানে। কেন সে এইখানে আসিয়াছে, কোথায়ই বা আবার এমন মুক্তবন্ধ গগন-বিহঙ্গ মেঘের মত কোন্ অপরিচিত দেশের দিকে ভাসিয়া পড়িবে—আজিকার দিনে সে-সব সমস্যা তাহাকে একটুও আলোড়িত করিতেছে না। সে যেন জানিত আজ আকাশে ঝড় আসিবে। সে আরো অনেক কিছুই জানিত!

কতক্ষণ তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিল খেয়াল নাই, হঠাৎ তাহার আচ্ছন্ন চোখের সামনে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ভাসিয়া উঠিল। নমিতা চঞ্চল হইল না, লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মার দর্পণে সে বারে বারে যাহার ছায়া দেখিয়াছে, আজিকাব এই ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষে এ বুঝি তাহারই প্রতিচ্ছবি! কিন্তু হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা টর্চ জ্বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গেল। এক ঝলক্ তীব্র আলোতে ঘরের রাশীকৃত অন্ধকার যেন বিকট হাস্য করিয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য, নমিতা একটুও ভীত হইল না।

কাহার স্বর শোনা গেল : "ধন্যবাদ।"

আবার সেই পীভূত স্তব্ধতা। এইবার অজয় টর্চটা টিপিয়া তক্ষুনি আঙুলটা সরাইয়া নিল না। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি একলা। বসে'? প্রদীপ কোথায়?"

ইহাতে অভিভূত হইবার কি আছে? উমা যদি কাল রাত্রে ভাবিয়া থাকে যে তোরবেলা ষ্টেশনে গেলেই প্রদীপের দেখা পাইবে, তবে নমিতার এত রাত্রের প্রতীক্ষা-স্বপ্ন কি জীবনের একটি দিনেও সফল হইতে পারিবে না? সে মাথার উপর ঘোম্টা তুলিয়া দিল না,

খোঁপাটা বাঁধিল না পর্যন্ত, সুতীব্র আলোর ঝাঁজে চক্ষু দুইটা আবিষ্ট হইতে না দিয়া অপলক চোখে অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অজয়ের এ কী শ্রী! কোথায় সেই দুর্লভ তেজ, সেই গর্বদৃপ্ত ঋজুতা? মুখমণ্ডলে গাঢ় রোগমালিন্য, কত স্বপ্নের ব্যর্থতা যেন মুদ্রিত হইয়া আছে। বেশবাস অপরিচ্ছন্ন, এক হাঁটু কাদা, জলে ভিজিয়া কিছু আর নাই। সেই মূর্তি দেখিয়া নমিতা আনন্দধ্বনি না হাহাকার করিয়া উঠিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অজয় হাসিয়া কহিল,—"খুব অবাক হয়ে গেছ দেখছি। আমি ভূত নই, নেহাৎই বর্তমান। জলে ভিজে বহু কষ্টে ষ্টেশন থেকে পথ চিনে এসেছি। প্রদীপ কৈ?"

নমিতা কহিল,—"বোস। পাশের ঘরে আছেন বোধহয়, ডেকে আছি।"

পাশের ঘরেও প্রদীপ তাহার নিঃসঙ্গ বিছানায় বসিয়া ঝড় দেখিতে ছিল। সে-ঝড়ে সে বিপুল সম্ভাবনার সঙ্কেত খুঁজিয়া পায় নাই, এঅন্ধকার যেন তাহার জীবনে রাশি রাশি বিষন্নতা নিয়া আসিয়াছে। অচরিতার্থতার এমন রূপ আর সে কবে দেখিয়াছে? এত বড় বিস্তৃতির মধ্যে তাহারই জন্য কোথাও এতটুকু মুক্তি রহিল না!

নমিতা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রদীপ টের পায় নাই। কি বলিয়া তাহাকে সে এই সংবাদ দেয় কিছুই ভাবিয়া পাইল না। হঠাৎ তাহার মাথায় এক ঠেলা দিয়া কহিল,—"শিগগির দেখবেন আসুন—কে এসেছে।"

প্রদীপ ধড়মড় করিয়া উঠিল : "কে? আবার পুলিশ নাকি?"

—"না, না। শিগগির আসুন।"

ঘরের কোণ হইতে লণ্ঠনটা লইয়া নমিতার পিছু-পিছু প্রদীপ অগ্রসর হইল। ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিল ডান-হাতে একটা টর্চ জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর কেহ নয়, অজয়। সহসা প্রদীপ যেন এতটুকু হইয়া গেল।

প্রদীপকে দেখিয়া বিদ্রুপাত্মক অভিবাদন করিয়া অজয় কহিল, "ধন্যবাদ।"

প্রদীপ আরো একটু আগাইয়া আসিল বটে, কিন্তু বন্ধুর হাত ধরিতে সাহস পাইল না। খালি কহিল,—"তুমি? হঠাৎ? কোথেকে?"

অজয় কহিল,—"আসৃচি অনেক দূর থেকে। হঠাৎই আমি এসে থাকি। খবরের কাগজে তোমাদের কীর্তির কথা আদ্যোপান্ত পড়লাম,

-বেশ, তোমাদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছি। তার পর?"

কাহারও মুখে কথা জুয়াইল না। খানিক বাদে স্নিগ্ধস্বরে নমিতা কহিল,—"একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি"

—"ভিজতে আমাকে আরো অনেক হবে। রাত্রে আজ আর জল থামবে বলে মনে হয় না।"

প্রদীপ কহিল,—"এক্ষুনি আবার চলে যাবে নাকি?"

—"নিশ্চয়। এক জায়গায় বেশিক্ষণ জিরোবার আমার সময় নেই। কিন্তু ঘর-দোরের এ কী হাল-চাল করে রেখেছ? টাকা-পয়সার টানাটানি বুঝি? তা আমার কাছেও কিছু নেই।"

একটু থামিয়া পরে আবার কহিল,—"দেশে ফিরে ভারি মজা দেখলুম প্রদীপ; বাবার সেই বাৎসরিক পনেরো হাজার টাকা দিব্যি উড়ে গেছে গ্লাশে আর বিলাসে! আমি যেই একা, সেই একা। তার পর, পল্লী-সংস্কারের বকশিস্ বাবদ সেই যে ম্যালেরিয়া পেয়েছিলুম, তাতে হাড়-মাস আমার ঝরঝরে হয়ে গেল। তার পর একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া : "তোমাদের সেই অজয় আর নেই। তোমাদের দেখতে নিদারুণ ইচ্ছা হ'ল বলেই জ্বর নিয়েও জলের মধ্যে চলে এসেছি। এখন ত দিব্যি একটি রাণী পেয়েছ, এবার স্বচ্ছন্দে নিরীহ একটি কেরানি বনে' যাও, কিম্বা লাইফ, ইসিয়োরেন্সের এজেন্ট, কিম্বা ধরে পাটের বা মাছের দালাল—কি বল?"

প্রদীপ অভিমান করিয়া কহিল,—"একটা কিছু নিশ্চয়ই হ'তে হবে, সে-পরামর্শ তোমার কাছ থেকে না নিলে কিছু এসে যাবে না।"

স্বচ্ছ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া অজয় কহিল,—"ভালো। একটা ইস্কুল-মাষ্টারিও মন্দ হবে না। তার পর নমিতা, ফোটো পূজো করতে করতে সুরাহা একটা কিছু হ'ল তা হ'লে? বেশ।"

নমিতা একটিও কথা কহিল না, গভীর দৃষ্টিতে অজয়ের মুখের দিকে চুলের দিকে কাপড়ের দিকে পায়ের দিকে চাহিতে লাগিল।

—"কি, কথা কইছ না কেন? আমি তোমাদের এমন সন্ধ্যাবেলাটা মাটি করে দিলাম নাকি?"

নমিতা কহিল,—"বসুন, জামা-কাপড়গুলো ছাড়ুন, আপনার প্রত্যেক কথার উত্তর দিচ্ছি।"

—"আমার সময় কৈ? প্রতি নিশ্বাসে আমার বৎসর চলে যাচ্ছে।" তার পর হাসিয়া কহিল, —"কী বা আমার কথা, তার আবার উত্তর! কোর্টে দাঁড়িয়ে যাত্রা দলের ঢঙে কী তোফা বক্তৃতাই যে তুমি দিয়েছ

—ক্যাপিট্যাল! কিন্তু, কিছু খেতে দিতে পারো, নমিতা? ভারি খিদে পেয়েছে।"

নমিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল : "নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু আপনার যে জ্বর!"

অজয় বাধা দিয়া কহিল,—"হোক জ্বর। তা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে তোমার হাতের খাবার খেলে আমাকে চিতেয় উঠতে হবে। আজ আমি তোমার কাছে সেদিনের মত জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে আসিনি, নিতান্ত সাদা ভাষায় কিছু খাবার ভিক্ষা করছি মাত্র। আমাকে আজো তোমার সন্দেহ হয় নাকি? আজ আর তোমাকে বাইরে আহ্বান করবার ভাষা নেই, এই ঘরেই তুমি সমস্ত পৃথিবী লাভ করেছ। ও কি, তুমি রাঁধতে চললে নাকি? পাগল! আমার এত খিদে বা সময় নেই যে বাবু সেজে আসন-পি ড়ি হয়ে যোড়শোপচার সাবাড় করব। ঘরে তোমাদের গেলবার কি কিছুই নেই? কী ছাই তবে ঘর করেছ, নমিতা!"

পথে খাইতে উমার-দেওয়া খাবারগুলির কথা মনে করিয়া নমিতা। কহিল,—"আছে কিছু, তবে তা বাসি, কালুকের রাতের তৈরি।"

—"বাসি! নিয়ে এসো চট্ করে? বলে কি না বাসি! পেলে। বাঁশ চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি—"

নমিতা টিফিন-কেরিয়ারের বাটিটা লইয়া আসিল।

অজয় একেবারে শিশুর মত হাত বাড়াইয়া বাটিটা গ্রহণ করিল। নমিতা কহিল,—"দাঁড়া একটা প্লেট নিয়ে আসছি।"

—"প্লেট-ফ্লেট লাগবে না। এই দাও।" বলিয়া অন্ধকারে খাবার গুলি ভাল করিয়া ঠাহর না করিয়াই অজয় গোগ্রাসে গিলিতে সুরু করিল। ভাল করিয়া চিবাইবারো সময় হইল না; একমুখ খাবার লইয়া কহিল,-"দু' দিন পেটে কিছু যায় নি একদম্। নেহাৎ ভাগ্য প্রসন্ন বলেই প্রসাদ মিললো। জল? জল লাগবে না—এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে। দাঁড়াবার আর এক ফোটাও সময় নেই। মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁ করে' ছুটলেই জল পাওয়া যাবে। তার ওপর এখন যদি নদী সন্ত্রাতে হয়, তা হলে ত' কথাই নেই—"

নমিতা বাধা দিয়া কহিল,—"এখুনি যাবেন কি? দাঁড়ান, জল আনতে কতক্ষণ? সব সময়েই দুরন্তপনা করতে নেই।"

কথার সুরটা অজয়ের কানে কেমন একটু অদ্ভুত ঠেকিল,—যাইতে সত্যই পারিল না। নমিতা জল নিয়া আসিল। এক ঢোকে সবটা নিঃশেষ করিয়া অজয় কহিল,—“পিপাসাও আমাদের পায়, স্নেহময়ী নারীর মুখ দেখতে পেলে আমাদেরো দুটি দণ্ড কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সময় নেই। কত কাজ বাকি, কত পথ এখনো উত্তীর্ণ হতে হবে—আমি চল্লাম। তোমাকে বিশেষ কিছু উপহার দিয়ে যেতে পারলুম না—যদি পারি কিছু টাকা পাঠাবো। তা দিয়ে যা তোমার খুসি কিনে নিয়ে। কিনে দিয়ো হে প্রদীপ। শাড়ি ব্লাউজ জুতো গয়না—যা ওর পছন্দ। এখনো যে ভোল ফেরায়নি দেখছি।” বলিয়া অজয় দরজার বাহিরে পা বাড়াইল।

পিছন হইতে নমিতা হঠাৎ তাহার বা হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া আকুলকণ্ঠে কহিল,-“আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার অসুখ, কে তোমাকে দেখবে বল।”

প্রথমটা কথা শুনিয়া অজয়ের সমস্ত চেতনা যেন ঘুলাইয়া উঠিল। অন্ধকারে নমিতার মুখ স্পষ্ট চোখে পড়ল না; সে-মুখ দেখিতে পাইলে হয় ত' সে একটু দ্বিধা করিত, হয় ত' এমন কঠোর ঘৃণায় সে-স্পর্শকে উপেক্ষা করিতে পারিত না।

অজয় তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল,-“আমার সঙ্গে যাবে মানে?”

—“হ্যাঁ, যাব; যেখানে তুমি নিয়ে যাবে। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে বলেই ত' এত দিন প্রতীক্ষা করে বসে আছি।”

অজয় আকাশ হইতে পড়িল : “এ এ-সব কী বলছে হে প্রদীপ? তুমি কোনো কথা কইছ না কেন?”

প্রদীপ দূরে জানালার কাছে সরিয়া গেল। নমিতাই বলিয়া উঠিল : “কে কী বলবে-কার কী সাধ্য আছে শুনি? তুমি একদিন আসবে সেই আশায় আমি আজো বেঁচে আছি। কে আমাকে বাধা দেয়?” বলিয়া নমিতা অজয়কে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

নিশ্বাস ফেলিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত কাটিল না। নমিতাকে ডান হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজয় কহিল,—“সরে দাঁড়াও শিগগির। ছুঁয়ে

না আমাকে। তুমি এতদুর নির্লজ্জ হয়েছ জানলে এখানে মরতেও আসতাম না কোনোদিন। তোমার ছোঁয়া খাবার খেয়েছি ভেবে সারা শরীর আমার অশুচি হয়ে গেছে।”

নমিতা বাঁশের একটা খুটি ধরিয়া নিজেকে রক্ষা করিল।

কটু কদর্য্য কণ্ঠে অজয় কহিল,—“এক জনকে তার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করে' পথে বসিয়েছ, তবুও তাতে তোমার তৃপ্তি হ'ল না? এত সহজেই তোমার অরুচি ধরে গেল? ভেবেছ

আমার সঙ্গে চলতে গিয়ে এক সময় জিরোতে চাইবে, পথের থেকে কাঁধে উঠতে চাইবে—অজয় অমানুষ মেয়েমানুষকে অতটা প্রাধান্য দিতে শেখেনি। লজ্জা করে না?—কে তোমাকে বাধা দেবে! বাধা দেবে তোমার লজ্জা, তোমার চরিত্র।"

অজয় পা বাড়াইয়াছিল, নমিতা আবার কাছে ছুটিয়া আসিল। সে কঁদিতেছে। কহিল, —"চরিত্র আমি মানি না, মানি আমার মনকে। সেই আমার মণি, সেই আমার সব। তুমি যেয়ো, তোমার সঙ্গেও আমি যেতে চাই নে, কিন্তু আর খানিকক্ষণ তুমি থেকে যাও। আজকের রাতটা।"

—"তোমার ঘরে? ঐ বিছানায়? সরে দাঁড়াও, নমিতা।"

নমিতা প্রখরকণ্ঠে কহিল,—"কেন, একটা রাত্রি একাকিনী নারীর ঘরে আত্মদমন করে থাকতে পারো না?"

অজয় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল : "তুমি আমাকে লোভ দেখাচ্ছ বুঝি? আত্মদমনের চেয়েও অজয়ের জীবনে মহত্তর আদর্শ আছে। তুমি তার মহিমা বুঝবে না—পথ ছাড়। যেতে দাও আমাকে। একাকিনী নও, ঐ প্রদীপ দাঁড়িয়ে। নিষ্ঠা বলে জিনিসটাকে একেবারে অমান্য করো না। সতী নাই বা হলে, কিন্তু তাই বলে অসৎ হতে হবে?"।

নমিতা সরিয়া দাঁড়াইল। মুখে একটিও কথা নাই।

—"পথে বেরুবো বললেই কি আর বেরুনো যায়? পথ তোমাকে গ্রহণ করবে কেন? তোমার ছাড়পত্র কোথায়? ঘরে যাও, দরজাজানালা বন্ধ করে বিছানাটা উত্তপ্ত করে রাখ গে —রাত্রে ত' আবার ঘুমুতে হবে। চল্লাম হে প্রদীপ, সুইট ড্রিমস্!" বলিয়া সেই ঝড়-জলের। মধ্যেই অজয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

কোথায় মরতে যাব

প্রদীপ কহিল,—“অজয়ের সঙ্গে গেলে না? নিলো না বুঝি?”

নমিতা রুখিয়া উঠিল : “কোথায় মরতে যাব ওর সঙ্গে? তার চেয়ে এই আমার ঢের ভালো।” বলিয়া ভোলা জালাগুলি সে বন্ধ করিতে লাগিল : “জলে কী হয়েছে দেখুন-ঘরের মধ্যে নদী বইছে। মেঝেটা লেপতে হবে।”

—“এখন থাক।”

—“এখন থাকবে কী! ঘুমুনো যাবে নাকি তা হ’লে? উনুনটুনুও বোধহয় ভেসে গেল। একটা হাক দিন্ না, মথুর কিছু খাবার জোগাড় করে নিয়ে আসুক। টিফিন্-কেরিয়ারে যা ছিল সব উজোর করে খেয়ে গেছে”।

—“তোমার খুব খিদে পেয়েছে নাকি?”

তরলকণ্ঠে নমিতা কহিল,—“আহাহা, রাত্রে যেন আমি কত খাই। আপনার জন্যে বলছি—সারাদিন ত’ পেটে কিছু পড়ে নি। শরীরটা ত’ গেল। যা হোক, উনুটা ধরিয়েছিলাম, ঝড় আর আপনার বন্ধু এসে সব মাটি করে দিল। ডাকুন না মথুরকে।”

একটা ন্যাড়া দিয়া নমিতা ঘর মুছিতেছিল, আভরণহীন সেই হাতখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রদীপ কহিল,—“মথুরকে ডেকে কাজ নেই। সত্যি আমার একটুও খিদে পায় নি।”

—“না, পুরুষমানুষের খিদে না পেয়ে পারে? আমার কথা শুনে ত’ আপনার পেট ভরবে না।”

—“সত্যি বলছি, আমার খিদে নেই। কাল খুব ভোরে উঠে না-হয় দুটি বেঁধে দিয়ে।”

—“বেধে আমি এখনই দিচ্ছি। একটিবার মথুবকে ডেকে দিন্ না।“

—“তুমি বাঁধতে গেলেই আমি আলো খাব না। এই আমি শুয়ে পড়লাম।” বলিয়াই প্রদীপ নমিতার নিজের জন্য পাতা বিছানাটার উপর শুইয়া পড়িল : “তোমার বিছানায় শুলাম, নমিতা।”

নমিতা ধীরে কহিল,—"বেশ ত। ঐ, জালাটা খুলে গেল। শিগগির বন্ধ কবে দিন। নইলে এক্ষুনি ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে যাবে। একেই ত' আপনার শরীরটা ভালো নেই—"

জাল্লাটা বন্ধ করিয়া প্রদীপ আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে কহিল,—"কাল থেকেই মাথাটা কেমন ধরে' আছে, নমিতা"

নমিতা শুধু কহিল,—"যাচ্ছি। আমার এই হ'ল বলে।"

প্রদীপ অসাড় হইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ পরে নমিতা শিয়রের কাছে আসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল,—"বালিশের ওপর মাথাটা ভালো করে রাখুন। কোনখানটায় ধরেছে?" বলিয়া সে প্রদীপের শিয়র ঘেঁসিয়া পা গুটাইয়া বসিল। প্রদীপ একবার ভালো করিয়া নমিতার মুখ দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে আগেই লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিয়াছে। অন্ধকারে সেই মুখের বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না।

নমিতা প্রদীপের কপালের উপর স্নিগ্ধ আঙুলগুলি ধীরে বুলাইতে বুলাইতে কহিল, —"কপালটা টিপে দিই, কেমন? একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন। এ কয়দিন ত' শরীরের ওপর আর কম অত্যাচার হয় নি।"

প্রদীপ কহিল,—"আমি ঘুমিয়ে পড়ব কি! আর তুমি?"

–"পরে আমিও না হয় ঘুমিয়ে পড়ব। এমন বৃষ্টিতে শরীর ভেঙে ঘুম নেমে আসবে।"

—"তুমি এখানে শোও; আমি আমার বিছানায় যাই।"

নমিতা প্রদীপের ললাটের উপর করতলটি বিস্তৃত করিয়া স্থাপন করিয়া কহিল,—"এখানে একা শুতে আমার ভয় করবে যে।"

কপালের উপর নমিতার ঠাণ্ডা হাতখানি মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া। প্রদীপ কহিল, —"তবে?"

প্রদীপের করতলের মধ্যে নিজের ভীরু হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া নমিতা বলিল,-"তবে আর কি? ঘুম পেলে কখন একসময় আপনারই পাশে শুয়ে পড়বে না হয়।"

—"আমার পাশে?"

—"হ্যাঁ, আপনাকে আমি ভয় করি নাকি?" নমিতার কথার সুরে একটুও রুক্ষতা নাই,ভারি কোমল, আর্দ্র কণ্ঠস্বর!

এই ভাবে বসিবার সুবিধা হইতেছিল না; নমিতা বিছানার উপর পা তুলিয়া ঠিক করিয়া বসিতে না বসিতেই প্রদীপ বালিশটা তাড়াতাড়ি ঠেলিয়া দিয়া তাহার বিস্তৃত কোলের উপর মাথাটা তুলিয়া দিল। নমিতা কিন্তু মাথাটা নামাইয়া রাখিল না। স্নেহ-আনত দুইটি আয়ত চক্ষু প্রদীপের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া অকুণ্ঠিত আবেগে তাহার কপালে ও গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

প্রদীপ কহিল,-"তোমার প্রতি অনেক দুর্ব্যবহার করেছি, নমিতা—"

জোরে একটু হাসিয়া নমিতা বলিল,-"তার শাস্তিই ত' এখন পাচ্ছেন।"

প্রদীপ নমিতার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের মধ্যে গুঁজিয়া ফেলিল; কহিল,-"বিধাতা সবারই জন্যে সমান পথ তৈরি করে রাখেন নি–"

নমিতা কহিল,—"কারুর জন্যেই পথ তিনি তৈরি করে রাখেন না। পথ সৃষ্টি করবার গৌরবও যদি আমাদের না থাকে তবে চল্‌বার আমাদের আর আনন্দ কোথায়?"

—"আমার জন্যে এই ভুবন-ভরা খাতুর উৎসব—"।

–"আর কারুর জন্যে বা ঘন-গহন অন্ধকার!"

—"আমার জন্যে তোমার প্রেম, এই যৌবন, এই অগ্নিশিখা।" বলিয়া মুহমান প্রদীপ সহসা নমিতাকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিবুকে অধরে চোখের পাতায় চোখের নীচে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল।

প্রতিরোধ করিবার সমস্ত শক্তি নমিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে যে নিষ্প্রাণ একটা দেহপিণ্ড! ঝড়ের রাত্রে সে যেন অসহায় পৃথিবী!

বুকের উপর নমিতার আলুলিত রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রদীপ কহিল, —"যে যা বলে বলুক নমিতা, আমরা ধূলির ধরণীতে স্বর্গ আবিষ্কার করব—আমাদের প্রেমে, সহকর্মিতায়। আমি কবি, তুমি আমার আকারময়ী কল্পনা! নমিতা!"

নমিতা তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া কহিল,—"সারা রাত ভরেও কথা কয়ে শেষ করতে পারবেন না। শেষই যেন তার না থাকে। এই কথা আপনার অক্ষরে ফুটে উঠুক। আনন্দের কথা সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার মত মিলিয়ে যায়, কিন্তু ব্যর্থতার কথা রাত্রির অন্ধকারে তারা হয়ে অক্ষয় অক্ষরে জেগে থাকে!"

প্রদীপ নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিস্রস্ত অবগুণ্ঠনের নীচে সে-মুখোনিতে অসীম বেদনার মেঘছায়া মাখিয়া রহিয়াছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া

রহিল।

নমিতা বলিল,—"মনটাকে খানিকক্ষণ একেবারে কঁকা রাখুন, আপনিই ঘুম এসে যাবে। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আপনি না ঘুমুলে আমি কি করে শুই।"

প্রদীপ কহিল,—"তুমি কি আমাকে একবারো তুমি বলবে না?"

কিছু কাল স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ নমিতা নত হইয়া মুখটা প্রদীপের কানের কাছে নিয়া গিয়া অতি গাঢ়কণ্ঠে ডাকিল : "তুমি, তুমি, তুমি!"

—"এবার যদি আমি মতামও নমিতা, আমার দুঃখ থাকতো না।"

নমিতা বলিল, "নিশ্চয়। তোমার জন্যে এই অলস আবেগময় মৃত্যু, কারুর জন্যে বা কন্টকত কদর্য জীবন। প্রেমহীন আশ্বাসহীন কঠোর মুহূর্ত। কিন্তু, আর নয়, এবার ঘুমুও।"

প্রদীপ নিঃশব্দে নমিতারই কোলের উপর মাথাটা কাৎ করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এক সময়ে স্পষ্ট বুঝিল নমিতা আর হাত বুলাইতেছে না—স্তব্ধ। হইয়া পাষাণ-প্রতিমার নিশ্চল অটুট ভঙ্গিতে বসিয়া আছে। তার পর নমিতা যে আর কী করিল বোঝা গেল না। প্রদীপ ততক্ষণে গাঢ় নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

ধীরে ধীরে প্রদীপের মাথাটা বালিশের উপর নামাইয়া রাখিয়া নমিতা উঠিয়া পড়িল। দক্ষিণের জানালাটা খুলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে—আকাশে মেঘ কাটিয়া বিবর্ণ ঘোলাটে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। ভোর হইয়াছে ভাবিয়া কয়েকটা কাক এখানে-সেখানে চীৎকার করিতেছিল। নদীতে দু' একটি নৌকাও দেখা যায়। কোথায় একটি বাতি জ্বলিতেছে-না-জানি কত দূরে!

ঘাটে যেখানে নৌকার যাত্রী লইয়া দূর ষ্টিমার-ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা গাদি করিয়া থাকে সেই ঘাটের পথ সে চিনিতে পারিবে ত'? এই রাত্রে নিশ্চয়ই কেহ নৌকা ছাড়িবে না, উত্তরপশ্চিম কোণে এখনো মেঘ আছে। হয় ত' উহারই বিপদের আশঙ্কায় নৌকা ছাড়িবে না। নমিতার জীবনে আবার বিপদ কিসের? তরঙ্গ-সঙ্কুল ফেনোচ্ছসিত নদী যে তাহার বন্ধু, সহযাত্রিনী। বিধাতা, আজিকার এই অভিসারে যেন অজয়ের সঙ্গে তাহার দেখা না হয়। সে যেন একাই চলিতে পারে, একাই মরিতে পারে যেন। এই গর্বটুকু তাহার নষ্ট করিয়ো না।

এখান হইতে তার পাশা—তার পরে ষ্টিমারে গোয়ালন্দ। সেখানে ট্রেন দাঁড়াইয়া আছে। তার পর কলিকাতা। তার পর? এখানে বসিয়া থাকিলেও, তার পর? ক্ষণকালবিহারী

মানুষের চিত্তে ইহার সমাধান কোথায়!

একেবারে একা—সঙ্গীহীন। সম্মুখে পথ—মুহূর্ত্ত হইতে মহাকালে। নমিতা একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় ঐ ঘুমন্ত অসহায় প্রদীপের চেহারা দেখিয়া তাহার মমতার আর অন্ত রহিল না। একবার সাধ হইল নিজে ইচ্ছা করিয়া প্রদীপের কপালে অস্ফুট একটি বিদায়-চুম্বন উপহার দিয়া আসে; গভীর শব্দহীনতায় গোপনে বলিয়া আসে : এই চুম্বনে তোমার ললাট দগ্ধ করে যাই, বন্ধু। আমাদেরই মত তুমি ব্যর্থ হও, ধন্য হও।

কিন্তু না, যদি জাগিয়া উঠে! যদি দুই ব্যাকুল বাহু-বন্ধনে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়! যদি এই অবসন্ন জ্যোৎস্নাটুকুর মতই তাহার সকল সঙ্কল্প স্তিমিত হইয়া আসে!

নমিতা বাহির হইয়া আসিল।

সমস্ত পাড়া নিঝুম। মাঠে জল জমিয়াছে। সেই জল ভাঙিয়া নমিতা অগ্রসর হইল। পথ সে ভাল করিয়া চিনে না, কিন্তু পথ তাহাকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। এক পথ হইতে অন্য পথে, এক দিনের পর অন্য রাত্রে। থামিবার সময় কোথায়?

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দূরে কাহাকে যেন দেখা গেল। কে যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। নমিতা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। লোকটা তবু তাহাকে সঙ্কেত করিতেছে। তাহারই সম্মুখীন না হইয়া নমিতা আর যায় কোথায়?

আরো খানিকটা কাছে আসিতেই লোকটাকে চিনিতে পারিয়া নমিতার সর্বদেহ ভয়ে ও উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিল। এ যে তাহার স্বামী–সুধী! রাণীগঞ্জে শালবনে সেইদিন যে-পোষাকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন পরনে সেই পোষাক। মুখে সেই অম্লান হাসিটি; তেমন করিয়া বাঁ হাতে কোঁচাটা তুলিয়া ধরিয়াছেন।

যেন সেই মূর্তি তাহাকে বলিল : "এস আমার সঙ্গে।"

আর একটু আগাইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেই যেন নমিতা সে-মূর্তিকে ধরিয়া ফেলিবে। নমিতা ত্বরিত পদে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু তবুও তাহার নাগাল পাইল না।

নমিতা চীৎকার করিয়া উঠিল : "কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছ?"

সে-মূর্তির কণ্ঠ হইতে স্পষ্ট উত্তর আসিল: "এস আমার সঙ্গে। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই।"